অখণ্ড - সংহিতা
তৃতীয় খণ্ড

অখণ্ড
সংহিতা
বা
তৃতীয় শ্রী শ্রী স্বামী খণ্ড
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের
উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(তৃতীয় খণ্ড)

ষষ্ঠ সংস্করণ, পৌষ ১৪০৮

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)

প্রকাশক—স্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০

দূরভাষ : (০৫৪২) ৪৫২৩৭৬ [2002]

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০

(উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম

পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি

কলকাতা-৭০০০৫৪

অযাচক আশ্রম

''নগেশ ভবন,'' ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

অযাচক আশ্রম

পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম

২০বি, লক্ষীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)

''সাধন কুঞ্জ''

হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

ডাকে নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

''যথাকালে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে না পারায় নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্য দিয়া পাণ্ডুলিপি এবং উপাদানসমূহ বৎসরের পর বৎসর বড়ই উদ্বেগের সহিত রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইতে হইয়াছে। ফলে অগ্নিভয় এবং জল-নিমজ্জনের আশঙ্কা হইতে ইহা সফলতার সহিতই রক্ষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বারংবার স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে কিছু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নিখোঁজ হইয়াছে। আরও একটী দুঃখকর সংবাদ এই যে, প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠাব্যাপী পাণ্ডুলিপি উইপোকার দ্বারা নষ্ট হইয়াছে।''

''শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের জীবন, বাক্য বা চিন্তায় কোনও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বা পরধর্ম্মদ্বেষ কেহ কখনও দেখে নাই। এই জন্যই আমরা আশা করিতেছি, তাঁহার এই মধুমাখা উপদেশ-সংগ্রহের ভিতরেও সর্ব্বজনীন প্রেম এবং নিখিল জগতের শুভকর ইঙ্গিত ও প্রেরণা পাইয়া পাঠক বা পাঠিকা মাত্রেই উপকৃত হইবেন। মতামতের কলহে নহে, নিষ্ঠার উজ্জ্বলতায়ই তাঁহার উপদেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।''

''যেখানে যেখানে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, সম্প্রীতি ও সমবেত উপাসনার প্রসারের জন্য ''অখণ্ড-মণ্ডলী'' স্থাপিত আছে, সেই সব স্থানের কর্ম্মী ও সহযোগীদের প্রতি আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন প্রাত্যহিক সদালোচনার অঙ্গরূপে ''অখণ্ড-সংহিতা'' মহাগ্রন্থের নিত্যপাঠ প্রচলন করেন।''

"বাংলা ১৩৫০ সালে তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বহুদিন হয়, তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। কোনও নূতন উপকরণ সংগৃহীত না হওয়াতে নূতন সংস্করণে বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটে নাই।"

বাংলা ১৩৭৯ সালের ১লা আষাঢ় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উপরে যে চারিটি অনুচ্ছেদ মুদ্রিত হইল, তাহাই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ ছিল। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ-কালে "অখণ্ড-সংহিতা"র অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ মতামতের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—১লা ফাল্গুন, ১৩৮৫

বিনীত—

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,

বারাণসী-১০

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশিত অখণ্ড-সংহিতা তৃতীয় খণ্ডের ইহা হুবহু পূর্ণমূদ্রণ মাত্র।

পঞ্চম সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। দুই হাজারখানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া তিন হাজারখানা বিতরণের জন্য রাখা হইল। কি ভাবে, কাহাদের মধ্যে বিতরিত, হইবে, তাঁহার পদ্ধতি-নির্ণয় হইবে হয়ত তাঁহাদের মতানুসারে, যাঁহারা এই সদুদ্দেশ্য-পূরণার্থ স্বতঃ-প্রণোদনায় উল্লেখযোগ্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন সেই সকল মহানুভব দাতার দানের

পরিমাণ ও তালিকা "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

"অখণ্ড-সংহিতার" বাণী-সমূহকে গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে বহন করিয়া নিবার জন্য আমাদের প্রকাশিত "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকা বিগত ঊনত্রিশ বৎসর যাবৎ সাধ্যমত নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে।

বিনীত—

ইতি—আষাঢ় ১৩৮৮।

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

অযাচক আশ্রম

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট

বারাণসী-১০

ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন

অযাচক সন্ন্যাসী, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের অভিনব সমন্বয়কারী, স্বাবলম্বনের মূর্ত্ত বিগ্রহ, মহাকর্ম্মযোগী, সমদর্শী, স্ত্রী-পুরুষ, নির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে মহাওঁকার মন্ত্র ও ব্রহ্মগায়ত্রী মহামন্ত্রের অধিকার প্রদাতা, অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত্ত প্রতীক, আবাল্যব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারক, অনন্য চরিত্রগঠন আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, সুমহত অখণ্ড আদর্শ ও অখণ্ডসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, অযাচক আশ্রম নামক অভিনব সেবা প্রতিষ্ঠান এবং দি মালটিভারসিটি নামক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা, জগৎকল্যাণ অভীপ্সাকে ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ স্বরূপ নির্দ্দেশকারী ও জগৎকল্যাণসাধনে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে উৎসর্গকারী, ভবিষ্যৎ দেবমানবজাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের পথনির্দ্দেশক বিশ্বত্রাতা নবযুগস্রষ্টা জ্ঞানস্বরূপ,

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

তৃতীয় খণ্ড

—*—

পুপুন্‌কী আশ্রমের শৈশব

বাংলা ১৩৩৪-এর ১০ই মাঘের পর হইতে ১৩৩৫-এর ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের প্রদত্ত উপদেশাবলী টুকিয়া রাখা হয় নাই। পুপুন্‌কীর বন কর্ত্তিত হইতেছে, বড় বড় গাছের মূল উত্তোলিত হইতেছে, শ্রীশ্রীবাবামণি এবং তাঁহার একমাত্র সহকর্ম্মীটী বন উজাড় করিয়া ফাঁকা

জায়গার পরিসর বৃদ্ধি করিতেই ব্যস্ত। সুতরাং কে কাহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিবে ? তবে ফাঁকে ফাঁকে শ্রীশ্রীবাবামণি যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার দুই এক পংক্তি রক্ষিত আছে।

বন পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া মাটি কৃষিযোগ্য করিবার চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু মৃত্তিকা বড়ই কঠিন, গাতি বসিতে চাহে না, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীবাবামণি বা তাঁহার সহকর্ম্মী ইতঃপূর্ব্বে জীবনে কখনও গাতি চালান কাহাকে বলে, তাহা জানিবার অবসর পান নাই। তাই এক কৌশল অবলম্বিত হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'আহার করিয়া প্রতিবার আচমনের সময়ে এমন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে জলটা ফেলিতে হইবে, যেখানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গাতি চালাইতে হইবে।' বলা বাহুল্য, আশ্রমে এই অনুশাসন যথানিয়মে প্রতিপালিত হইতে লাগিল এবং এইভাবে একটু একটু করিয়া কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকিল। যেখানে জল পড়ে, মাটি সেখানে নরম হয়, গাতিও সেখানে সহজে চলে।

আশ্রমের স্নানীয় ও পানীয় জল সিকি মাইল দূরে একটী অর্দ্ধশুষ্ক ঝরণা হইতে সংগৃহীত হয়। বনপথ বলিয়া পথ সোজা নাই; তাই দূরত্বটা আরও বেশী মনে হয়। ঝরণার উদরে ক্ষুদ্র একটী ডোবার মধ্যে কিছু জল সঞ্চিত আছে, কুমড়ী ও শিয়ালগাজ্‌রা গ্রামের গরু-মহিষের পাল ঐ জলে স্নান করিয়া প্রতিদিন জলটুকুর পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে। এই জলটুকুই আশ্রমের সম্বল। অবশ্য পানীয় জল চুঁয়া খুঁড়িয়া আনা হয়। কিন্তু চৈত্র-বৈশাখে কি যে অবস্থা হইবে, এখন পর্য্যন্ত তাহার কল্পনাও আশ্রমীরা করিতে পারেন না।

আশ্রমের পর্ণকুটীরখানা নির্ম্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইল। কিসের প্রচার ? রাজনীতির, ধর্ম্মনীতির বা স্বাস্থ্যনীতির নহে। প্রচার চলিল আলস্যের বিরুদ্ধে। শ্রীশ্রীবাবামণি এতদ্দেশে পদার্পণ করিয়াই গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পর্য্যটন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এ দেশের লোকের দোষ কি, গুণ কি, সমৃদ্ধি কিসে, অভাব কিসের, সৌভাগ্য কোথায়, দুর্ভাগ্য কোথায় ? পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের দ্বারা তিনি বুঝিলেন, লোকের চরিত্রহীনতার কারণ আলস্য, ঈর্ষ্যা-পরশ্রীকাতরতার কারণ আলস্য, দারিদ্র্যের কারণ আলস্য,—এই আলস্যকে যিনি নির্ব্বাসিত করিতে পারিবেন, তিনি সব অভাব দূর করিবেন।

তাই, আলস্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হইতে লাগিল। স্থানীয় লোকদের মধ্যে পুপুন্‌কীর শ্রীহরিহর মিশ্র, শ্রীগোষ্ঠবিহারী হালদার, চিকশিয়ার শ্রীসর্ব্বদমন শর্ম্মা এবং শ্রীহরদয়াল শর্ম্মা এই প্রচার কার্য্যে আংশিক ভার গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের কর্ম্মনীতি

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির কর্ম্মনীতির একদিকের পরিচয় এখানে দেওয়া আবশ্যক মনে করি। শ্রীশ্রীবাবামণির কর্ম্ম-সাধনার কয়েকটি বিশেষত্ব এই যে,—

(ক) তাঁহার কর্ম্ম শহরের জন-কোলাহল হইতে অতি দূরে নিভৃত পল্লীতে আরব্ধ হইয়া থাকে।

(খ) স্বেচ্ছায় যাঁহারা আসিয়া কর্ম্মিসঙ্ঘভুক্ত হন না,—

নিমন্ত্রণ, আহ্বান, আবেদন ও প্ররোচনা দ্বারা যাহাদিগকে সহকর্ম্মিত্ব গ্রহণ করাইতে হয়,—শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাদিগকে সহযোগী কর্ম্মীরূপে গ্রহণে বিরত থাকেন,

(গ) নিজে সমগ্র ব্যাপারের নেতা হইয়াও সকল সহ-কর্ম্মীদের সম্মতি গ্রহণ ব্যতীত কোনও কার্য্য সম্পাদন করেন না, এবং

(ঘ) যে পল্লীতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, সেই পল্লী সম্বন্ধে তাহার ধর্ম্মনীতি, সামাজিক অবস্থা, লোকের রুচি-প্রকৃতি, প্রাচীন ইতিহাস, বর্ত্তমান অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ-সংগ্রহ করিয়া এবং গ্রামের ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, ভাল-মন্দ সকল শ্রেণীর লোকের সহিত ভালরূপে মিশিয়া গ্রামের প্রকৃত অভাবগুলির নিগূঢ় পরিচয় লইয়া তিনি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

পুপুনকী আশ্রমে আসিয়া কার্য্যারম্ভ করিবার সময়ে এই সকল বিশেষত্বের ব্যত্যয় হয় নাই। তাই, তিনি কালাপাথরের ও চিকশিয়ার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ-প্রস্তর-সঙ্কুল দুর্গম পথে চলিতে চলিতে বলিয়াছিলেন,—''এই একশ বছরের প্রাচীন বাধা হাতুড়ীর ঘায়ে ভাঙ্গিয়া দিয়াই গ্রামবাসীদের আত্মশক্তির চেতনা সঞ্চার করিতে হইবে।''

একটী একটী করিয়া গ্রাম্য লোকের চরিত্র অধ্যয়ন করেন আর সহকর্ম্মীর নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী একটী করিয়া সমাজ-সেবার নবতর কর্ম্মপদ্ধতি বিবৃত করেন। তৎকালীন দৈনিক কথা-সংগ্রহের খাতায় সেই সবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে, পাঠকের নিকটে সম্যকরূপে প্রকটিত হইত যে, পল্লী-সেবায় মানুষকে কি কঠোর শ্রম করিতে

হয় এবং শ্রমের চাইতেও কত সহস্রগুণ পরিচালিত করিতে হয় প্রতিভার বলকে।

বাংলা ও ভারত

একদিন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিধাতারই আজ এই অভিপ্রায় যে, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হউক এবং বঙ্গভূমির জন্য যে সুমহৎ গৌরব ভবিষ্যতের স্নেহময় বুকে সঞ্চিত আছে, সমগ্র ভারত নির্ব্বিবাদে তাহার অধিকারী হউক।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বঙ্গভূমি কি ভারত হইতে একটা আলাদা দেশ ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক হিসাবে আলাদা, এক হিসাবে অভিন্ন। বাংলা সমগ্র ভারতেরই এক অবিভাজ্য অঙ্গ, সুতরাং ভারত থেকে তাকে আলাদা ভাবা ভুল। কিন্তু যখন আর্য্য-সভ্যতা পঞ্চনদে প্রবেশও করে নাই, সেই যুগে বাংলায় বহু সাধনার বহু উৎকর্ষের এক পরম সম্মেলন হইয়াছিল, যাহা ভারতের অন্য যে কোনও অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর ঔদার্য্য ও পরমতসহিষ্ণুতা দিয়াছিল বাঙ্গালীকে। বেদ ও তন্ত্রের যতখানি মিলন, বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ সাধনার যতখানি সমন্বয়, হিন্দু ও মুসলমানের যতখানি ঘনিষ্ঠতা ভারতের আর কোনও প্রান্তে সম্ভব হয় নাই, বাংলায় এই কারণেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। এই জন্যই বাঙ্গালীর প্রাণের গতি বিশ্বজনীন। একদা নিখিল বিশ্বে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে যে, বিশ্বজনীনতাই জীবন, বিশ্বজনীনতাই ধর্ম্ম। সাধক বাঙ্গালী সেই জীবন ও সেই ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে তথা জগতে প্রচার করুক।

বিশ্বজনীনতা প্রসারের পন্থা

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—তাহার পন্থা ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাঙ্গলার বাহিরে শত শত আশ্রম বা কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান তোমাদিগকে গড়িতে হইবে। বাঙ্গলার সেবা ও অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার বাহিরের প্রদেশগুলিকে দিতে হইবে, বাহিরের প্রদেশগুলির সেবা ও অভিজ্ঞতা বাঙ্গলায় আনিতে হইবে। আদান এবং প্রদান, উভয়ের মধ্যে থাকিবে এক সুবলিষ্ঠ সুস্থ মনোবৃত্তি, অন্ধ অনুকরণকারীরও নয়, গর্ব্বিত অহঙ্কারীরও নয়। দিতে হইবে ভাব, ভাষা, সেবা,—আনিতে হইবে ধন, জ্ঞান, পৌরুষ। বাঙ্গালীর জীবন-যাপন প্রণালীর যাহা সুন্দর ও শুচি, তাহা দিতে হইবে; অপরের যাহা সুন্দর ও শুচি, তাহা আনিতে হইবে। কোনও প্রদেশ শ্রেষ্ঠ আর কোনও প্রদেশ নিকৃষ্ট, এইরূপ ভ্রান্ত মনোভাবের উপরে দাঁড়াইয়া নয়, পরন্তু বিশ্ব-সত্যের দ্রষ্টা ঋষিদেরই বংশধরেরা বিভিন্ন প্রদেশের সভ্যতা-পত্তন করিয়াছেন, সত্যদ্রষ্টাদের প্রতিভার অবদান নানাভাবে সত্য ও সুন্দরের সাথে নানা প্রদেশের সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়াছে, এইরূপ নির্ব্বিদ্বেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া ভারতের প্রত্যেক প্রদেশকে দেখিতে হইবে।

বৃহত্তর বাংলা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—বাঙ্গলার কর্ত্তব্য হইবে ভারতকে একটী বৃহত্তর বাঙ্গলায় পরিণত করা, সহস্র সহস্র সর্ব্বত্যাগীর জীবন-শোণিতের বিনিময়ে ভারতের মাটিকে বাঙ্গলার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ দ্বারা সুসজ্জিত করা। আপ্রাণ প্রয়াসী হইলে বাঙ্গলার পুত্র-কন্যা তাহা পারিবে, ততটুকু

ভগবদাশীর্ব্বাদ তাহাদের উপর আছে। কিন্তু বাঙ্গলাকে তজ্জন্য আত্মগঠন করিতে হইবে। অভিক্ষার ব্রত সেই আত্মগঠনের একটা সূচনামূলক ইঙ্গিত। ধীরে ধীরে বাংলার বুকে ত্যাগের বন্যা আসিবে, কোলাহল-মুখর রাজপথ পরিহার করিয়া সে বন্যার জল পল্লী-বীথির নীরবতার উপাসনা করিবে, সকলের অজ্ঞাতে সকলের প্রত্যাশার অতীতে রহিয়া ধীরে ধীরে একদিন এক দুর্দ্ধর্ষবীর্য্য মহাজাতি সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া মস্তক উত্তোলন করিবে।

মিলনের আবেগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাংলার বাহিরে ভারতের অন্য প্রদেশের মাটিতে কি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ আদি নাই? আছে। কিন্তু এমন করিয়া নাই যে, দুইটী অতি প্রচণ্ডরূপে বিপরীত সভ্যতার অনুসরণকারী জাতি হিন্দু ও মুসলমানকে, এক ভাষায় কথা বলিতে, এক বর্ণাবলীর সহায়তায় লিখিতে পড়িতে শিখাইতে পারে, বাংলার অভাবনীয় কৃতিত্ব এইখানে। সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কৃত্রিম বীজনের দ্বারা ধূমায়িত করা হইতেছে, তাহা তাহার চূড়ান্ত ক্ষতি একদিন সাধন করিবার পরেও হঠাৎ দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দুর কাছ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাইতে পারে নাই। জাতি হিসাবে এই যে একটা চমৎকার ব্যাপার বাঙ্গালীর আয়ত্তে আসিয়া রহিয়াছে, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যদি দেশবাসীর শক্তি, বুদ্ধি ও প্রতিভাকে মূঢ় করিয়া না রাখেন, তাহা হইলে ইহা অনন্ত কোটিকল্প কাল পর্য্যন্ত জাতিতে জাতিতে মিলনের আবেগকে

বাঁচাইয়া রাখিবে। বস্তুতঃ মিলনই জীবন, বিচ্ছেদই ত মৃত্যু। কেন আমরা এক জাতিকে অন্য জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পর হইয়া থাকিতে দিব? পর শব্দের আর একটী মানে শত্রু, —সংস্কৃত সাহিত্যে তার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

পল্লী-পরিচয় সংগ্রহ

কোনও দিন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতেন,—বাংলায় প্রত্যেক পল্লীতে আগে তোমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে, বক্তৃতা দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য নয়, কিম্বা হঠপ্রযত্নে কার্য্যারম্ভ করিবার জন্যও নয়, তথ্য সংগ্রহের জন্য। বাংলার ঠিক আশী হাজার গ্রামে না পার, অন্ততঃ ষোল হাজার গ্রামে তোমাদিগকে তীর্থযাত্রীর ভক্তিবিনম্রতা নিয়া প্রবেশ করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে, এই গ্রামে কোনও উচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতিশীল, কোনও পরার্থপর, কোনও সত্যপরায়ণ, কোনও জাতীয় উন্নতি-কামী, কোনও অধ্যবসায়ী, কোনও অসমসাহসী পুরুষ বা নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা। জানিতে হইবে, এই গ্রামে কোনও বিখ্যাত দার্শনিক, পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ, বাদক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, জ্যোতির্বিবদ্, সমাজ-সংস্কারক, শিল্পী, বিদুষী প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন কিনা এবং তাঁহাদের জীবনের প্রভাব গ্রামবাসীদের চরিত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আনয়নে সমর্থ হইয়াছে কিনা। জানিতে হইবে, মনুষ্যত্বের পুনর্জাগরণে এই গ্রামে কোন কোন পূর্ব্বসংস্কার বাধা-স্বরূপ এবং কোন কোন পূর্ব্বসংস্কার আনুকূল্য-কারক। এই ভাবে আগে দেশকে জানিতে হইবে, চিনিতে হইবে।—আত্মোৎসর্গ আরম্ভ হইবে তারপরে।

পুপুন্‌কী আশ্রমের বিদ্যালয়-বিভাগ

স্থানীয় ভদ্রলোকদের ইচ্ছা ছিল, চটপট করিয়া একটা আবাসিক (Residential) ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়া হউক, কেন না, তাহাতে গ্রামবাসীদের খুব সুনাম হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি এই প্রস্তাবের গুরুতর বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"কেউ যখন নামের লোভে কাজ করে, তখন তার কাজে ফাঁকি আসে। পুপুন্‌কীতে এমন কোনও কাজ করা হইবে না, যাহার প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য থাকিবে লোকমান।"

তথাপি একদল গ্রামবাসী প্রচার আরম্ভ করিল যে, পুপুন্‌কীতে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় খোলা হইতেছে, শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার কৃতবিদ্য শিষ্যদিগকে এখানে আনিতেছেন, ইত্যাদি। হুজুগ বেশ জমিয়া উঠিল এবং ইংরাজী হাই স্কুলের নাম শুনিয়া অনেকে বিশেষ ভাবে সহানুভূতিও জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বজ্রকণ্ঠে বলিলেন,—ইংরেজি পদ্ধতির স্কুল এখানে আমরা করিব না, ইংরেজি সভ্যতার প্রচার-কল্পে আমরা আমাদের এক কণা রক্তও উৎসর্গ করিতে পারিব না। আমরা চাহি ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রতিষ্ঠান,—ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারই আমাদের কাম্য।

ইংরাজি শিক্ষার দোষ ও গুণ

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইংরাজি শিক্ষা কি ভারতের কোনও কুশল সম্পাদন করে নাই?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—করিয়াছে এবং তাহা অস্বীকার

করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। ইংরেজি শিক্ষা আসমুদ্র হিমাচলে একটী সাধারণ ভাষার মধ্য দিয়া পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ভারতে একজাতীয়তার ভাব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজি ভাষার প্রচলনের স্বপক্ষে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যদি রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ নেতাদের আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রস্তাব মত সংস্কৃতকেই সর্ব্বভারতের ভাষারূপে বরণ করিয়া লইতেন, তাহা হইলে ইংরেজ জাতি অনন্তকালের জন্য ভারতবাসীর মনের মন্দিরে পূজার আসন লাভ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রতিনিধি-স্বরূপে বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মহিমাতেই বহু সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া একই ভারতমাতার কণ্ঠহারের মত বিরাজ করিতেছিল। ইংরাজি শিক্ষা সেই কণ্ঠহার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

ইহাতে যখন স্থানীয় উদ্যোক্তৃবর্গের উৎসাহ কমিল না, তখন শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে লিখিত ভাবে জানাইয়া দিলেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি এবং তাঁহার একমাত্র সহকর্ম্মী আশ্রমের ভূমি ত্যাগ করিয়া এবং এই প্রচেষ্টার সহিত সকল সংশ্রব বর্জ্জন করিয়া চলিয়া যাইবেন।

ইহাতে অভীপ্সিত সুফল ফলিল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির সহিত কোনও সময়েই যে পুপুনকী-আশ্রম বা তাহার সহযোগী অপরাপর প্রতিষ্ঠান-সমূহ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনও প্রকার আপোষ-রফা করিয়া চলিবে না, সেই নীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতীয়তাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান

পুরুলিয়া সহরের দুই একজন ইংরেজি-নবীশ উকিল শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—শিক্ষার এইরূপ সম্যক ভারতীয়তাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিবেন ত'? রবীন্দ্রনাথ তাঁর বোলপুর-ব্রহ্মবিদ্যালয়কে শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তরে বলিলেন,—যদি না পারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তুলিয়া দিব। শুধু সেবা-বিভাগই রাখিব।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—ভারতীয়তাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলিতে আপনি কি বোঝেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—এখন ভারত পরাধীন। এখন ইংরেজের সংশ্রবে যা কিছু গড়ব, সবই অভারতীয় হ'য়ে যেতে বাধ্য। কারণ, ওরা প্রভু, আমরা দাস। ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখন হয়ত ইংরেজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতিকেই সামান্য অদল-বদল ক'রে নিলে ভারতীয়তা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হবে। পরাধীন জাতি উদার মনে প্রভুর জাতির সংশ্রব কত্তে পারে না। স্বাধীন জাতি নির্ভয়ে সর্ব্বজাতির সংস্পর্শে গিয়েও নিজের সত্তা বজায় রাখতে পারে। শিক্ষার ব্যাপারে এই জন্যই আমাদের অন্তরে একটা সুস্পষ্ট বিদ্রোহ জেগে রয়েছে।

বিদ্যা সেবা-শুল্কা

পুপুন্‌কী আশ্রমে একটী বিদ্যালয় খোলা হইল, চতুর্দ্দিকের গ্রামবাসী ছাত্রেরা আসিয়া তাহাতে পাঠ আরম্ভ করিল। প্রথম সময়ে পাঁচ সাতটীর অধিক ছাত্র আসিল না। ক্রমশঃ ছাত্র বাড়িতে লাগিল।

আশ্রমের বিদ্যালয়-বিভাগে নিয়ম করা হইল যে, কোনও ছাত্রকে এখানে বেতন দিতে হইবে না। কিন্তু দৈনিক এক ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা করিয়া আশ্রমের ভূমিতে কোদাল-গাতি চালাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই নিয়মের ফলে অনেক ছাত্র কমিয়া গেল, দ্বারিকা গ্রামের ছাত্রেরা ত' আশ্রমকে একেবারে বয়কটই করিল। অভিভাবক-সম্প্রদায় এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কেহ কেহ আশ্রমকে কটূক্তি পর্য্যন্ত করিতে ছাড়িলেন না। শ্রীশ্রীবাবামণি দ্বিধাহীন ভাষায় সকলকে জানাইয়া দিলেন যে,—যাহাদের ছেলেরা চন্দন-বিলাসীর জীবন যাপন করিবে, ত্যাগীরা তাহাদের জন্যে আত্মোৎসর্গ করিতে সম্মত নহেন, তাঁহারা তাঁহাদের জীবন-দানের বিনিময়ে শক্তচরিত্র, দৃঢ়বাহু, শ্রমনির্ভীক ছাত্রই গড়িতে চাহেন; সুতরাং এই বিষয়ে কাহারো কোনও আবদারে কর্ণপাত করা হইবে না,—ছাত্র যদি নাই আসে, তবে শুধু শালগাছগুলিকে পড়ান হইবে।

লোকমনোরঞ্জনের বুদ্ধি সম্যক্ বিসর্জ্জন দিয়া শুধু আদর্শের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া এইভাবে আশ্রমের বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল। পাঠগৃহ নাই, আম্রচ্ছায়ায় বিদ্যালয় বসিল।

দ্বারিকা গ্রামের দুইটী বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি আশ্রমের খুবই হিতৈষী। তাঁহারা হইতেছেন শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীতারিণীচরণ খাওয়াশ। তারিণীবাবুর ভক্তিশ্রদ্ধার কোনও তুলনাই হয় না।

উভয়েই আশ্রমে শুভাগমন করিলেন। ইঁহারা স্থানীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা।

অতুলবাবু বলিলেন,—ভদ্রলোকের ছেলেরা আশ্রমে এসে মাটি কাটবে, গাইত-কোদাল চালাবে, এটা স্থানীয় লোক বড় অপছন্দ করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্ষত্রিয়-কন্যারা প্রায়শঃই বীর্য্যশুল্কা। বীরত্ব দেখিয়ে তবে তাদের জয় কত্তে হয়। দৃষ্টান্ত, দ্রৌপদী, সীতা, সুভদ্রা, সংযুক্তা। আর ব্রহ্মকন্যা বিদ্যাদেবী হচ্ছেন সেবা-শুল্কা। গুরুকে সেবা ক'রে তবে তা লাভ কত্তে হয়।

তারিণীবাবু বলিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ বেদব্যাস। আপনার কথা কাটার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু আমাদের সংস্কারে বড় বাধে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—ভ্রান্ত সংস্কারকে পচা ইন্দুরের মত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিন। কুসংস্কারকে ত্যাগ করার মধ্যেই ত জীবন্ত থাকার পরিচয়।

কথা শুনিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকেরা সন্তুষ্ট মনে ঘরে ফিরিলেন।

আশ্রমের আর্থিক অবস্থা

কুমিল্লা হইতে নূতন আর একজন সহকর্ম্মী, ভ্রাতা প্রবোধ গুপ্ত অল্প কয়দিন হয় আশ্রমে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি আবার এমন একখানা গুরুতর অসুখ নিয়া আসিয়াছেন যে, কোনও প্রকার শ্রমজনক কার্য্যই করিতে পারেন না, সময় সময় অত্যধিক দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত নিজের বাসনখানা পর্য্যন্ত নিজে মাজিতে অক্ষম হন। শ্রীশ্রীবাবামণির শরীরও অত্যন্ত অসুস্থ, গলা দিয়া মাঝে মাঝে রক্ত ত' পড়িতেছেই, সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা এবং বুক-ব্যথাও প্রচুর। কথাবার্ত্তা একপ্রকার বন্ধ। কর্ম্মীহীন আশ্রম, অন্নহীন কর্ম্মী, উপকরণহীন অন্ন,—ইহাই আশ্রমের বৈশিষ্ট্য। কে কাহার শুশ্রূষা করিবে, কি দিয়া কে কাহার রুগ্ন-শরীর বলাধান করিতে চেষ্টা পাইবে ? দুগ্ধ এদেশে সপ্ত আশ্চর্য্যের অন্যতম। কারণ, গরুর কেহ যত্ন করে না, যত্ন জানেও না।

ছিন্ন-পত্র

১০ই মাঘ হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবামণি যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতকগুলি ছিন্নাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

রুগ্ন দেহ ও রুগ্ন মন

রুগ্ন দেহ লইয়াও কাজ করা যায় কিন্তু রুগ্ন মন লইয়া নহে। আমি আমার রোগজীর্ণ, দুর্ব্বল, কাতর দেহ লইয়া একটা বিস্তীর্ণ অরণ্য উৎখাত করিবার কাজে লাগিয়া গিয়াছি। ভয়-ভীতি, সংশয়-সন্দেহ কিছুই মনে ঠাঁই পায় নাই। আর, তোমরা নিজ নিজ চিরপরিচিত বান্ধববর্গের মধ্যে থাকিয়া সুস্থ দেহ সত্ত্বেও সুস্থ মনে কাজ ধরিতে পারিতেছ না। মন দেহের কাণ্ডারী। কাণ্ডারী রুগ্ন হইলে নৌকা ডোবে বা বিপথে চলে। কাজ বন্ধ কর। মনকে আরোগ্য-শালায় প্রেরণ কর। নীরোগ মন নিয়ে কাজে নাম।

থামিতে শিখ

"আশ্রম" "আশ্রম" করিতেছ কিন্তু আসল আশ্রমের জন্ম কয়েক একর জমির উপরে নহে, শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর একখানা সদা-সন্তুষ্ট মনের উপরে। আমি যখন আশ্রম গড়িবার কল্পনাও করি নাই, সম্ভবতঃ তখন হইতে তোমরা এক এক জনে এক একটা আশ্রম চালু করিয়াছ। কেহ করিয়াছ আত্মাভিমানের তৃপ্তিচেষ্টা, কেহ করিতেছ ইন্দ্রিয়-সুখের পরিতর্পণ! তোমার মতন কর্ম্মী নাই, এই অভিমানে যখন স্ফীত হইতেছ, তখন তোমার পুণ্য আশ্রমের স্বর্গীয় আবহাওয়া অহঙ্কারের মদির-গন্ধে অপবিত্র

হইতেছে। গৃহে স্নেহের পাত্র পরিজনদের উপেক্ষায় অবজ্ঞায় ফেলিয়া রাখিয়া যখন আশ্রমে বসিয়া অন্যের সহিত স্নেহ-প্রীতি-মমতার অত্যভিনয় করিতেছ, তখন তোমার আশ্রম যে কুটিল জটিল পঙ্কিল সংসারেরও বাড়া হইয়া যাইতেছে। চলিতে চলিতে থামিয়া যাইবার সামর্থ্য অর্জ্জন কর বাবা, চলার পর কেবল চলা অনেক সময়ে চলার বিঘ্ন-উৎপাদন করে। আত্ম-পরীক্ষা করিতে শিখ, প্রয়োজন মত থামিতে শিখ।

অজ্ঞানের সমাজ-সেবা

পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া জগতের মহৎ কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে পুপুন্‌কী-আশ্রমে চলিয়া আসিতে চাহিতেছ। এই চাওয়া যে তোমার হুজুগ নহে, তাহার সম্পর্কে নিশ্চয়তা কি? বিদ্যার্জ্জন জীবনের এক পরম তপস্যা। তাহাতে উপেক্ষা করিতে উপদেশ আমি দিতে পারিব না। পার ত' কৃতবিদ্য হইয়া আশ্রমে আসিও। তখন তোমার বিদ্যাবত্তা তোমাকে সমাজ-সেবার ব্যাপক অধিকার ও যোগ্যতা দিবে। অজ্ঞানের সমাজসেবা অনেক স্থলেই বড় সঙ্কীর্ণ হয়।

অনির্ব্বাণ দীপ

গ্রামে গ্রামে স্বয়ংসম্পূর্ণ যে বিদ্যাবিতরণের কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিতেছিল, দেখিও, সেইগুলি যেন বন্ধ হইয়া না যায়। আমি হঠাৎ এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়া পুপুন্‌কীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া আমার আরব্ধ কাজ ও সাধের স্বপ্ন মিথ্যা হইয়া গেলে চলিবে না। একজনে যাহা সুরু করে, অপরে তাহা চালাইয়া যাইতে পারে,—একের জ্বালান দীপশিখা অপরের

ঘৃত-নিষেকে সুদীর্ঘকাল প্রদীপ্ত হইয়া থাকিতে পারে,—ইহাই ত পশুপক্ষীর কাজের সহিত মানুষের কাজের পার্থক্য। গ্রামের পুকুর পরিষ্কার করিয়া গ্রামীণগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মানার্ঘ্য তুচ্ছ পরিমাণ অর্থটুকু একটা নৈশ বিদ্যালয়কে বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। গ্রামের রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া অর্থ-সংগ্রহের কাজ অপমানের নহে, লজ্জারও নহে। আমার প্রজ্জ্বলিত দীপ অনির্ব্বাণ রাখ।

রাজনীতি ও সত্যরক্ষা

রাজনৈতিক কর্ম্মধারা তোমাদের অনেককে বড় তীব্র ভাবে টানিতেছে। একটা জাতির ভালমন্দে রাজনীতি বাদ দিবার মতন জিনিষ নহে। আমি রাজনীতি চর্চ্চা করি না বলিয়া তোমাদের রাজনীতি চর্চ্চা করিবার অধিকার বাতিল হয় নাই। কিন্তু রাজনীতির পথ বড় অশান্তির পথ। সত্যরক্ষা করিয়া এই পথে চলা প্রায় অসম্ভব। লক্ষ্য-লাভের প্রয়োজনে মিথ্যাকে সত্যের রূপ দিতে হয়, অর্দ্ধ সত্যকে পূর্ণ সত্য বলিয়া চালাইতে হয়। ইহাতে নৈতিক দৃঢ়তা কমিয়া যায়। সুতরাং হিসাব করিয়া কাজ করিবে। তোমার স্বাধীনতার উপরে আমার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তুমি নিজে নিজের বিবেকের উপরে উৎপীড়ন না কর, তাহা দেখিও।

আদর্শের ডাক

আমাকে কোনও রাজনৈতিক দল-বিশেষের মুখ্য নেতা বলিয়া প্রচার করিয়া তাহার ফল-স্বরূপে তোমাদের রাজনৈতিক কর্ম্মীর গোষ্ঠীবৃদ্ধি করার কার্য্যটী আমি ভাল মনে করিতেছি না। ইহার

কুফল নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে। তোমাদের রাজনৈতিক মতামত সরল ও সহজ ভাবে প্রচার করিয়া যাইবার ফলে যাহারা তোমাদের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তোমাদের দলভুক্ত হইবে, একমাত্র তাহাদের কাছেই তোমরা দীর্ঘকাল বশংবদ সেবা চাহিবার প্রত্যাশা করিতে পার। রাজনীতির প্রচারকেরা অমনিই মিথ্যা-প্রচারকে তত ভয়ের দৃষ্টিতে দেখেন না, উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই সাধারণতঃ তাহাদের লক্ষ্য হইয়া থাকে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা আর ইচ্ছাকৃত মিথ্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। আদর্শের ডাকে মানুষকে কাছে টান, সে ডাকে স্থায়ী সুফল ফলিবে। চালাকী করিয়া কি স্থায়ী মহৎ কাজ হয়?

খাঁটি বাঙ্গালী

বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এখনও বড় বড় নেতারা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু বড় বড় সেবকেরা কি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন? সর্ব্বজাতিতে সর্ব্বজীবে সেবার লক্ষ্য হইয়া অগ্রসর হইবার মনোবৃত্তিরই নাম বাঙ্গালীত্ব, নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করিয়া দলাদলি করিবার নাম বাঙ্গালীত্ব নহে। তখনই তুমি খাঁটি বাঙ্গালী, যখন তুমি বিশ্বমানবের সঙ্গে এক।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা

সাম্প্রদায়িক উগ্রতা এবং প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা দুইটাই অতি মারাত্মক বস্তু। ইহারা পারদের মত বিপজ্জনক বিষ। গন্ধকের জারণে ইহাদের নির্দ্দোষ না করিতে পারিলে নিষ্পাপ জীবন-যাপন কঠিন হইয়া পড়ে। এই দুই বিষ যেখানে কাজ করিতেছে,

সেখানে অত্যাচারী ও উৎপীড়িত এই উভয়েই ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। একজন ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় মদমত্ততায়, অপরে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় কাপুরুষতায়।

ধর্ম্মনগর,

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

ব্রিটিশ ত্রিপুরার একটী ক্ষুদ্র পল্লী ধর্ম্মনগরে প্রতিষ্ঠিত একটী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভাতে সভাপতিরূপে বৃত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে কুমিল্লার বিখ্যাত স্বদেশ সেবক শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার মজুমদার, ত্রিপুরা কংগ্রেস-কমিটীর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নেতৃবর্গও শুভাগমন করিয়াছেন।

অভিক্ষার আদর্শ

প্রসঙ্গক্রমে অভিক্ষার কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই দাবী কখখনো করি না যে, দেশ-সেবার কর্ম্মতালিকা থেকে ভিক্ষা-প্রার্থনাকে নির্ব্বাসিত করেছি ব'লে দেশ আমাকে সম্মানিত করুক। অভিক্ষাকে যখন প্রচার করি, তখন তা' করি শুধু জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার মুখ চেয়ে, ব্যক্তিগত সম্মাননার মুখ চেয়ে নয়। Originality (মৌলিকত্ব) আমি claim (দাবী) করি না, কত্তে পারিও না, কারণ, অভিক্ষা ভারতে নূতন নয়। প্রাচীন যুগে ঋষিমাত্রেই অযাচক ছিলেন। মাত্র "অভিক্ষা" এই শব্দটাই আমার সৃষ্টি।

বসন্তবাবু বলিলেন,—কিন্তু এই অভিক্ষার কথা আজ আপনার মুখে নূতনের মতই শুনাচ্ছে। "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" নীতিকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রয়োগ কর্ব্বার জন্যই আমরা অসহযোগ আন্দোলনে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ ক'রে যোগ দিয়েছি।

Political Work (রাজনৈতিক কর্ম্ম) যাঁরা sincerely (একনিষ্ঠভাবে) কচ্ছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই Principle (মূলনীতি) হচ্ছে অভিক্ষা বা বাহুবল। কিন্তু আপনি যেমন ছোট-বড় সব কাজে জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের Priciple (নীতি)কে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাচ্ছেন, এমনটী ক'রে Self-helf (স্বাবলম্বন)কে আমরা কেউ কখনও ভাবিনি। এটা সম্পূর্ণই অভূতপূর্ব্ব।

কামিনীবাবু বলিলেন,—আপনার "অভিক্ষা" কথাটা বড্ডই আমার প্রাণে লাগল। বাস্তবিক প্রার্থনাহীনতাই হচ্ছে প্রকৃত পন্থা। সৎকাজে ভিক্ষা দিতে দিতে দেশের লোক একেবারে ত্যক্ত-বিরক্ত হ'য়ে গেছে, দিতে যেমন পারে না, দেবার তেমন রুচিও নেই। আর স্থানে-অস্থানে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেশ-কর্ম্মীরাও যথেষ্ট জ্বালাতন হচ্ছেন।

বৈচিত্র্য স্বভাবের নিয়ম

যথাকালে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি-পদে বৃত হইলেন। সকলের বক্তৃতা শেষ হইলে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় সামঞ্জস্য স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক শালেও বন হয় না, তালেও না, তমালেও না। সকল রকমের গাছ নিয়ে তবে হয় বন। বনের মধ্যে সহস্র প্রকারের বৃক্ষ আছে ব'লেই যে এক বৃক্ষ অপর বৃক্ষের সাথে কলহ কর্ব্বে, তা' নয়। আম গাছের পাশে কাঁঠাল গাছ থাকুক, কাঁঠালের পাশে জাম গাছ থাকুক,—এতে ঝগড়ার কিছু নেই। বৈচিত্র্যই জগতের নিয়ম, বৈচিত্র্যকে বৈরিতা

ব'লে মনে করা ভ্রম। একটা লোকের মুখ আর একটা লোকের মুখের মতন হয় না, একজনের ভাব ও ভাষা আর এক জনের ভাব ও ভাষার মত হয় না,—এর জন্য কি মানবজাতি সমাজ-গঠনে অক্ষম হ'য়েছে? শত বিভিন্নতা থাকলেও এই বিভিন্নতার মধ্য দিয়েই দশ জনে মিলে সমাজ গ'ড়ে তোলে। আজকে ভারতবর্ষের অভ্যুদয়ের চিন্তা শত শত মনীষীর মস্তিষ্ককে আলোড়িত কচ্ছে। আজকে এই কথাটুকু ভেবে দেখা দরকার যে, দেশের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট দলের গণ্ডীর ভিতর নিয়ে না ফেলতে পার্লে দেশের মুক্তি নেই, এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। শত শত প্রকারের প্রতিষ্ঠান দেশ-মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াক, তাদের বৈচিত্র্যকে নষ্ট কর্ব্বার কোনো প্রয়োজন নেই। কেন না বৈচিত্র্যহীনতাই ঐক্য নয়, লক্ষ্যের যোগে এক থাকাই প্রকৃত ঐক্য। আসল কথা, দেশের সেবার লক্ষ্য থাকা চাই আর, জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা চাই। বনে যত প্রকারের গাছই জন্মাক না কেন, ক্ষতি নেই; পরন্তু গাছ যেন মাটি থেকেই রস আহরণ করে, মাতৃবক্ষ যেন ছেড়ে না যায়, আর প্রত্যেকের যেন লক্ষ্য থাকে ঊর্দ্ধমুখে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন ব'লেই যে নৈতিক উন্নতির আন্দোলন থাক্‌বে না, রাষ্ট্রনীতি-পন্থী ব্যতীত অপর কেউ সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা কত্তে পার্ব্বেন না, তা নয়। পরন্তু নিজ নিজ অধিকার, রুচি, সামর্থ্য, প্রকৃতি ও প্রভাব বুঝে প্রত্যেকের উচিত নিজের মনের মতন কর্ম্মপন্থা বের ক'রে নেওয়া এবং তারই অনুসরণে জীবনপাত করা। সকল পথিক একই পথে চলুক, এ কখনো দাবী হ'তে পারে না। লক্ষ্য-লাভ-প্রযত্নে প্রত্যেক পথিক জীবনোৎসর্গ কত্তে প্রস্তুত

হোক্‌, নিঃস্বার্থ নিষ্কপট হিতবুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হোক্‌, যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু মহার্ঘ্য, সব সে তার আদর্শের পদতলে নির্ম্মমভাবে দ্বিধাহীন চিত্তে বলি দিতে সমর্থ হোক্‌, এইটুকুই হবে একমাত্র দাবী। রাজনীতির পথে যে নেমেছে, তাকে নিজ পথ ত্যাগ ক'রে আস্‌তে হবে না। সে তার সিং ভেঙ্গে এসে বাছুরের দলে মিশুক, এটা তার উপরে সঙ্গত দাবী হ'তে পারে না। তার উপরে একমাত্র দাবী হচ্ছে নির্ভীক মৃত্যু-বরণের, নিঃশঙ্ক দুঃখ-সাধনার, তার উপরে দাবী হচ্ছে কারাবাস, নির্ব্বাসন, প্রাণদণ্ড হাসিমুখে গ্রহণ করার জন্য আত্মপ্রস্তুতি। নৈতিক উন্নতির চেষ্টায় যে নেমেছে, তাকেও নিজ-লক্ষ্য বর্জ্জন কত্তে হবে না, তার উপরে দেশের দাবী হচ্ছে, নিজের সুখকে, নিজের ভোগকে, নিজের সর্ব্বপ্রকার লৌকিক উন্নতিকে পদতলে পিষে পিষে মেরে ফেলা, সকল স্বার্থবুদ্ধিকে বজ্রাঘাতে চূর্ণ ক'রে আত্মসুখ কামনার সেই চিতাভস্মের উপরে হৃৎপিণ্ড উজাড় ক'রে তাজা রক্তের অঞ্জলি ঝলকে ঝলকে ঢালা। আসল কথা, চাই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-মনোন্মাদকারী মোহন-বাঁশরী-নিনাদ শুনা, চাই জাতি-কুল-মান বিস্মৃত হওয়া, চাই নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজাতেন, রাধা শুন্‌তেন "রাধা, রাধা", চন্দ্রাবলী শুন্‌তেন "চন্দ্রা, চন্দ্রা", বিশাখা শুন্‌তেন—"বিশাখা, বিশাখা",—ললিতা শুন্‌তেন,—"ললিতা, ললিতা", সবাই পাগল হ'য়ে ছুটে যেতেন যমুনার তীরে। আজও নব-যুগের আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সে শাশ্বত-বাঁশরী বাজাচ্ছেন, দিকে দিকে ত্যাগের আহ্বান শুনাচ্ছেন, আমরা নিজ নিজ অধিকার-অনুযায়ী কেউ শুনছি,—"রাজনীতি, রাজনীতি", কেউ শুন্‌ছি,—"ধর্ম্ম, ধর্ম্ম", কেউ শুনছি,—

"সমাজ, সমাজ"। যার কাণ যেমন, সে শুন্‌ছে তেমন,—কিন্তু বাঁশরী সেই এক শ্রীকৃষ্ণেরই, আর কারো নয়। যে যেই দিক্ দিয়ে যতটুকু উৎসর্গ করুক, সেবা হবে সেই দেশমাতৃকারই, আর কারো নয়। বৈচিত্র্যকে যেন আমরা বিদ্বেষ ব'লে মনে না করি, বৈচিত্র্যের গলায় যেন ফাঁসীর দড়ি লট্‌কাতে আমরা না যাই। বৈচিত্র্য স্বভাবেরই নিয়ম, আত্মনাশ ব্যতীত বৈচিত্র্য-নাশের আর উপায় নাই।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

ভবিষ্যৎ ভারতের ধর্ম্ম

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ট্রেনযোগে পাঘাচাং স্টেশনে নামিলেন, নিকটবর্ত্তী হাবলাউচ্চ গ্রামে যাইবেন। পথিমধ্যে জাতীয় নেতাদের নানাবিধ মতামতের আলোচনা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ভারত এক অভিনব ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্বে, তার নাম সেবা-ধর্ম্ম। এখন পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের পূর্ণ উদ্দীপন হয়নি। যেটুকু হয়েছে সেইটুকু অতি ভাসা-ভাসা। কিন্তু শীঘ্রই হবে, সহস্র সহস্র ত্যাগীর জীবনোৎসর্গের ফলে। সেদিন একবাক্যে সকলে এই ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার কর্ব্বে। কিন্তু তাই ব'লে ভেবো না যে, ব্যক্তিগত সাধন-ধর্ম্ম কাউকে বর্জ্জন কত্তে হবে। শাক্ত শাক্তই থাক্‌বে, বৈষ্ণব বৈষ্ণবই থাক্‌বে, ব্রাহ্ম ব্রহ্মকেই উপাসনা কর্ব্বে। প্রাণের আধ্যাত্মিকতার তৃষ্ণা মিটাবার জন্যে মুসলমান খোদাতালারই পূজা কর্ব্বে, হিন্দু বেদ-বিধানই মান্‌বে, খ্রীষ্টান খ্রীষ্টকেই ভজ্‌বে। নিজ নিজ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে প্রত্যেকে থাক্‌বে পৃথক, পরন্তু সেবার ধর্ম্মে সবাই হবে

এক। সেবা-ধর্ম্মের অনুশীলনের জন্যে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথকে বিসর্জ্জন দেওয়ার দরকার পড়্‌বে না।

সেবা-ধর্ম্মের অন্তরায়

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—কিন্তু এই সেবা-ধর্ম্মের সাধন-পথে সহস্র শত্রু, সহস্র অন্তরায়, সহস্র কণ্টক। সেবা-ধর্ম্মের প্রথম শত্রু কাপুরুষতা, দ্বিতীয় শত্রু স্বার্থপরতা, তৃতীয় শত্রু আত্মাভিমান। এর একটা একটা ক'রে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌তে হবে। সমগ্র জাতিকে সাহসিকতার তেজে দৃপ্ত ক'রে তুল্‌তে হবে সহস্র সহস্র নির্ভীক জীবনের আত্মবলির দৃষ্টান্তের দ্বারা। সমগ্র জাতিকে স্বার্থত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত কত্তে হবে সহস্র সহস্র পরহিতব্রতের প্রাণদানের দ্বারা। সমগ্র জাতিকে আত্মাভিমান-বর্জ্জিত ও কর্ত্তৃত্বলোভ-লেশহীন ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে সহস্র সহস্র ভগবদ্দর্শীর নিরভিমান কর্ম্মসাধনার দ্বারা। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ'য়েও কেমন ক'রে নিজেকে সকলের দাসানুদাস ব'লে জান্‌তে হয়, নিজের বিরাট প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে দশের সামান্য প্রয়োজনকেও কেমন ক'রে বড় ক'রে দেখ্‌তে হয়, তার জন্য স্বার্থ বলি দিতে হয়, কেমন ক'রে মৃত্যুকে তিলে তিলে পলে পলে আস্বাদ ক'রে মরতে হয়, এসব দৃষ্টান্ত দেশবাসীকে সহস্র সহস্র বার দেখাতে হবে।

মহাভাবের জাগরণে দৃষ্টান্ত ও বক্তৃতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এই মহাভাবকে উদ্বুদ্ধ কর্ব্বার জন্য বক্তৃতাই যথেষ্ট নয়, চাই জ্বলন্ত সব দৃষ্টান্ত, চাই

অনুসরণযোগ্য আদর্শ। দার্শনিক আলোচনায় জীবন জাগবে না, জাগবে সুকঠোর চিরদারিদ্র্য-বরণে, লোক-কল্যাণে চিরদুঃখ-বরণে, নির্ভীক নিঃশঙ্ক মৃত্যু-বরণে। প্রাণ জাগে আত্মদাতার কর্ম্মসাধনার দৃষ্টান্তে। এসব দৃষ্টান্ত দুর্ল্লভ, কিন্তু সুলভ ক'রে তুলতে হবে। তবে না সমগ্র জাতি সেবাধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হবে!

সুধন্য দেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবা মানে যার যা' অভাব, তার তা' পূরণ করা। সকলেই সকলের সকল অভাব পূরণ কত্তে পারে না। দেশের, দশের, সমাজের যে অভাব পূরণ যে ব্যক্তি কত্তে সমর্থ, সে প্রাণ দিয়ে হ'লেও সেইটুকু কর্ব্বেই। এরই নাম সেবাধর্ম্ম গ্রহণ। অজ্ঞ মুচি মুদ্দফরাস থেকে সুরু ক'রে শুচিতম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত, দীনাতিদীন অন্নহীন দরিদ্র থেকে ধনপতি কুবের পর্য্যন্ত, অজ্ঞান মূর্খ থেকে সুরু ক'রে জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পর্য্যন্ত, প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী জীবরূপী নারায়ণের সেবার জন্য উন্মুখ হবে, তখনই হবে দেশের সুদিনের সমাগম। সেই দেশই সুধন্য দেশ, যেখানে প্রত্যেকটী মানবাত্মা পরের সেবায় উন্মুখ, যেখানে আত্মসুখ-লালসার নাই কৌলীন্য বা সমাদর।

সেবা-ধর্ম্মের মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সেবাবুদ্ধি আমাদের নেই ব'লেই আমরা এত আত্মকলহ-পরায়ণ, এত পরধর্ম্মদ্বেষী, এত অসহিষ্ণু এবং ঈর্ষ্যাকাতর। সেবকের মন সদ্যঃস্নাত শিশুর

শরীরের মত সুশ্রী। সেবকের মন শিশিরস্নাত পুষ্পদলের ন্যায় সুন্দর। সেবকের মন বরফ গলা জলের মত প্রীতি-প্রদ শীতল। সেবাধর্ম্মই ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বেষ প্রশমন কর্ব্বে, সেবা-ধর্ম্মই মিথ্যার সহায়তায় সত্যকে প্রতিষ্ঠার ভ্রান্তিময় প্রয়াসের মূলোচ্ছেদ কর্ব্বে, সেবাধর্ম্মই অশান্তিপূর্ণ-জগতে পরম শান্তির মলয়ানিল প্রবাহিত কর্ব্বে।

হাবলাউচ্ছ, ত্রিপুরা,
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

প্রচ্ছন্ন ভোগ-কামনা ও তাহার প্রতিকার

অদ্য সন্ধ্যার পরে আলোচনা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বড় বড় কাজ ত' যেন আরম্ভ কর্ব্বি, কিন্তু দেখবি, দু'দিন পর পরেই সহকর্ম্মীরা সব দল ভেঙ্গে পালাবে। কিন্তু তা' ব'লে ভাবলে চলবে না। ভোগের প্রচ্ছন্ন কামনা কত ত্যাগীকে পথভ্রষ্ট ক'রে দিচ্ছে, কত সন্ন্যাসীকে দিয়ে সংসারীর ঘানি টানিয়ে নিচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। স্বাভাবিক ত্যাগবুদ্ধি যাদের মধ্যে রয়েছে, মহাপুরুষদের ডাক শুনে তারা এক দৌড়ে সংসার ছেড়ে চ'লে আসে। কিন্তু গেরুয়া পরলেই ত' আর লুকানো ভোগ-সংস্কার যায় না। জোঁকের মত সে লেগে থাকে। তাকে দূর করবার জন্যে চাই চূণের জল অর্থাৎ সাধন। সাধন কত্তে কত্তেই ভোগ-সংস্কার কেটে যায় এবং ত্যাগ-সংস্কার বৃদ্ধি পায়। যে সাধন কর্ব্বে না অথচ গেরুয়া পরবে, তার গেরুয়া কলঙ্কিত হবে দেখতে না দেখতে। এই যে চারিদিকে এত ব্যভিচার দেখতে পাচ্ছ, গুরু সেজে কত সর্ব্বত্যাগী তপস্বী সরলপ্রাণা শিষ্যাণী-

দিগকে ধর্ম্মভ্রষ্টা কচ্ছেন, সতী-শিরোমণিকে নরককুণ্ডে ডুবিয়ে তারপরে সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছেন,—"স্ত্রীলোক ছাড়া সাধন হয় না, সংযোগী না হ'লে সিদ্ধি হয় না, পরকীয়া প্রেম ছাড়া রস হয় না,"—তার কারণ হচ্ছে এঁদের সাধনের অভাব। সাধনে লেগে থাক্‌লে, পড়ি-পড়ি ক'রেও সাধুরা পড়েন না, আর যাঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে পঙ্কে ডুবে যান, তাঁরাও দেখ্‌তে না দেখ্‌তে অতীতের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে দিব্য-শ্রী-দীপ্ত নব-বপু লাভ করেন, সমগ্র জীবন-ব্যাপী মিথ্যার বোঝা ব'য়ে ব'য়ে তাঁদের বেড়াতে হয় না।

জন্মজ কাম

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ নরনারী প্রচ্ছন্ন কামের তাড়নায় অন্ধ হ'য়ে, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি কচ্ছে এবং নিজেদের ভিতরের এই অব্যক্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে বাইরে নানা সভ্য পোশাক পরিয়ে গোপন কত্তে চেষ্টা কচ্ছে। এই প্রচ্ছন্ন কাম-তাড়নার কারণ হচ্ছে তিনটী। প্রথমতঃ মানুষগুলি জন্ম নিচ্ছে সব অন্ধ কামের ভিতর দিয়ে, সদুদ্দেশ্যহীন, উচ্চতর অনুভূতিহীন, কল্যাণ-বুদ্ধিবিহীন সঙ্গমের ফলে। কোন বাপ-মা সঙ্কল্প ক'রে সন্তান-জনন কচ্ছে না, সবাই কচ্ছে ছাগ-ছাগীর মত জীবন-যাপন, শূকর-শূকরীর মত ব্যবহার। সন্তান এরা চাচ্ছে না, চাচ্ছে সবাই দেহের সুখ, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, আর তারই ফলে ছেলে-মেয়েতে ঘর ভ'রে যাচ্ছে। বাপ-মায়ের পশুভাব ছেলে-মেয়েরা পাবে না কেন?

সৎসঙ্গের অভাবজ কাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বর্ত্তমান মানব-মানবীর প্রচ্ছন্ন লালসাবৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, সৎসঙ্গের অভাব। মায়ের পেট থেকে প'ড়েই যদি শিশু তার ঠাকুরমায়ের মুখে শোনে বিয়ের খবর, আর পায় দাম্পত্য-ব্যবহারের ইঙ্গিতপূর্ণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাতে-খড়ি না দিতেই যদি শিশু বকাটে ছেলেমেয়েদের সাথে পাতায় বন্ধুত্ব, আর সখীত্ব, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবার মুখের কথায় আর দৈনন্দিন ব্যবহারে যদি সে নিয়তই বুঝতে বাধ্য হয় যে, স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির মধ্যে সম্বন্ধটা শুধু শয্যাসঙ্গীর,—তবে কেন তার মনে নানা ভোগ-বুদ্ধি বিষ্ঠার কৃমিগুলোর মত কিলিবিলি ক'রে উঠবে না?

পূর্ব্বজন্মের ভোগ-সংস্কার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রচ্ছন্ন কামের তৃতীয় কারণ হচ্ছে, পূর্ব্বজন্মের অতৃপ্ত ভোগ। ভোগাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা দেহ-ত্যাগ ক'রেছে, এজন্মে তাদের মনে ভোগ-লালসা থাকবেই থাক্‌বে; এসব ভোগ-লালসা শুধু গেরুয়া কাপড় দিয়ে ঢাকা চলবে না। যতক্ষণ না এদের সমূল উচ্ছেদ-সাধন কত্তে পাচ্ছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গেরুয়ার সম্মান পদে পদে বিপন্ন। গেরুয়া পরলেই কি সাধু হয়, সাধু হয় সাধন কর্ল্লে। সাধন কত্তে কত্তেই বিগত জন্মের ভোগ-সংস্কার কেটে যায়। যেখানে ভোগের বন্যা না বইলে নিষ্কৃতি ছিল না, সাধনের ফলে সেখানে হয়ত জলের একটা ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গ দেখা দিয়েই থেমে যায়। যেখানে কুম্ভীপাকে প'চে মরতে হ'ত, সাধনের ফলে সেখানে যুধিষ্ঠিরের মতন

একবার নরক-দর্শনেই মুক্তি হ'য়ে যায়। সাধন যদি তীব্র হয়, তা হ'লে এই দুর্ভোগটুকুও ভুগতে হয় না, একেবারেই নিষ্কলঙ্ক নিষ্কলুষ জীবন লাভ হ'য়ে যায়। সাধন যদি করে, আর কুসঙ্গ যদি বর্জ্জিত হয়, তাহ'লে প্রথম জীবনের অসৎসঙ্গের কুফলগুলিও আস্তে আস্তে দূর হ'য়ে যায়। থাকে শুধু জন্মজাত প্রচ্ছন্ন সংস্কার। যাঁরা অসাধারণ মানুষ, একমাত্র সাধন কত্তেই যাঁরা তনু-মন-জীবন-যৌবন সব দিয়ে দেন, তাঁদের মনুষ্য-দেহ দেব-দেহে পরিণত হয়, কামজ দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, কুলজ কামের অধিকার সে-দেহের উপরে আর থাকে না। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কাম-সংস্কার বংশানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা ব্যতীত দূর হয় না। এখন যারা স্কুল-কলেজে প'ড়ছে, তারা যদি বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুদ্ধ, সংযত ও সাধনময় জীবনযাপন করে এবং বিবাহের পরে যদি স্ত্রীকে নিজের ভাবে ভাবুকা ক'রে নিয়ে সমপ্রযত্নে সাধনশীল হয়, তাহ'লে এদের ছেলে-মেয়েরা অনেকগুণ অধিক সংযমের শক্তি নিয়ে জন্মাবে। এই সব ছেলে-মেয়েরা যদি আবার এইভাবে জীবন-যাপন করে, তাহ'লে তাদের বংশে যারা জন্ম নেবে, তারাই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের নব-জন্মদাতা। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাসকে তিনপুরুষব্যাপী কর্ব্বার জন্য চেষ্টা চাই।

তিন-পুরুষ-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য তিন-পুরুষ-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য কথাটা খুব সহজ, কার্য্যটা বড় সহজ নয়। কিন্তু প্রাচীনকালে গুরু-গৃহ ছিল ব'লে এই কঠিন কাজটাই বড় সহজে

সম্পাদিত হ'য়ে যেত। যে নিজে একবার গুরু-গৃহে বাস ক'রে এসে গৃহী হ'ত, সে তার ছেলেদের গুরু-গৃহে পাঠাতে ভুল্‌ত না। কালক্রমে দেশ থেকে গুরু-গৃহ উঠে গিয়েছে, এখন এসেছেন প্রাইভেট টিউটারের দল। পুরুলিয়ার ঋষিকল্প নিবারণবাবু সেদিন বল্লেন যে,—যেদিন থেকে আচার্য্য দ্রোণ আর কৃপ শিষ্য-গৃহে এসে আস্তানা নিলেন, সেদিন থেকেই ভারতের প্রকৃত অবনতি আরম্ভ হ'য়েছে। তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে আমি একমতাবলম্বী। সেই গুরু-গৃহকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে হবে এবং মুষ্টিমেয় হ'লেও দেশের মধ্যে এমন একটা বিশিষ্ট কর্ম্মীদল গ'ড়ে তুলতে হবে, যাঁদের রাষ্ট্রিক, ধার্ম্মিক, আর্থিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আত্মোৎসর্গের গোড়াটা বেঁধে দেওয়া হবে গুরু-গৃহের ব্রহ্মচর্য্যে।

শিক্ষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, চিত্রে ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ পুপুনকীর কর্ম্মীরা শূন্যোদরে জঠর জ্বালা সহ্য ক'রেও মরুভূমির মত কঠোর মৃত্তিকায় গাতি চালাচ্ছে কেন জানো ? ঐ গুরু-গৃহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায়। খাদ্যের অভাবে আজ যে তারা অনভ্যস্ত মহুয়া ফুল খাচ্ছে, আর ঢেঁড়শ পাতা সিদ্ধ ক'রে নাক-মুখ বুজে গিলছে, তাকি একটা নামজাদা ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে খোল-করতালের ধ্বনির মধ্যে অমর হ'য়ে থাক্‌বার ফন্দীতে ? তিন পুরুষ ধ'রে জাতিকে শক্তির সাধনায় ব্রতী রাখতে হবে, পুপুনকীর আয়োজন তারই জন্যে। যদিও পুপুনকীতে আশ্রম-স্থাপন আমি নিজে ইচ্ছে ক'রে করিনি, স্থান-নির্ব্বাচনে আমার কোনও হাত ছিল না, তবু যে-কোনও স্থানেই আশ্রম একটা গ'ড়ে উঠলে জর

একমাত্র উদ্দেশ্য এই হ'তেই বাধ্য যে, তিন পুরুষ ধ'রে একই কল্যাণ-ব্রতে সমাজের নরনারীগুলিকে ব্রতী রাখবার অনুকূল আবহাওয়া গ'ড়ে তুলতে হবে। আজকের গভীর জঙ্গল কাল থাক্‌বে না, আজকের দারুণ দারিদ্র্য কাল দূর হবে, আজকের কর্ম্মীর অভাব কাল পূরণ হবে, আজকের সহস্র বিরুদ্ধ অবস্থা কাল পরিবর্ত্তিত হবে এবং এই সুগভীর অরণ্যে বিদ্যুতের আলোর ঝলকমারা বিচিত্র খেলা একদিন দেখতে পাওয়া যাবে। শিক্ষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, চিত্রে, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, সেবা একদিন ফুটে উঠবে আপন মহিমায়। মনে রেখো, দেশ বা জগতে যখন যে আন্দোলনই সৃষ্টি কর, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে যতক্ষণ তা প্রচারের ব্যবস্থা না কচ্ছ, ততক্ষণ আন্দোলনের স্থায়িত্বের আশা সুদূরপরাহত।

সাহিত্য ও মহাসাহিত্য

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ অযাচক আশ্রম মহাসমুদ্রের তলায় অতি ক্ষুদ্র একটী শ্যাওলা, স্থিতি নেই, স্থিরতা নেই, তরঙ্গ-তাড়না সইতে সে অক্ষম। কাল সে মৈনাক পর্ব্বতের মত মাথা তুলে দাঁড়াতে পার্ব্বে না, একথা আমি ভ্রমেও কল্পনা করি না। কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, সেবায়, প্রচারণে, বিকাশে, বিস্তারে, রূপে, রসে সে কাল অদ্বিতীয় হ'তে পারে না, এমন কথা ভাবা ভুল। আমার নীরস কর্ম্মের অভিযানের আদ্যে, মধ্যে, অন্তে পরম-রস-বিগ্রহ-স্বরূপ একজন নিত্যকাল বিরাজিত রয়েছেন। তাঁকে আশ্রয় ক'রে মহাসাহিত্য রচিত হবে। সাহিত্য মানে সহিতের ভাব। একের সহিত অপরের

মিলন যে সৃষ্টি করে, সে হচ্ছে সাহিত্য। বিশ্বের সকলকে নিয়ে মিলন-মঞ্চ যার দ্বারা সৃষ্ট হয়, তার নাম মহাসাহিত্য। সাহিত্য কিছুর সহিত কিছুকে মিলায়, মহাসাহিত্য সকলের সহিত সকলকে মিলায়।

হাবলাউচ্চ,
১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

সাধু কে

প্রাতঃকালে নিকটবর্ত্তী অপর এক গ্রাম হইতে দইটী ভদ্রলোক আসিলেন। তাঁহারা প্রণাম করিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —সাধু কাকে বলে জানো ? যাকে দেখলে ইষ্টনাম মনে আসে।

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে পায়চারী করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—সাধু কি ? না যাঁকে দেখলে ভয় দূরে যায়, কুচিন্তা পলায়।

পুনরায় কিছুক্ষণ পায়চারী করিয়া আসিয়া বলিলেন,—যাঁর সঙ্গ কর্লে প্রাণের সদ্ভাবগুলি পুষ্ট হয়, কুভাবগুলি নষ্ট হয়, তিনিই সাধু।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

সংযম-সম্মিলনী

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট হইতে যাঁহারা যোগ-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রতি বৎসরই তাঁহারা একবার একত্র সম্মিলিত হন এবং নিজেদের উন্নতিমূলক সর্ব্ব বিষয়ে আলোচনাদি করেন। সাধারণতঃ শ্রীশ্রীবাবামণি এই সম্মিলনীর সভাপতি থাকেন এবং

যত প্রকার প্রশ্ন ও সমস্যা উপস্থিত হয়, সকলের সদুত্তর প্রদান করিয়া সংশয়চ্ছেদন করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এইরূপ সম্মেলন হইতেছে।

গত বৎসর পর্য্যন্ত এই সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট যোগ-দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই ইহাতে যোগ দিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৎসর বৎসর তোমাদের একটা সাম্প্রদায়িক সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হউক, ইহা আমার কাম্য নয়। এই সম্মিলনীতে সর্ব্ব-সাধারণকে প্রবেশাধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের ভাব প্রচারই ইহার মূল লক্ষ্যরূপে নির্দ্ধারিত হওয়া সঙ্গত।

তদনুযায়ী এবারকার সম্মিলনীকে ''সংযম-সম্মিলনী'' নাম দেওয়া হইয়াছে।

সকল সম্প্রদায় আমার

একজন এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীবাবামণি একখানা খাতা খুলিয়া তন্মধ্যে নিম্নলিখিত লেখাটুক দেখাইলেন, —যথা ঃ—

''তোমাদিগকে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্ঘভুক্ত করা বা না করা আমার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত হিতসাধনের মধ্য দিয়া জগন্মঙ্গলের প্রতি আকৃষ্ট করাই আমার ব্রত। সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই মধ্যবর্ত্তিতায় জগতে অমর হইয়া থাকা আমার লক্ষ্য হইতে পারে না। স্বভাবতঃ তোমরা কেহ কেহ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে উহাতে বাধা আমি দিব না, কেহই সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে তৎকল্পে প্রেরণাও সৃষ্টি করিব না।

জগতের সকলকে আপনরূপে পাইয়াছি বলিয়াই আমি কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নেতা নহি। ইতি—১৭ই পৌষ, ১৩৩৪ বাং।

—স্বরূপানন্দ''

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকল সম্প্রদায় আমার কিন্তু আমি কোনও সম্প্রদায়েরই নই। অর্থাৎ আমি সকল সম্প্রদায়ের।

সম্প্রদায় কখন আপত্তিকর

একজন প্রশ্ন করিলেন,—আপনার শিষ্য, প্রশিষ্য, ভক্ত এবং অনুরাগীরা যদি নিজেদের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে সম্প্রদায়ের নাম দিয়া কোনও সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করে, তাহাতে আপনার আপত্তি নাই ত' ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতক্ষণ তোমরা পরধর্ম্মদ্বেষে বিরত থাক্‌বে, পরনিন্দা পরিহার ক'রে চল্‌বে, পরানিষ্টবুদ্ধির ক্রীড়নক হ'তে অস্বীকার কর্ব্বে, ততক্ষণ আপত্তি নেই। নইলে সম্প্রদায় আপত্তিজনক।

প্রশ্নোত্তর-সভা

অদ্য বহু-জনসমাগম হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলার নানাস্থান হইতেই ব্রহ্মচর্য্যানুরাগী যুবকেরা সমবেত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দ্দেশক্রমে সকলে সমবেত-ভাবে স্তোত্র-পাঠপূর্ব্বক ''ওঁ'' কার-বিগ্রহে অঞ্জলি দিলেন। তৎপরে প্রশ্নোত্তর-সভার অধিবেশন বসিল। উপস্থিত সভ্যেরা যার-যার প্রশ্নসমূহ লিখিত-ভাবে উপস্থাপিত করিলে পর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণি ধীর-গম্ভীরকণ্ঠে একটীর পর একটী করিয়া প্রশ্নের আলোচনা

ও উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই মূল্যবান্ আলোচনা তৎকালে লিখিয়া রাখা হয় নাই। জনৈক ভক্তের দিনলিপিতে রক্ষিত কয়েকটী মাত্র কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গুরু কে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরু কে ? ব্রহ্মই গুরু। জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সেই গুরুরই প্রকাশ বা বিভূতি। সর্ব্বভূতে তিনি বিরাজমান, সর্ব্বত্র তাঁর গতি ও স্থিতি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে তিনিই আমাদের প্রাণ রক্ষা করেন, জলরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করেন, আহার্য্যরূপে ক্ষুধাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন, তিনি অখণ্ড-চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু দৃষ্টির দৈন্য-দোষে আমরা মানুষকে গুরু ব'লে গ্রহণ করি এবং ব্রহ্মের প্রাপ্য পূজা মানুষকে দান করি। যার ভক্তি হয়, সে মানুষকেই গুরু ব'লে মানুক, গুরু ব'লে পূজা করুক। যদি অকপটতা থাকে, তবে তাতেই তার পরম মোক্ষের দ্বার খুলে যাবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট একটী মানুষকে গায়ের জোরে ব্রহ্ম ব'লে ধারণা কত্তে চেষ্টা করা প্রকৃত ব্রহ্মবাদের বিরোধী। জগদ্গুরুর প্রকাশই সর্ব্বভূতে, সুতরাং মানুষও গুরু, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একমাত্র মানুষটাই গুরু নন, সর্ব্বভূত তোমার গুরু, সর্ব্বভূতাত্মা তোমার গুরু। হে নবভারতের নূতন শিষ্য, সেই পরমগুরুর সাক্ষাৎ কৃপা-লাভের জন্য আজ জাগ্রত হও,—বল,—"ওয়া গুরুজীকি ফতে", বল—"জয় গুরু শ্রীগুরু"। আজ তোমরা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার হীন পরিবন্ধন হ'তে মুক্ত হও, আজ তোমরা বজ্রকণ্ঠে বলতে শিখ,—সত্যই তোমাদের গুরু।

সত্যকে আশ্রয় কর, সত্যের জয়জয়কার তোমাদের দ্বারা ঘোষিত হোক্। মানুষ-গুরুকে মানবেই না, তা' নয়। সত্য-দ্রষ্টাকে মানবে। যাঁর কাছে নতি স্বীকার কর্ল্লে তোমার স্বাধীনতার শক্তি ক্ষুন্ন হয় না, যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর্ল্লে আত্মশক্তির জাগরণ ঘটে, তাঁকেই মানবে। তোমার প্রাণ-মন মথিত ক'রে স্বাধীনতার বজ্র-ঝঙ্কার যিনি তুল্‌তে পার্ব্বেন, যাঁর গভীর অভয়-হুঙ্কারে লক্ষ যুগের লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ হ'য়ে খ'সে প'ড়ে যাবে, তাঁকে মানবে। মানবে কাকে ? যাঁকে মান্‌লে চিত্ত আত্মনিষ্ঠ হয় ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, সত্যনিষ্ঠ হয়।

প্রণবোপাসনায় আপত্তির কারণ

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রণব-মন্ত্র যে সর্ব্বমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ, ওঙ্কার যে মন্ত্ররাজ, একথা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু সকলেই এই মন্ত্রাধিপতির পূজা করুন, এতে আপত্তি আসে কেন ? আপত্তির প্রথম কারণ,—দীর্ঘকাল ধ'রে আমরা মূলকে ছেড়ে শাখাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার অভ্যাস ক'রে এসেছি। দ্বিতীয় কারণ,—অনভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার অভাব। তৃতীয় কারণ,—তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠেরও প্রণবে অবিশ্বাস। যে যাকে বিশ্বাস করে, সে তাকে গোপন ক'রে রাখে না, সে তাকে নিখিল ভুবনে প্রচার করে। আজ এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের আলোকে তোমাদের অন্তর আলোকিত হোক্।

ওঙ্কার-মন্ত্র—মহামিলনের মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার-মন্ত্র মহা-মিলনের মন্ত্র। প্রবণ-মন্ত্র সর্ব্ব-মন্ত্রের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মন্ত্র। জগতের যত

ধ্বনি, সব সম্মিলিত হ'লে হয় প্রণব। একটী মন্ত্র, একটী নাম, একটী শব্দ, একটী তত্ত্ব বা একটী রূপও প্রণবের বাইরে নয়। সব কিছু এর ভিতরে রয়েছে। ব্রহ্মাকে যেমন বলা হয় সকল লোক-সৃষ্টির আদি পিতামহ, প্রণবকে জান্‌বে তেমনি জগতের সকল মন্ত্র-গোষ্ঠীর আদি পিতামহ। এর ভিতর থেকে সব মন্ত্র ফুটে বেরিয়েছে। এর ভিতর থেকেই সব তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। এই কারণেই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ের এই যুগে, সর্ব্ববর্ণের সমন্বয়ের এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রণবমন্ত্রই সর্ব্বজনের সহজ মুক্তিদাতা।

প্রণবই সকল মন্ত্রের প্রাণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে মন্ত্রই ধর, জপ্‌তে জপ্‌তে সর্ব্বশেষে পৌছুবে গিয়ে প্রণবে। হ্রীং, শ্রীং, ক্লীং সবই গিয়ে পরিণত হবে গভীর মধুর অনাদি অনন্ত অনাহত ওঙ্কারে। কারণ, প্রণবই সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ। প্রাণের খবর যে পায়, সে দেহের চাইতে কি প্রাণকে বেশী মর্য্যাদা দেবে না ? বলা হয়, এটা যুক্তির যুগ। না বাবা, কথাটা পূরা সত্য নয়। এটা সাধনের যুগ। যুক্তি প্রত্যক্ষকে মানে। সাধন প্রত্যক্ষে পৌছে দেয়। সাধনশীল যদি হও, যে মন্ত্রেই যে ভজনা কর না কেন, শেষে এসে প্রণবেই পৌছুবে।

ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র

অপরাহ্নে একটী জনসভার অধিবেশন হইল। কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন জননেতা এবং চাঁদপুর হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ আসিয়াছেন। সম্মিলনীতে সমাগত যুবকদের সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া উপেন্দ্রবাবু প্রত্যেককে মানুষ হইবার জন্য উৎসাহ দিতেছেন এবং বারংবার বলিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠাই আমাদের জাতীয় উন্নতির গোড়ার কাজ। তিনি আরও বলিয়া বেড়াইতেছেন,—যুগের শ্রেষ্ঠ তাপসকে কর্ণধাররূপে পাইয়াছ, কেহ যেন সেই কথা ভুলিও না।

বক্তৃতা-কালেও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ইহাই বলিলেন। তিনি বলিলেন,—আমাদের জাতীয় অভ্যুদয় যে তার পূর্ণ রূপটী পাইয়া উঠিতেছে না, তাহার মূল কারণ হইতেছে আমাদের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিবার প্রবৃত্তি। দেশ-কল্যাণের অব্যর্থ প্রেরণাগুলিও যে দুই দিন যাইতে না যাইতে উড়িয়া যাইতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, জলকুম্ভে ফুটা রহিয়াছে, তাই অসীম উৎসাহ আর অফুরন্ত উদ্যম অকালে অজ্ঞাতসারে ক্ষয়িত হইয়া যায়, তার চিহ্নটী পর্য্যন্ত পরে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার ভাষণে বলিলেন,—এখানে আসিবার পূর্ব্বে এবং এখানকার এই একটী দিনের ব্যাপার দেখিবার পূর্ব্বে আমার কোনও ধারণাই ছিল না যে, দেশ ব্যাপিয়া সমগ্র কিশোর ও যুবক-সমাজের মধ্যে অতি নিখুঁত ভাবে চারিত্রিক আন্দোলন চালান যায়। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একটী ব্যক্তিও সন্দিগ্ধ নহেন কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে সহস্র সহস্র যুবকের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এক মহাযোগী যে সত্য সত্যই নূতন ভুবন সৃষ্টির আয়োজনে নামিয়াছেন, তাহা ছিল আমার কল্পনার বাহিরে। যে সময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রায় সর্ব্বশক্তি

উৎসর্গ করিবার চেষ্টা করিয়া আমরা বহু জনে আন্দোলনের আসল শক্তি যুবকদের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরশীল হইতে বাধ্য হইতেছি, সেই সময়ে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থার সহিত সম্পর্কবিহীন এক মহান পুরুষ-সিংহের কম্বুগর্জ্জন সত্যই হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে। পূজ্যপাদ সভাপতি শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তাঁহার সভাপতির প্রারম্ভিক ভাষণে সংক্ষেপে যেই কথাটুকু বলিলেন,—"ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র," সেই কথাটুকুকে আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সশ্রদ্ধ মনে স্বীকৃতি দান করিতে গৌরব বোধ করিতেছি। যুবকবৃন্দ, যাহারা জীবনের প্রথম অরুণোদয়ে মহতের উপদেশ লাভ করিয়াছ, তাহারা এই সঙ্কল্প হইতে কখনও চ্যুত হইও না যে, মৃত্যুপণেও জীবনের আদর্শকে ঊর্দ্ধগামী রাখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত বলিলেন,—আসিয়াছিলাম জ্ঞান-বুদ্ধি-বিদ্যার অহমিকা লইয়া এই সম্মিলনীতে বক্তৃতা দিতে কিন্তু অদ্যকার প্রশ্নোত্তর-সভায় শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যপাদের উপদেশ-রাজি শ্রবণ করিয়া সম্বৎসরের আত্মার খোরাক একদিনে প্রাণ ভরিয়া অঞ্চল পূরিয়া লইয়া গেলাম। প্রখর তৎপরতার সহিত তীক্ষ্ণ প্রতিভার এমন সম্মেলন কি সম্ভব ? আমার ন্যায় এই প্রশ্ন এখানে সমাগত আরও অনেকের মনে জাগিয়াছে। কঠিন কঠিন বিচিত্র ধরণের অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যার এমন সুন্দর সরল সহজ সমাধান ইহার আগে আমাদের কল্পনায়ও ছিল না। ইহা কি ভাবে সম্ভব ? উত্তরে আমাদের প্রতিজনের মনে এই একটী কথাই জাগিয়াছে,—ব্রহ্মচর্য্য-পালনেই ইহা সম্ভব। স্বামীজীর কণ্ঠে যেই কথা আপনারা শতবার শুনিয়াছেন, আমি তাহারই

প্রতিধ্বনি করিয়া পুনরায় বলিব,—ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্র ভারতের যুবক যেন কখনও বিস্মৃত না হয়। এই প্রসঙ্গে একটী জরুরী কথা আমার যুবক-বন্ধুদিগকে আমি বলিয়া রাখিতে চাহি যে, তাঁহারা যেন একথাও স্মরণে রাখেন যে, ভারতীয় আচার্য্যগণ আচার্য্যের পদবীতে আরোহণই করিয়া থাকেন নিজ নিজ প্রচারিত সত্যকে নিজ নিজ জীবনে আচরণের মধ্য দিয়া। উচ্চ চিন্তা ভারতবর্ষে থিসিস্ লিখিয়া ডক্‌টরেট পাইবার জন্য নহে, বরঞ্চ নিজ নিজ জীবনে তাহাকে রূপ দান করিয়া তাহার বাস্তব সম্ভাব্যতাকে প্রমাণিত করিয়া দিব্য জীবন লাভের জন্য, অগণিত নরনারীকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য। আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, আমাদের নয়ন ও শ্রবণের অগোচরে থাকিলেও প্রাচীন তপস্যায় উজ্জ্বল এক অগ্নিহোত্রী ভারতের যুবকদের অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং অমৃতত্বের পথ দেখাইবার জন্য এতদিনে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সজীব বিগ্রহ শ্রীগুরু-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার শাশ্বতী বাণী কেহ যেন ভুলিও না।

অপরাপর কয়েক জন বক্তা বক্তৃতা করিলে পর শ্রীশ্রীবাবামণি সভাপতিরূপে তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাতির প্রাণের লক্ষণ সত্য কিন্তু তা' যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে তা' দীর্ঘজীবনের লক্ষণ কিছুতেই নয়। উৎসাহকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখ্‌বার যে কৌশল, সে কৌশলেই জাতি দীর্ঘজীবী হবে, সে কৌশলই জাতির জাতিত্ব প্রতিষ্ঠার অমোঘতম অস্ত্র। তারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। নিজের প্রবৃত্তিকে, উদ্দাম ভোগ-লালসাকে সংযত, সংহত ক'রে রাখার যে শক্তি,

সে শুধু একটা শক্তিই নয়, সে হচ্ছে সর্ব্বশক্তির সঞ্জীবনী-সুধা, সকল প্রণষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধারকারিণী, অসম্ভবকে সম্ভব কর্ব্বার যে শক্তি, তার জননী। প্রতীচীর ভারতীয় শিষ্য এই কথায় বাধা দিতে চাইবেন, তা' জানি। কিন্তু সত্য কখনো তর্কে চাপা পড়্‌বে না, তার প্রমাণ ভোগলুব্ধ পাশ্চাত্যের বুকের উপরে ঐ সহস্র সহস্র moral societies, ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সহস্র সহস্র পুস্তক আর অসংখ্য সমাজ-হিতৈষীর নীরব আত্মদান। য়ুরোপ আমেরিকা একদিকে যেমন পাশবিকতার প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, তেমনি আবার অপর দিকে আর একদল স্থিরমনা নর-নারী জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ হ'তে বাঁচাবার জন্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে ভ্রাতার মত হ'য়ে, ভগ্নীর মত হ'য়ে, বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও বন্ধুর মত হ'য়ে মিশে হৃদয় দিয়ে তাদের হৃদয় জয় ক'রে, শক্তিকে সংহত কর্ব্বার, প্রবৃত্তিকে সংযত কর্ব্বার ব্রতে দীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন! পাশ্চাত্যের শুধু ডাষ্ট-বিনে পচা বাজে খবরগুলিই তোমাদের কাছে পৌছে ত'! তাই, তোমরা তাদের দেশের ভিতরের অনেক জরুরী খবরই জান্‌তে পার না। একটু লক্ষ্য ক'রে দেখো য়ুরোপের যে সব দেশ অতি দ্রুত উন্নতি কত্তে চাচ্ছে, তারা যুবক-যুবতীদের মনকে কাম-বিলাসের বিলোল-কটাক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্য কত দিকে কত কঠোরতা অবলম্বন কচ্ছে। চতুর্দ্দিকে সাজ সাজ রব। কোনো দেশ আইন ক'রে রমণীদের নগ্ন রূপের প্রদর্শনীগুলি বন্ধ ক'রে দিচ্ছে, কোনো দেশে কামোদ্দীপক বেশভূষা পরিধান ক'রে রাস্তায় বেরুনো দণ্ডনীয় হচ্ছে, কোনো দেশে থিয়েটার ও বায়োস্কোপের উপরে কড়া শাসন জারী করা হচ্ছে, যাতে যুবক-যুবতীদের মন উন্নত

আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে নীচ ইন্দ্রিয়-লালসায় ডুব্‌তে না প্রলুব্ধ হয়। এসব খবর তোমাদের কাছে কি পৌছে? এসব বার্ত্তা কি সংবাদপত্রগুলি তোমাদের নিকটে বহন ক'রে আনে? শক্তির অপচয় নিবারণ ক'রে দেশের যুবকমাত্রকেই ব্যায়াম-শালায় প্রবেশ কত্তে কোন কোন দেশে বাধ্য করা হচ্ছে, তার কি সংবাদ রাখ? যারা বড় হ'তে চায়, সবাই তারা ব্রহ্মচর্য্যের মূলসূত্রকে মেনে নিয়েছে। ব্রহ্মচর্য্য যে শুধু ভারতেরই অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র তা' নয়। ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা সমগ্র জগতেরই অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। যে বিলাসিতায় মজ্‌বে, সে ডুব্‌বে, সে মর্‌বে, সে অতলের তলে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। যে বিলাস-বর্জ্জন ক'রে ইন্দ্রিয়-সেবাকে উচ্চ আদর্শের অধীন ক'রে চল্‌বার প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্বে, জগৎকে সে অদৃষ্টপূর্ব্ব পৌরুষের তেজ দেখিয়ে স্তম্ভিত ক'রে দেবে। পার্থিব জগৎ শক্তির পূজা করে এবং সেই শক্তি আসে সংযম থেকে, সংহতি থেকে। অসংযমীর সংহতি ক্ষণস্থায়িনী; অসংযমীর জীব-সেবা কলুষে পঙ্কিল। এজন্যই সংযমের সাধনাই তোমার সর্ব্বপ্রধান সাধনা, একথা বিস্মৃত হ'য়ে আত্মহনন ক'রো না।

ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা একাগ্রতা দেয়, একনিষ্ঠা দেয়, সত্যকে নিঃশেষে জান্‌বার সামর্থ্য দেয়। তাই, আর্য্য ঋষি জীবনের মূলদেশে ব্রহ্মচর্য্যকে স্থাপন ক'রেছিলেন ভিত্তিরূপে। উচ্চ উচ্চ চিন্তাকে কল্পনার বলে ধ্যানের লোকে নামিয়ে আনার জন্য নয়, প্রত্যেকটা উচ্চ চিন্তাকে জীবনের

প্রতি পাদ-বিক্ষেপে জীবনের প্রতি কর্ম্মে রূপবন্ত করার যোগ্যতা সঞ্চয়েরই জন্য ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের বলে তোমরা যোগ্য হও।

আরাধ্য দেবতা

দীর্ঘকাল বক্তৃতার পরে উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ আমার প্রাণারাধ্য দেবতা। অতীতের আমি উপাসক নই, বর্ত্তমানের আমি পূজারী নই, ভবিষ্যৎ ভারতের অপূর্ব্ব গৌরব-শ্রী-দীপ্ত চরণ-যুগলেরই আমি সেবক, ঐ পাদপদ্মেই আমার জীবন-কুসুমের প্রেম-কোমল অঞ্জলি। কারণ, ভারতের কুশলে জগতেরও কুশল।

হাবলাউচ্চ আশ্রম,
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

কল্য রাত্রেই সংযম-সম্মিলনীতে সমাগত বহু অভ্যাগত হাবলাউচ্চ ত্যাগ করিয়াছেন। অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী ফিরিবার আয়োজন করিতেছেন। এমন সময়ে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আশ্রমে শুভাগমন করিলেন। ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্ম-জীবনে রাজনৈতিক স্বদেশ-সেবক ছিলেন। সম্প্রতি কোনও মঠের মহন্তের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধু-জীবনে পদক্ষেপ করিয়াছেন এবং সাধু-জনোচিত নিজ-সম্প্রদায়-বিহিত বেশভূষাদি ধারণ করিয়াছেন।

তিনি আসিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রশ্নের ঢং আক্রোশমূলক। তথাপি শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিমুখে জবাব দিয়া যাইতে লাগিলেন।

চাপরাশ

প্রশ্ন।—আপনি যে অবিশ্রাম বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আপনি কি কথা বলবার চাপরাশ পেয়েছেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের চাপরাশ ত নিজে দেখতে পাওয়া যায় না ভাই। আমার চাপরাশ ত বাইরের লোকে দেখবে! যখন বুঝতে পারবে, চাপরাশ নেই, তখন কথা না শুনেই হুট ক'রে উঠে সব সরে পড়বে।

প্রশ্ন।—না, না, এ আপনি অন্যায় কচ্ছেন। ভগবানের কাছ থেকে প্রচার করবার চাপরাশ নিয়ে তবে কাজে নামতে হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আপনিও বোধ হয় চাপরাশ পেয়েই আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন? রুগ্ন, বিপন্ন, আর্ত্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, দুর্ব্বলকে দেখে যখন ভগবান্ আপনার অন্তরে করুণারূপে এসে উদিত হবেন, তখনই আপনি জানবেন যে, চাপরাশ আপনি পেলেন। তখনই আপনি জানবেন, আপনার কথা কান পেতে লোকে শুনবে। চাপরাশটা আকাশ থেকে নেমে আসে না ভাই, চাপরাশ আসে অন্তর থেকে।

প্রশ্নকর্ত্তা একথা স্বীকার করিলেন না। তিনি বারংবার জিদ করিতে লাগিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট একটি মঠের নির্দ্দিষ্ট একজন গুরু জগতের সকল লোককে উদ্ধার করিবার জন্য কথা কহিবার চাপরাশ পাইয়াছেন। ভগবান্ এইভাবে বহু যুগ পরে পরে দুই চারিজনকে কথা কহিবার চাপরাশ দিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু তার সঙ্গে একথাও যুক্ত ক'রে নিতে হবে যে, জগতের অপর যে-কেউকে চাপরাশ দেবার ক্ষমতা ও অধিকার ভগবানের আছে।

অনেক চাপরাশীদেরই ম'রে যাবার আগে কেউ চাপরাশ দেখতে পায়নি। কিন্তু আপনার কিম্বা আমার মতন ক্ষুদ্র তৃণের উপরেও ভগবানের এত করুণা হ'তে পারে যে, তাদের দেহটা খ'সে পড়ে যাবার আগেও লক্ষ লক্ষ লোক তাদের চাপরাশ দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'য়ে বলবে,—"তাই তো! এত উজ্জ্বল! এত সুন্দর!"

প্রশ্নকর্ত্তা এবার চটিলেন। বলিলেন,—কালকে বক্তৃতার সময় যেই দর্প-দম্ভ আপনি দেখিয়েছিলেন, আজও তাই দেখাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—দর্প-দম্ভও যাঁর কাছ থেকে আসছে, বিনয়-নম্রতাও তাঁর কাছ থেকেই আসছে। উৎস এক। সুতরাং লজ্জা বা ভয়ের ত কোনো কারণ নেই ভাই।

ভাল জিনিষকে লক্ষ্য কর

প্রশ্নকর্ত্তা অশেষ বিরক্তি নিয়া স্থানত্যাগ করিলেন। আশ্রম হইতে তাঁহাকে প্রসাদাদি দেওয়া হইল কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না।

আশ্রমের উচ্চ শ্রেণীর একটী ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল,—বাবামণি, ব্যাপারটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যাপারটা জলের মত সোজা। নূতন সাধু হয়েছেন, নিজের পন্থে, নিজের মতে, নিজের গুরুতে নিষ্ঠা বাড়াবার জন্যে ঘড়ির চাবিতে একটু চড়া দম দিতে হয়েছে। তাতে কাঁটাগুলো একটু তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ করছে। এখন নিষ্ঠা কৃত্রিম চেষ্টার ফল। দুদিন পর নিষ্ঠা স্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়াবে। তখন আর চড়া মেজাজের দরকার হবে না। তখন

ইনি দেখ্‌তে পাবেন, সব গুরুর মধ্যে এক গুরুরই বাস। তখন বুঝতে পারবেন,—ভগবানই সকলকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন; ভগবানকেই সর্ব্বজীবে দেখা প্রয়োজন; কোথায় ভগবান নেই আর কোথায় ভগবানের চাপরাশ নেই, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তোমরা নূতন সাধুদের মতামতের আতিশয্যের দিকটা ক্ষমা ক'রো। এর ভেতরেও যে নিষ্ঠা-বৃদ্ধির চেষ্টা-রূপ একটা ভাল জিনিষ আছে, সেটা লক্ষ্য ক'রো। তাতেই লাভ।

কাজের শত্রু

ইহার দিন কয়েক পরে শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুনকী আসিয়া পৌছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণিকে লইয়া আশ্রমে বর্ত্তমানে কর্ম্মীসংখ্যা সাত। তন্মধ্যে একটীর বয়স বারো কি তেরো।

শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই প্রায় সকল কর্ম্মীরা আশ্রমে আসিয়া পৌছিয়াছেন এবং চিনা-বাদামের ক্ষেত্রে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে চিনাবাদামের চাষ এদেশে কেহ জানিত না।

শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া পৌছিবার পর হইতে যেন কার্য্যের পরিমাণ দশগুণ বাড়িয়া গেল। কর্ম্মীদের কর্ম্মশক্তিও যেন তাঁহার কঠোর শ্রমশীলতার আদর্শে অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের চিন্তা পরিহার করিয়া অবিরত কাজ চলিতেছে, কথা কহিবারও কাহারও অবসর নাই।

কেহ কথা কহিলেই শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন,—"কাজের শত্রু বেশী কথা।" সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীদের কথা ও কোলাহল বন্ধ হইয়া যায়।

শ্রেষ্ঠ কৃষি

অসময়ে বীজ সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে এক কোণে বেড়া দিয়া কয়েকটা আমের বীজ হইতে আমের চারা তৈরী করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্রমের এই পাথুরে মাটিতে গাছ বাঁচান এখন শক্ত হবে। গ্রামের জমিও ভালো, তোরা গ্রামে গিয়ে চারা বিতরণ ক'রে আয়। বর্ষা এখনো আসে নি, তবু দৈবাৎ কয়েক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। সার দেওয়া ভাল মাটিতে এখন চারা রোপণ কর্ল্লে বর্ষার সুযোগে সব গাছ বেঁচে যাবে।

একজন ভ্রাতা টুকরী বোঝাই করিয়া ফলের চারা নিয়া গ্রাম ঘুরিয়া আসিলেন। কিন্তু কেহ একটীও চারা নিল না। ফিরাইয়া দিল। যুক্তি এই যে, সাধু আসিয়া বনের গাছগুলি কাটিতেছেন। গাছে গাছে এত কাল কত ভূত ছিল। বৃক্ষোৎখাতনের সাথে সাথে সব ভূত নিরাশ্রয় হইল। এখন সাধু গ্রামে বৃক্ষরোপণের নাম করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ভূতই চালান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ক্ষেত্র তৈরী না ক'রে কাজে হাত দিলে এই রকমই হয় রে। ব্যাপক শিক্ষা দিয়ে এদের ভয় আমি দূর কর্ব্ব। সংস্কৃত শ্লোকের মহিমায় মনের ভূত তাড়াব। এরা যে এমন মূর্খ, সেটা আমাদেরই দোষ। আমরা এত কাল এদের কোনো শিক্ষা দেই নাই। অথচ জ্ঞানোপদেশ দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কৃষি।

বৃক্ষসৃষ্টির আন্দোলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্যান্য দশটা কর্ত্তব্য কাজের সঙ্গে এদেশে আমাদিগকে ফলবৃক্ষসৃষ্টির এক আন্দোলনও সৃষ্টি কত্তে

হবে। ঘরে ঘরে ফলবৃক্ষ সৃষ্টি কর, ফলে ফুলে বসুন্ধরাকে পূর্ণ কর,—এইটাই হবে আমাদের আন্দোলন। দেশের ভাবী আবহাওয়ারও পরিবর্ত্তন সাধন ক'রে দেবে। বন কেটে যেমন আমরা আশ্রম কচ্ছি, তেমন আবার তার সহস্রগুণ বৃক্ষ গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি ক'রে সেই ক্ষতির বহুধা পূরণ কত্তে হবে। একটা আন্দোলন-রূপেই এই কাজটা আমরা ধরব। তোরা সবাই কোমর কেছে নে।

সেইদিনই শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা, মালদহ ও দ্বারবঙ্গে পত্র দিলেন যে, আমের মরশুম চলিয়া যাইবার আগেই যেন পুপুন্কী আশ্রমের জন্য কয়েক হাজার ভাল জাতের আমের বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজের মূল্য কলিকাতার পুস্তক বিক্রেতাদের নিকট হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সেখানে শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত পুস্তক-বিক্রয়ের টাকা জমা আছে।

পুপুন্কী আশ্রম,
৫ই আষাঢ়, ১৩৩৫

ত্যাগ-ব্রহ্মচর্য্যের ভাব স্থায়ী করিবার উপায়

অসংখ্য চিঠি আসিয়া জমিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি তাহার একখানার উত্তরে লিখিলেন,—

"সর্ব্বপ্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ববিরহিত হইয়া নিঃসংশয়িত চিত্তে বুকভরা ভরসা লইয়া নামের সেবায় লাগিয়া যাও। ইহাই তোমার ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের ভাবকে নিয়ত পরিপুষ্ট করিতে থাকিবে। ভগবৎ-সাধনহীনের ত্যাগের সঙ্কল্প বাতাসে মিশিয়া যায়, ত্যাগ-বুদ্ধি ভোগ-সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়, সংযম-চেষ্টা ব্যর্থতার আশীবিষ-

দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিয়ত ভগবানে লাগিয়া থাকাই ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। শুধু ভাবের উপর কেহ কখনও সংযমের শুভ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, এই ভাব এবং এই কল্পনা ভগবৎ-সাধনার অমৃত-রসায়নে সঞ্জীবিত হওয়া চাই।''

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৬ই আষাঢ়, ১৩৩৫

স্বদেশ-সেবকদের ব্রহ্মচর্য্যে বিরোধ

অদ্য আশ্রমের জনৈক কর্ম্মী পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত ''মুক্তি'' পত্রিকার একটী প্রবন্ধ পড়িতেছিলেন। প্রবন্ধকার ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারমূলক আন্দোলনগুলির প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। প্রবন্ধপাঠ সমাপ্ত হইলে তৎসম্বন্ধে কর্ম্মীরা সকলে শ্রীশ্রীবাবামণির মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এঁরা যে ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের নাম শুন্‌লে আতঙ্কগ্রস্ত হন, তাও খামাখা মনে ক'রো না। অনেক ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকই ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের আন্দোলনটার সঙ্গে দেশ-কাল-পাত্রের যোগ রাখতে পাচ্ছেন না। কারো ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের ফলে যুবকদের মনে মধ্যযুগের ধর্ম্মমূলক গোঁড়ামির সৃষ্টি হচ্ছে, কর্ম্মহীনতার, আলস্য-পরতন্ত্রতার, অক্ষমতার বৃদ্ধি হচ্ছে, ভিক্ষানুজীবীর সংখ্যা বাড়্‌ছে। কারো বা ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের ফলে, জাতীয় স্বাধীনতা যে কোনও কাজের জিনিস নয়, এর যে কোনও প্রয়োজন নেই, এইরূপ মতবাদ প্রসার পাচ্ছে। এই জন্যেই অনেক স্বদেশপ্রাণ মহদ্ব্যক্তিও ''ব্রহ্মচর্য্য'' কথাটাকে

শুন্‌লেই ভয় পান যে, বুঝি আবার নূতন একটা অবতার খাড়া হ'ল রে!

ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার কি বর্জ্জনীয়

প্রশ্ন।—কিন্তু আমাদের কি এই জন্য ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার ছেড়ে দিতে হবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, বরং আরও জোর ক'রে এই আন্দোলনটীকে চালাতে হবে এবং সত্যের প্রতি আমাদিগকে আরও অধিক সমাদরশীল হ'তে হবে। তীব্র লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে, ভ্রমেও যেন দেশ-কল্যাণের বিরোধী, সত্যের বিরোধী কোনও কিছুর আমরা আশ্রয় না লই বা প্রশ্রয় না দিই। সত্যনিষ্ঠাই ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের প্রাণ। কোনো নূতন ধর্ম্ম আমরা প্রচার কর্ব্ব না, কোনো নূতন অবতার আমরা প্রতিষ্ঠা কর্ব্ব না, কোনও প্রকার নূতন পৌরহিত্যের শাসন আমরা বিস্তার কর্ব্ব না। এই খাঁটি কথাটুকু মনে রেখে যদি ব্রহ্মচর্য্য প্রচার কর, জানবে তোমরা দেশের যে সেবা কর্ল্লে, তেমন সেবা আর কেউ কখনো করে নি, হয় ত' কত্তেও পার্ব্বে না।

ওঙ্কারোপাসনা ও প্রচার

প্রশ্ন।—আমরা যে ওঙ্কারের আশ্রয়ে ঈশ্বরোপাসনা করি, এটা কি একটা নূতন ধর্ম্ম নয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না। উপাসনাই আর্য্য-ঋষিদের প্রাচীনতম সাধনা। এটা নূতন কিছু নয়। কিন্তু ওঙ্কারোপাসনাকে প্রচার করা ত' আমাদের কর্ম্মতালিকা নয়। ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের প্রচারের জিনিস। ব্রহ্মচর্য্যের সাধক যদি আমাদের উপাসনার প্রতি নিজের

অন্তরের প্রেরণায় আকৃষ্ট হন, তবে তাঁকে আমরা উপেক্ষা নাও কত্তে পারি। সাধারণতঃই হিন্দুর সাধন প্রচারশীল নয়। কিন্তু আগ্রহী চিত্ত অন্তরের আকর্ষণে কাছে এলে, প্রার্থী হ'লে, তাকে অমৃত পরিবেশন Proselytism-এর (ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করার) অপবাদ কেন পাবে ?

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫

নব্য-অবতার

কয়েক দিন যাবৎ রৌদ্র উঠিতেছে। অদ্যকার রৌদ্র এত তীব্র এবং অসহনীয় যে, বেলা দশটা বাজিতেই সকলে তীক্ষ্ণ তাপে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছেন। অপরাপর দিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১২টা ১২।।০ টা পর্য্যন্ত কোদাল চলে। অদ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সকলে পর্ণকুটীরে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিয়াছেন।

রন্ধন হয় নাই, অতএব স্নান করা বৃথা। একজন ব্রহ্মচারী কলিকাতার কোনও সঙ্ঘ-বিশেষের প্রকাশিত একখানা মাসিক পত্রিকার একটী প্রবন্ধ খুলিয়া বসিলেন,—প্রবন্ধটী পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মনে নানা প্রকার প্রতিকূল ভাবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি প্রবন্ধটী আনিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে পড়িতে দিলেন। উহার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, কোনও এক নির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষ বর্ত্তমান যুগের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন এবং শুধু তাঁহারই চরণাশ্রয় করিয়া ভারত তাহার অভ্যুদয়কে লাভ করিবে, বৈদিক কীর্ত্তিনিচয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে।

প্রবন্ধ পাঠান্তর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লেখকের ভাষা-নৈপুণ্য চমৎকার, সুন্দর লিখেছে!

প্রশ্ন।—কিন্তু প্রবন্ধে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, এই বিষয়ে ত' কিছু বললেন না!

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তোমরা কেউ কখনো তোমাদের কোনো ভক্তির পাত্র সম্বন্ধে এরূপ প্রবন্ধ লিখো না। এইটুকু বল্‌লেই কি যথেষ্ট হবে না?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —আর এক কথা, এই আশ্রমে কেউ কখনো পূজা বা অর্চ্চনার উদ্দেশ্যে আমার কোনও প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রো না।

পুপুনকী আশ্রম,
৮ই আষাঢ়, ১৩৩৫

অকাল-মৃত্যু নিবারণ

অদ্য অকাল-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিল। এই বিষয়ে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধও আলোচিত হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের দেশের অসংখ্য লোক অন্নাভাবে অকালে মরে। তাদের মৃত্যু-নিবারণের প্রধান উপায় হচ্ছে, দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতি করা। কিন্তু এমন অনেক লোকও অকালে মরে, খাদ্যাভাব যাদের মৃত্যুর কারণ নয়, পরন্তু অসংযমের দরুণই তারা ব্যাধি কবলিত হয়। এই শ্রেণীর লোকের অকাল-মৃত্যু নিবারণের প্রধানতম উপায় হচ্ছে, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা। যারা খাদ্যাভাবে অকালে মরে না, তাদের মধ্যেই বুদ্ধিজীবী ও প্রতিভাবান্ লোক বেশী জন্মে। সুতরাং জাতির মস্তিষ্ককে ক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য সংযমেরই প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। জাতির যারা মাংসপেশী, তাদের বাঁচাবার উপায়—অন্ন-সংস্থান করা,

ভিক্ষা দিয়ে নয়, তাদের অর্জ্জনকারিণী শক্তিকে জাগিয়ে। কিন্তু এই কথাটীও আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে যে, খাদ্যাভাবে যে শীর্ণ, সে যদি হয় এর উপরে আবার অসংযমী, তবে তার আর রক্ষা নেই। সংযমী পুরুষ অনশন অর্দ্ধাশনের সঙ্গে যে ভাবে লড়াই চালাতে পারেন, অসংযমী তা পারে না। তাই, অর্থনৈতিক আন্দোলন-সমূহের সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিভাবে সংযমের আন্দোলনকেও চালাতে হবে। আবার শিক্ষা ব্যতীত কোনও সংস্কারকে জাতির মনে বদ্ধমূল করা সম্ভব হয় না। সুতরাং শিক্ষার আন্দোলনকেও চালাতে হবে সমযত্নে। মোট কথা, অকাল-মৃত্যু নিবারণের জন্য কোনও পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কার করা বা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই অকাল-মৃত্যুর প্রধানতম প্রতিষেধক।

পুপুনকী আশ্রম,
১১ই আষাঢ়, ১৩৩৫

নব-বধূর পবিত্রতা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা-বাসিনী সদ্যোবিবাহিতা এক শিষ্যার নিকটে লিখিলেন,—

"মা তোমাকে সামান্যা স্ত্রীলোকদের মত জীবন যাপন করিলে চলিবে না। তোমাকে পৃথক্ ধরণে চলিতে হইবে। অপরাপর স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সহিত অপবিত্র জীবন-যাপন করে কিন্তু তোমাকে যাপন করিতে হইবে পবিত্র জীবন। অপরাপর স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে একটা খেলার সাথী বা ভোগ-সুখের উপায় মাত্র মনে করে, কিন্তু তোমাকে মনে করিতে হইবে তাঁহাকে ধর্ম্ম-সাধনের সঙ্গী বলিয়া। অপরাপর স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সহিত

নিশা-যাপন করে শুধু তাহার শক্তি-হরণ করিবার জন্য, ক্ষণিক সুখের লোভ দেখাইয়া তাহার রক্ত-শোষণ করিবার জন্য, কিন্তু তোমাকে স্বামী-সঙ্গ করিতে হইবে স্বামীর নববল-বিধানের জন্য, তাঁহার সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিবার জন্য, পরস্পরের ধর্ম্মের সহায়তা করিবার ও পাইবার জন্য, পরস্পরের পবিত্রতা ও সংযম বর্দ্ধনের জন্য। এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও মা,—শারীরিক সুখ দিয়া কখনও কাহারও হৃদয়-জয় করা বা কাহাকেও চিরসুখী করা যায় না। একমাত্র প্রেম দিয়াই বধূ তাহার বরকে জয় করিতে ও নিত্যসুখ দান করিতে পারে। এই প্রেম পবিত্রতারই ফল,—অপবিত্র হৃদয়ে কখনও প্রকৃত প্রেমের উদয় হয় না। বিবাহিত জীবন পশুর জীবন নহে, ইহা মানুষের জীবন। পশুরা বিবাহ করে না, বিবাহ মানুষের সমাজেরই প্রথা। সুতরাং বিবাহিত হইবার পর হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইবার অধিকার তোমাদের নাই মা। প্রাণ দিয়া পবিত্রতার সাধনা করিতে থাক এবং পবিত্রতার ফলে যে দিব্য প্রেমময় মাধুর্য্যমণ্ডিত জীবন লাভ হইয়া থাকে, তাহার সুখময় স্বাদ গ্রহণ কর। শক্তিশালী, চরিত্রবান্ বীর্য্যবান্ কর্ম্মদুর্দ্ধর্ষ পুত্রকন্যা তোমাদের প্রেমের মধ্য দিয়া ভূতলে অবতরণ করুক,—পাশব সুখের স্পৃহার ফলে নহে।"

নব-বিবাহিতের কর্ত্তব্য

পূর্ব্বোক্ত বধূর স্বামীও শ্রীশ্রীবাবামণিরই কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিবাহ করিলেই মানুষ কাম-কলুষিত বাসনার পঙ্কে তলাইয়া যায়, একথা সত্য নহে। বিবাহ করিয়াও মানুষ মানুষের মত

থাকিতে পারে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এবং সাধক পুরুষদের জীবনের দৃষ্টান্ত-নিচয়ে ইহার নিঃসংশয়িত প্রমাণ আছে। তোমাকে তোমার জীবন দিয়া এই প্রমাণকেই সুদৃঢ় করিতে হইবে। বন্ধু-বান্ধবদের কোনও কথায়ই বিচলিত হইও না, নিজের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতে আর শ্রীভগবানের অপরিসীম প্রেমে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেশরি-বিক্রমে অগ্রসর হও বাবা। দারগ্রহণ করিলেই স্ত্রী আসিয়া তোমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইবে, তোমার রক্ত-শোষণ করিবে, ইহা মিথ্যা কথা। লম্পট স্বামীরা নিজেরাই স্ত্রী-দিগকে ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করিবার পথ দেখাইয়া দেয়, দেবী-প্রতিমাকে নিজেরাই যত্ন করিয়া রাক্ষসীর বিদ্যা শিখায়, তাই না স্ত্রীরা শেষে বাঘিনী হয়! মহাকবি বলিয়াছেন,—Frailty! Thy name is Woman! (চঞ্চলতা! তোমাকেই নাম দেওয়া হইয়াছে নারী।) কিন্তু আমি একথা স্বীকার করি না। মায়ের গর্ভেই জন্মিয়াছি, এই কথা যাহারা মনে রাখিতে পারে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে হঠাৎ করিয়া একটা যা'-তা' মন্দ ধারণা করিয়া বসা তাহাদের পক্ষে যারপরনাই শক্ত। আমার সুদৃঢ় ধারণা এই যে, বিবাহের রাত্রিতে স্ত্রীরা যাহাদের নিকটে শিষ্যার যোগ্য নম্রতা লইয়া আত্মসমর্পণ করে, তাহারাই স্ত্রীকে ব্রহ্ম-বিদ্যা না শিখাইয়া ডাকিনী-মন্ত্র শিক্ষা দেয় এবং ইহারই ফলে অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধি, প্রতিভা এবং হৃদয়বত্তার আধারভূতা যে নারী, তাহারও চরিত্রের মধ্য দিয়া নির্ব্বোধ-সুলভ পূতিগন্ধের বিস্তার হইতে থাকে। তোমাকে আজ জানিতে হইবে যে, নারীর সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল তোমার জীবনকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া দিবার জন্য নহে এবং তাহার ওষ্ঠযুগল তোমার বক্ষোরক্ত পান করিবার জন্যই সৃষ্ট

হয় নাই। নারীর সৃষ্টি গার্হস্থ্যাশ্রমী পুরুষের জীবনকে পূর্ণ করিবার জন্য। সুতরাং স্ত্রীর সাহচর্য্য তোমাকে এমন ভাবে পাইতে হইবে, যেন ইহা দ্বারা পূর্ণতারই অভিযান সফলতায় মণ্ডিত হয় এবং এই একটী কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখিও যে, তোমার স্ত্রী তোমাকে কীদৃশ সাহচর্য্য দান করিবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে তাহার প্রতি তোমার দাম্পত্য ব্যবহারের প্রকৃতির উপর। তুমি যদি দেবভাবে অনুপ্রাণিত হও, তিনি দেবী হইবেন। তুমি যদি পিশাচ হও, তিনিও পিশাচী হইবেন।"

গর্ভবতীর কর্ত্তব্য

ময়মনসিংহ-নিবাসিনী অপর এক শিষ্যার নিকটে আর একখানা পত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্নেহের মা * * *, তোমার শ্বশ্রূমাতার পত্রে জানিলাম, তুমি অন্তঃসত্ত্বা। ইহাই তোমার নাম-সেবায় অধিকতর অবহিত হইবার পক্ষে আর এক বিশেষ যুক্তি, যেহেতু ভগবানের নামের সেবা দ্বারা জরায়ু-মধ্যস্থ সন্তানের মধ্যে ভগবৎ-প্রেমিকতা সঞ্চারিত হয় এবং অপরাপর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করায়ত্ত হয়। তুমি যাহা যাহা আহার করিতেছ, গর্ভস্থ সন্তান তাহারই রস পাইয়া দিনের পর দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। ঠিক তেমনি তুমি এখন মনে মনে যে সকল চিন্তা করিতেছ, সন্তানও তাহার উত্তরাধিকারী হইতেছে। তুমি যদি এখন মনকে মহচ্চিন্তাতে ডুবাইয়া রাখিতে পার, দেখিও তোমার সন্তান কেমন মহদ্‌গুণসমূহের অধিকারী হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে। তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে আজ খুব উচ্চে তুলিয়া ধর মা। প্রার্থনা কর মা,

এমন সন্তানই যেন তোমার লাভ হয়, যাহার জন্মের দ্বারা দেশের দুঃখ বাড়ে না, বরঞ্চ অধঃপতিত পদদলিত জন্মভূমির সকল দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটে। প্রার্থনা কর, ভিক্ষান্নজীবী পরানুগ্রহপ্রার্থী সন্তান যেন তোমার না হয়, পরন্তু নিজের শক্তিতে যে দিগ্বিজয় করে, নিজের বাহু-বলে যে পূর্ব্বপুরুষদের লুপ্ত কীর্ত্তি ও গরিমার পুনরুদ্ধার করে, এমন সন্তানই যেন তোমার বুক জুড়ায়। সঙ্কল্প কর, তোমাকে সাহসী সন্তানের জননী হইতে হইবে, বীর-প্রসবিনী হইতে হইবে।—কায়মনোবাক্যে এখন যে আকাঙ্ক্ষা করিবে, জানিও মা, তাহাই সফল হইবে, তাহাই পূর্ণ হইবে।

"কিন্তু কায়মনোবাক্যে আকাঙ্ক্ষা করার মানে কি বুঝিতে পারিতেছ?—প্রথমতঃ, তোমাকে তীব্রভাবে আগ্রহবতী হইতে হইবে যে, বজ্রবল-তুচ্ছকারী মনুষ্যত্ব-দৃপ্ত সিংহবীর্য্য মহামানব পুত্র তোমার চাই। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মবীর্য্য লাভের যাহা বিরোধী, চরিত্রবল লাভের যাহা পরিপন্থী, এমন সর্ব্বপ্রকার কথাবার্ত্তা, লোক-সঙ্গ এবং চিন্তা তোমাকে কাল-ভুজঙ্গ বোধে পরিহার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, শত বাধা-বিঘ্ন ও বিপত্তির মধ্যেও যাঁহারা চরিত্রের বলে মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছেন, পরার্থের তরে স্বার্থকে বলি দিতে যাঁহারা পারিয়াছেন, বুকের রক্ত দিয়া যাঁহারা দেশের দৈন্য ঘুচাইয়াছেন, গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা-সহ কারে তাঁহাদের অলোকসামান্য জীবন-চরিত নিয়ত আলোচনা করিবে এবং মনে মনে তাঁহাদিগকে সুগভীর শ্রদ্ধা-সহকারে প্রণাম ও পূজা করিবে। ইহাই সুসন্তান লাভের নির্ভুলতম পন্থা।"

দারিদ্র্য ও সাধন-ভজন

অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পুত্র ও পুত্রবধূর মন যাহাতে ভগবৎ-সাধনার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহা তোমাকে করিতে হইবে। ভগবানের দিকে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার উপায় প্রধানতঃ তিনটী। প্রথমতঃ তুমি নিজে তাহাদিগকে সাধন-ভজনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ দ্বারা সচেতন করিবে। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র পরিবারটীর মধ্যে এমন সুনিয়ম প্রতিষ্ঠা করিবে, যেন পরিবারভুক্ত কোনও পুরুষ বা নারী প্রকাশ্যে বা গোপনে ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী, সাধন-ভজনের বিরোধী বা ধর্ম্মানুশীলনের বিরোধী কোনও আলাপ-আলোচনা না করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, তোমাকে স্বয়ং সাধন-ভজনে আরও গভীর ভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। কেননা, শত উপদেশ বা শাসনের দ্বারা যাহা করিতে পারিবে না, দৃষ্টান্তের শক্তিতে তাহা অনায়াসে এবং আপনা আপনি সম্পাদিত হইয়া যাইবে।

"পুত্র এবং পুত্রবধূর সাধন-ভজন আবশ্যক কেন, সেই কথাটুকুও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। তোমার সংসার দরিদ্র সংসার, দারিদ্র্যের দিক্ হইতেই আমি কথাটা আলোচনা করিতেছি।

"বর্ত্তমান যুগের পুত্র ও কন্যারা ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা পাইবার পূর্ব্বেই বিবাহিত হয়। ইহার ফল হইতেছে, অসময়ে কতকগুলি আণ্ডা-বাচ্চা আর সঙ্গে সঙ্গে অন্নাভাব ও দারুণ দুশ্চিন্তা। ইহা দূর করিবার জন্যই সাধন-ভজন আবশ্যক। কেন না, নব-বিবাহিত স্বামী ও স্ত্রী যদি যথার্থই অকপট চিত্তে একাগ্র মনে

নিয়মিত ভাবে একত্র সাধন-ভজনে যত্নশীল হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভোগ-লিপ্সা এবং দৈহিক আসক্তি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত না হইয়া-ই পারে না। এবং ইহা ত' অতি সাদা কথা যে, আসক্তির নাশ হইলে স্বামী ও স্ত্রীর একত্র অবস্থানের দ্বারা কোনও ক্ষতি সাধিত হইতে পারে না। সাধন-ভজনে রুচিসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তোমরা পুত্র ও পুত্রবধূর একত্র শয়নের ব্যবস্থা এমন পাকাপাকি করিয়াছ যে, চিত্তের অসংযমকে দমন করিতে না পারিয়া তাহারা পশুর মত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে এবং সমাজকে অকালে এক পাল শূকর-শাবক উপহার দিয়া পরমায়ু-ধ্বংসী কন্যাদায়ে সংসারকে বিপন্ন করিতেছে।"

পুপুনকী আশ্রম,
১২ই আষাঢ়, ১৩৩৫

ভারতের নেতা

অদ্য দ্বিপ্রহরে আহারের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি কিয়ৎকাল সংবাদপত্র-পাঠ শুনিলেন। তৎপরে বলিলেন,—দেশের ভিতরে নানাস্থানে নানা সৎ-প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, এর চাইতে আনন্দের বিষয় আর কিছু হ'তে পারে না। এসব প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয়ই হচ্ছে জাতীয় উন্নতির গোড়া-পত্তন! কিন্তু এর পরের সোপানেও আমাদের উঠতে হবে। সেইটী হচ্ছে,—প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরস্পরের ভ্রাতৃভাব। লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠান দেশে হোক্, কিন্তু একে অন্যের সহযোগিতা কত্তে যেন কখনও বিরত না হয়। একটা জিনিস সর্ব্বত্র দেখতে পাই, যাতে প্রাণে বড় বেদনা বাজে। সেটী হচ্ছে এক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অপর প্রতিষ্ঠানের

বিদ্বেষ। সর্ব্বত্রই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, এক প্রতিষ্ঠানের লোক অপর প্রতিষ্ঠানের নিন্দা না ক'রে জল গ্রহণ করেন না। এর কারণ কি জান ? এর কারণ হচ্ছে গোঁড়ামি ও অন্ধতা। আমার যিনি নেতা, তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষের লোক দিয়ে নেতা ব'লে মানিয়ে ছাড়্‌ব, আমার যিনি গুরু, সমগ্র জগতের লোককে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিইয়ে তবে ছাড়্‌ব,—এই সব মনোবৃত্তিই এই বিদ্বেষের কারণ। চক্ষুষ্মান্ যে, সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পায়, মনের মতন নেতা, মনের মতন গুরু মানুষ নিজেই খুঁজে নিতে পারে। এর জন্য দালালী বা ছলা-কলা আবশ্যক হয় না। বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, বিভিন্ন রুচির প্রার্থী, বিভিন্ন জনকেই মানবে। এ বৈচিত্র্যের গলা টিপে মার্‌তে পারে, এমন লোক কেউ কখনও জন্মোনি। ভারতবর্ষে আজ শত শত নেতা ও শত শত গুরুর আবির্ভাব হচ্ছে। এঁদের কর্ত্তব্য কি জানো ? এঁদের কাজ হচ্ছে লোককে এমন ভাবে প্রস্তুত করা, যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ কানে ভগবানের আদেশ-বাণী শুনতে পায়। তুমি একটা প্রেরণা ভগবানের কাছ থেকে পাবে, আর সবাই তোমার প্রেরণার দাস হ'য়ে চল্‌বে, এমন আদর্শ কখনও সত্যিকার আদর্শ ব'লে গৃহীত হ'তে পারে না। অন্ধ আমি, তাই গুরু চাই। কিন্তু গুরু চাই কি চিরকাল তিনিই লাঠি ধ'রে ধ'রে আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, আর আমার অন্ধত্ব না ঘুচুক্, এই জন্যে? গুরু চাই অন্ধত্ব দূর হওয়ার জন্যে, তাঁর সাহায্য বিনেও নিজ স্বাধীন শক্তিতে যাতে জগন্ময় নিঃশঙ্কে বিচরণ কত্তে পারি, তারই জন্যে। নেতার প্রয়োজন কি আমি চিরকাল তাঁর হস্তধৃত পুত্তলিকা হ'য়ে থাক্‌ব, এর জন্যে? না, তা চাই না। আমাদের

প্রত্যেকের অন্তর থেকে ভগবানের বাণী মুখরিত হ'য়ে ফুটে উঠুক, ভগবানের সঙ্গে প্রত্যেকের আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হোক্, দেশজননীর ডাক নিজেদের কানে যেন আমরা শুন্তে পাই এবং দেশবাসীর দুঃখ-দৈন্যের সাথে নিজেদের হৃদয়ের যোগ অপরোক্ষভাবে যেন অনুভব কত্তে পাই,—তারই সাহায্যের জন্য গুরু আর নেতা। যাঁরা সে সাহায্য কর্ব্বেন না, তাঁরা গুরুও নন্, নেতাও নন্। তুমি বল্বে, সবাই যদি নিজ নিজ অন্তর থেকে প্রেরণা লাভ কত্তে চায়, তা হ'লে জাতীয় ঐক্য সম্ভব নয়। আমি বল্ব, তোমার অনুমান ভুল। যারা নিজেরাই চেষ্টা করলে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রেরণা অনুভব কত্তে পারে, সেই সব আধার পরিমার্জ্জিত হয়নি, তাই আজ এ বৈষম্য। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট মতবাদের দ্বারা কারও জীবনকে আচ্ছন্ন কত্তে না যেয়ে যদি আধারের পরিমার্জ্জনের জন্য চেষ্টা উপযুক্ত ভাবে চালাও, দেখবে, একদিন ভারতের অধিকাংশ নর-নারী একই প্রেরণাকে স্বাধীন ভাবেই লাভ কচ্ছেন। সেই দিন ভারতের ভাগ্যে অসম্ভব ব'লে কোনও কিছু থাক্‌বে না। ফন্দী-চাতুরী ক'রে সেদিন কারো প্রাণে স্বদেশ-প্রেম জাগাতে হবে না। বাগান-ভরা সকল গাছের ফুলই যেমন বসন্তের বায়ু পেলে আপনি ফোটে, তেম্‌নি ক'রে সেদিন সবার অন্তরে স্বদেশানুরাগ ফুটে উঠবে। আমি সেই দিনটীর জন্য অপেক্ষা কচ্ছি। আমি চাই না, সমগ্র ভারত কোনও নির্দ্দিষ্ট গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করুক। আমি চাই না, সমগ্র ভারত কোনও নির্দ্দিষ্ট নেতার মুখপানে তাকিয়ে থাকুক। আমি চাই না, সমগ্র ভারত কারো একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্বীকার করুক। শত শত গুরু শত শত ধর্ম্ম প্রচার করুন। শত শত নেতা শত

শত কর্ম্ম পরিচালন করুন। বিভিন্ন দেশ ও প্রদেশ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্ণাস্বাদন লাভ করুক। সবাইকে যেন-তেন-প্রকারেণ একই হালের জোয়ালে বেঁধে দেওয়ার আমি সমর্থক নই। আমি চাই, প্রত্যেকটী মানব নিজের সমগ্র জীবনের উৎসর্গের প্রেরণাটী লাভ করুক নিজ অন্তর থেকে। কোনও লোকের প্রভাবে প'ড়ে নয়, পরন্তু সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের কাছ থেকে প্রত্যেকে প্রেরণা লাভ করুক এবং সকলের বিভিন্নমুখী জীবনের বিভিন্ন প্রেরণা শুধু ভগবদাদেশেই একীভূত হউক। এই ভাবে যিনি মানুষকে নিজের প্রাণে নিজের গুণে প্রেরণালাভের যোগ্য ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার জন্য প্রাণ দেবেন, আমি বলি, তিনিই ভারতবর্ষের প্রকৃত নেতা। অপরের নেতৃত্ব শুধু বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৫

স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে

অদ্য শেষ রাত্রিতে উঠিয়া পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে কামনাগড়া নামক পল্লীতে জনৈক কুর্ম্মী-মাহাতোর বাড়ীতে অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে গিয়াছেন। দেখিলেন, সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে একটী কুর্ম্মী নারী যোগ দিয়াছেন এবং আনন্দ ও প্রেম-সহকারে করতালি দিয়া সকলের সঙ্গে শ্রীহরি-মঞ্চ পরিক্রমণ করিতেছেন। কীর্ত্তন হইতে ফিরিবার পথে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবর্ষে এমন একটা যুগ আস্‌বে, যেদিন স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সকল সৎকর্ম্মে খোলাপ্রাণে স্বাধীন উন্মুক্তভাবে এসে যোগ দেবেন। শত চেষ্টা ক'রেও আমরা কেউ সেই যুগকে ঠেকিয়ে রাখতে পার্ব্ব না।

মধ্যযুগে নিতান্ত প্রয়োজন-বোধে স্ত্রীজাতির জন্য আমরা যে অবরোধ-প্রথার ব্যবস্থা করেছিলাম, যুগাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তারও অবসান আপনি ঘটবে। এই জন্যই আজ আমাদের সংযম-আন্দোলন পরিচালনের এমন গুরুতর প্রয়োজন। অবরোধ যখন আস্তে আস্তে ভাঙ্গবেই ভাঙ্গবে, তখন ভাঙ্গবার ফলটা যাতে সমাজের উপরে অমৃতময়ই হ'তে পারে বিষ-জর্জ্জরিত না হয়, তা-ই আমাদের কত্তে হবে। এই একটী অশিক্ষিতা অনাদৃত-কুলজাতা সামান্যা রমণীর আচরণ দেখেই এসব অনুমান কচ্ছি, তা' নয়; প্রাণের যে স্বচ্ছন্দ গতি এই কুর্ম্মী-স্ত্রীলোকটীর ভিতরে এসেছে, তা' একদিন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ভিতরে আস্‌বে, —চাই তিনি ভট্টাচার্য্যের গিন্নী হউন, চাই তিনি স্মৃতিরত্নেরই কন্যা হউন।

নর-নারীর অবাধ মিশ্রণের বিপদ এবং তাহার প্রতিকার

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণের মধ্যে প্রকৃত বিপদ হচ্ছে, স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক বিশ্বাস-প্রবণতার মধ্যে। এঁরা যাকে বিশ্বাস করে, নিজের ধন-মান-প্রাণ সব তার হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করে না, আজকার বিশ্বাস-পাত্র কাল সব বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তার সমগ্র মান-ইজ্জৎ নরকের কুণ্ডে ডুবিয়ে দেবে কিনা, সে কথা একবারের তরেও ভেবে দেখে না। বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি ইচ্ছা ক'রেও একটা কিছু ভুল বুঝিয়ে দিলে এরা নির্ব্বিবাদে তা' মেনে নেয়,

এমন কি ভুল জেনেও তার প্রতিবাদ করে না, কর্ব্বার সাহস পায় না। তারই ফল হচ্ছে—আজকার এই দেশজোড়া ধর্ম্ম-প্রচারের নামে অকথ্য ব্যভিচার। কোথাও রস-সাধনের নামে সতী নারীর মর্য্যাদা-হানি হচ্ছে, কোথাও তত্ত্বকথার গুদামের আড়ালে রেখে সাধ্বী নারীর ললাটে কলঙ্কের ছাপ মেরে দেওয়া হচ্ছে। নারী-জাতির সহজ বিশ্বাসের উপরে আজ exploitation (অত্যাচার) চলছে। এই exploitation (অত্যাচার) বন্ধ কত্তে হবে। নারীর চিত্তের মধ্যে এমন এক দৃঢ়তা আন্‌তে হবে, এমন এক সৎসাহস সৃষ্টি কত্তে হবে, যেন কোনো পুরুষ ভুল বুঝাতে চাইলেও সে তা' না বোঝে; অন্যায়কে, অসত্যকে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মের মুখস পরিয়েও তার কাঁধের উপর চাপাতে চাইলে সে তা' না স্বীকার করে। এমন এক আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের বদ্ধমূল সুশিক্ষা স্ত্রীজাতিকে দিতে হবে, যেন সে বন্ধু ব'লে, সতীর্থ ব'লে, সহযোগী ব'লে, এমন কি গুরু ব'লেও যদি কোনো পুরুষকে গ্রহণ করে, তবু যেন নিজের নারী-মর্যাদার সীমা-লঙ্ঘনকারীকে ক্ষমা কত্তে প্রস্তুত না থাকে। নারীর ভিতরে কোমলতাকেই আমরা এতদিন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে তার চরিত্রে আরো একটী জিনিষ ফুটাতে হবে। তার নাম তেজস্বিতা।

গুরুবাদ ও নারীধর্ম্ম

একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরুতে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ সর্ব্বশাস্ত্রের বিধান। আবার নিজের নারী-মর্য্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখা

নারী-ধর্ম্মের বিধান। যদি এই দুই ব্রতের মধ্যে কখনো দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহ'লে নারীর কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' ত' এই মাত্রই বলেছি। নারী সর্ব্বাগ্রে তার নারী-ধর্ম্মকে বজায় রাখবে। কেননা, সতীত্ব না থাকলে কারও শিষ্যত্ব সত্য হয় না। আরও একটী কথা মনে রাখতে হবে যে, গুরুতে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের মানে এই নয় যে, গুরুর ইন্দ্রিয়পরিতর্পণের জন্য নিজেকে ব্যবহার কত্তে হবে। গুরুতে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের মানে গুরু-পাদপদ্মে সকল স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জ্জন দেওয়া, গুরুকে অহেতুক কৃপা-সিন্ধু জেনে তাঁর আদেশ পালনের জন্য মরণ পণ করা, ভগবানকে লাভ করার যে সুপবিত্র পন্থা তিনি নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন, তা' দৃঢ়তা-সহকারে আঁকড়ে ধ'রে থাকা। গুরু যে সাধন দান করেছেন, তার উপরে পূর্ণ নির্ভরেরই নাম গুরুতে আত্ম-সমর্পণ।

গুরু একটা মাংস-পিণ্ড নহেন

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ভক্তেরা কোথায় গোল বাঁধিয়েছেন, জানো? অনেক ভক্তই মনে ক'রে থাকেন, গুরু একটা মাংস-পিণ্ড, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদির আধার ও প্রবৃত্তিনিচয়ের ক্রীড়নক একটা মানুষ। গুরুকে মানুষ ভাবতে গিয়েই মানুষের যার যা প্রবৃত্তি, তার দিক থেকেই গুরু-সেবার চেষ্টা হয়েছে। কেউ গুরু-সেবা করেছেন অর্থ দিয়ে, কেউ আহার্য্য দিয়ে, কেউ বা দেহ দিয়ে। কিন্তু এতে গুরুর সেবা হয়নি আদবেই। গুরুর যে প্রকৃত সেবা, তা' হয় শুধু সাধনের একনিষ্ঠা দিয়ে। অন্য কোনও বস্তুই গুরু-সেবার জন্য অপরিহার্য্য নয়।

গুরুর গুরুত্ব ও শিষ্যের শিষ্যত্ব কখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি এ কথা বল্‌ছি না যে, কোনও শিষ্য গুরুকে অর্থ-দান, অন্ন-দান বা ভূমি-দান কর্ল্লে অপরাধী হয়। আমার এত কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থাপিত হ'লে উভয়ের গুরুত্ব ও শিষ্যত্ব গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একের জন্য অপরের যে স্বাভাবিক কল্যাণ-কারিণী শক্তি, তা' অচেতন হ'য়ে পড়ে।

দাম্পত্য-জীবনে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে স্থানে গুরু ও শিষ্যার সম্বন্ধ, সেখানে কি রকম হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ও গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের দিক্ থেকে পরস্পর-বিরুদ্ধ। এই জন্যই প্রথম সময়ে গুরু-শিষ্যা-সম্বন্ধ বারবার ম্লান হ'য়ে থাকে। কিন্তু সাধনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্য-জীবনটা কাম-লেশ-হীন আশ্চর্য্য এক গভীরতা প্রাপ্ত হয়। তখন গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধ জ্বলন্ত ভাস্করের মতন জ্যোতির্ম্ময় হয়।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১৪ই আষাঢ়, ১৩৩৫

ব্রহ্মচর্য্য ও সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়

অদ্য সতনপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত জ—র নেতৃত্বে কয়েকটী কিশোর বেলা প্রায় প্রায় দুই ঘটিকার সময়ে পুপুন্‌কী আশ্রমে

পৌছিলেন। ইঁহারা ভোর সময়ে রওনা হইয়া সমগ্র পথ হাটিয়া আসিয়াছেন। আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলে পর বালকেরা শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত নানা আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন।

জ—বলিলেন,—আমাদের এই মানভূম জেলায় মহৎ লোক জন্মায়নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এত দিন যদি জন্মাননি ত' এখন জন্মাতে থাকবেন। তার জন্যে ভাবনা কি'রে? তুই নিজেই একটা বড় লোক হয়ে দাঁড়া না! সঙ্কল্প কর, বড় হবিই হবি। আর, সঙ্গে সঙ্গে বড় হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টাও কর।

জ—সংশয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমরা কি কখনো মহৎ হ'তে পার্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কেন পার্ব্বি না? জগতের যত বড় বড় লোক, সবাই ছোট বয়সে তোরই মত ছিলেন। সাধনার বলেই তাঁরা সিদ্ধ হ'য়েছেন। তুইও বড় হবার সাধনা আরম্ভ কর।

জ।—কি সাধনা কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথমতঃ কত্তে হবে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা। এই সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ কর্ত্তে পারে, অপর সকল কঠোর সাধনায় তার সিদ্ধত্ব জন্মে চ'খের পলকে। তুই কি খুব বিদ্বান হ'তে চাস্? তা হ'লে আগে ব্রহ্মচর্য্য কর,—দেখবি, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃষ্টির ক্ষমতা কতগুণ বেড়ে যায়। তুই কি পালোয়ান হ'তে চাস্? তাহ'লেও আগে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হ'য়ে নে। দেখবি, সামান্য সময়ের মধ্যেই তোর দেহের বল কত বেড়ে যাচ্ছে। তুই কি গায়ক হ'তে চাস্? তাহ'লেও দেখবি ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা তোর কণ্ঠের মাধুর্য্য শতগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। তুই কি প্রেমিক

হ'তে চাস্? তাহ'লেও দেখবি, ব্রহ্মচর্য্যেরই ফলে তোর নিষ্কাম-প্রেম জগতের সকল জীব-জন্তুর উপরে গিয়ে সমভাবে পড়্ছে। যে ব্রহ্মচারী নয়, সে কখনো জীবে প্রেম দান কত্তে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্যই ভাবী ভারতের অভ্যুত্থান

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—তোরা হলি সব প্রভাতের নবোদিত সূর্য্য। তোদেরি জীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার ফল হবে—ভারতের আকাশে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দীপ্তি। তোরা যদি মানুষ হ'তে পারিস, তোদের পরবর্ত্তীরা হবে অতি-মানুষ বা Super man. ভিতরের শক্তিপুঞ্জকে যদি তোরা ক্ষণস্থায়ী সুখের লোভে অপব্যয়িত না করিস্, তাহ'লে তোদের বংশধরেরা তোদের চাইতেও সহস্রগুণ মহত্ত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ কর্ব্বেন; তোরা যে-কালে শত শত চীৎকার ক'রেও দেশের ক্ষুদ্র একটা দুঃখ দূর কত্তে পারিস্ না, তাঁরা সে-কালে নিমেষের চেষ্টায় কটাক্ষের ইঙ্গিতে জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিশালতম বৃক্ষকে মূল সহ উৎপাটিত ক'রে ফেলবেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন কত্তে আমি তোদের কেন বলি জানিস্? তোরা যদি মানুষ হবার চেষ্টায় শিথিল-প্রযত্ন না হ'স, তাহ'লে একশত বৎসরের মধ্যে ভারতে এক বল-দুর্দ্ধর্ষ, বীর্য্য-বরীয়ান, পুরুষকার-প্রবুদ্ধ, মহাশক্তিশালী নবজাতির সৃষ্টি হবে, যাদের সভ্যতা, ভব্যতা, আচার, নীতি, অনুশীলন ও ইতিহাস সবই হবে সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ বিশিষ্ট। এই যে দেশে কত কত আন্দোলন ও প্রচেষ্টা হচ্ছে কিন্তু দু'দিন পরেই সকলের উৎসাহ-বহ্নি হঠাৎ নিভে যাচ্ছে, তার কারণ ভেবে দেখেছিস কি? এর আসল এবং প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, যে বস্তু থাকলে সৎ-

সঙ্কল্পকে, সৎচিন্তাকে দীর্ঘকালের তরে দৃঢ়হস্তে ধ'রে রাখা যায়, দেশে আজ সেই জিনিষটী নেই। তার নাম হচ্ছে "বীর্য্য-ধারণ।" বীর্য্যই যে সকল উৎসাহের মূল, সকল অধ্যবসায়ের উৎস, বীর্য্যই যে একনিষ্ঠার স্রষ্টা এবং সৎসাহসের জন্মদাতা, দেশ সেকথা বিস্মৃত হ'য়েছে। বীর্য্য-সাধনই যে সকল সাধনার সফলতা-সম্পাদক, তা' ভুলে থেকেই আমরা আমাদের সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতার দুঃসহ লৌহশৃঙ্খলের দৃঢ়তা বাড়িয়ে দিচ্ছি।

স্থান-মাহাত্ম্য

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত পেন্নই গ্রামের একটী স্কুলের ছাত্র প্রায় বিশ পঁচিশ দিন যাবৎ পুপুন্‌কী আশ্রমে সাময়িক কর্ম্মিরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইতিমধ্যে যুবকটীর জল-বসন্ত হইল। সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আঙ্গুরের মত ঠুসঠুসে গুটীগুলি সুপরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই শরীর নিয়ে মাঠে আর কাজ কর্ব্বার দরকার নেই। কয়েক দিন তুই পূর্ণ বিশ্রাম নে।

কিন্তু যেখানে শ্রীশ্রীবাবামণি স্বয়ং রক্ত-বমন রোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বক্ষের অসহনীয় যন্ত্রণা লইয়াও কোনো কোনো দিন রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত মাঠে কোদাল চালাইতেছেন এবং তাঁহার এই অমানুষিক শ্রমের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া ত্যাগব্রতী কর্ম্মীরা এবং এমন কি আশ্রমে এগারো বারো বৎসর বয়সের যে একটী অনাথ বালক আছে, সে পর্য্যন্ত অবিরাম বর্ষায় ভিজিয়া এবং অনলবর্ষী রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া কাজ করিতেছেন, সেখানে জল-বসন্ত রোগীর কি সাধ্য যে, চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন?

সুতরাং যুবক একখানা খুরপী লইয়া চিনাবাদাম ক্ষেতে গিয়া মাটি দ্বারা গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে লাগিলেন।

রুগ্নশরীরেও কাজ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি তিরস্কার করিতেই যুবক বলিলেন,—আমার কি দোষ ,বলুন না। এ আশ্রমে এসে যে আর কারো ব'সে থাক্‌বার উপায় নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার তিরস্কার বন্ধ হইল।

পুপুন্‌কী আশ্রমের মন্ত্র ও তন্ত্র

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী আশ্রমের কর্ম্মাদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। তিনি বলিলেন,—এখানকার মন্ত্র হচ্ছে কর্ম্ম আর তন্ত্র হচ্ছে অভিক্ষা। অবশ্য কর্ম্ম বল্‌তে স্থূলসূক্ষ্ম উভয়বিধ কর্ম্মকেই বুঝাচ্ছে। কিন্তু প্রারম্ভ-সময়ে স্থূল কর্ম্ম নিয়েই তোমাদের ব্যস্ত থাক্‌তে হবে। কারণ, স্থূলকে অগ্রাহ্য ক'রে সূক্ষ্ম কর্ম্মে পৌছান যায় না বা সূক্ষ্ম-সাধনায় অধিকার জন্মে না। কিন্তু স্থূল কর্ম্মও যদি অনাসক্ত যোগীর মনটী নিয়ে না কত্তে পার, তাহ'লে স্থূলের চরণেই তোমাদের জীবন বাঁধা প'ড়ে যাবে, সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবই হবে না।

যোগীর কর্ম্ম ও অযোগীর কর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যোগীর কর্ম্মে ও অযোগীর কর্ম্মে অনেক তফাৎ। অযোগীর কর্ম্ম নিকট-লক্ষ্যকে দৃষ্টিতে রে'খে পথ চলে, যোগীর কর্ম্ম দূরদূরান্তরে অস্পষ্ট লক্ষ্যকে সুস্পষ্ট দর্শন ক'রে বিগত সংশয় হ'য়ে অগ্রসর হয়। এই জন্য অযোগীর কর্ম্ম সাময়িক বিফলতাতে অসহিষ্ণু হয় আর যোগীর কর্ম্ম চরণতলে বিফলতার কণ্টক বিদলিত কত্তে কত্তে নাচ্‌তে নাচ্‌তে

এগিয়ে যায়। তন্দ্রাচ্ছন্ন এই পরাধীন ভারতের কাণের কাছে আজ কর্ম্মের ভেরীই বাজাতে হবে, কিন্তু মনে রাখ্তে হবে, ভারতের কর্ম্মী হবেন যোগযুক্ত অনাসক্ত কর্ম্মী। সুদূরে থাক্‌বে তাঁর দৃঢ়নিবদ্ধ দৃষ্টি, আর হৃদয়ে থাকবে তাঁর এমন বল, যেন প্রাণ দিয়ে যা গড়েছেন, জীব-কল্যাণের প্রয়োজনে নিজের হাতেই তা' নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে চুরে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারেন।

গড়া না ভাঙ্গা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গড়া বা ভাঙ্গা এই উভয়ের প্রতিই যোগী হবেন সমান উদাসীন। একই সময়ে এক হাতে তিনি গড়্‌তে পারেন, অপর হাতে তিনি ভাঙ্গতে পারেন। ভাঙ্গারও তাঁর নেশা নেই, গড়ারও তাঁর ঝোঁক নেই। সুদূরের লক্ষ্য যখন যেমন ইঙ্গিত কর্ব্বে, তখন তিনি তেমন বু'ঝে কর্ম্ম কর্ব্বেন। চতুর্দ্দিকে যখন সহস্র কণ্ঠে ভাঙ্গার গান হচ্ছে, তিনি হয়ত তখন গড়ন ছাড়া আর কোনো দিকে দৃষ্টি না-ও দিতে পারেন, আবার সবাই যখন গঠন-গীতার শ্লোক কণ্ঠস্থ কচ্ছে, তিনি হয়ত তখন পদ্মার ভাঙ্গন সুরু কর্ব্বেন। গ'ড়েও তিনি উল্লসিত নন, ভেঙ্গেও তিনি বিষণ্ণ নন। অযোগী মানব ভাঙ্গতে বা গড়্‌তে ব'সে যে স্বাভাবিক মানসিক সংগ্রামে প'ড়ে বারংবার দ্বিধা-পীড়িত হয়, তিনি থাকেন সেই অবস্থার ঊর্দ্ধদেশে। শরীরকে কর্ম্ম-সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েও তাঁর মন থাকে মৌন ও নিঃস্তব্ধ। এই জন্যই যোগী কর্ম্মীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকা থাকতে পারে না। তিনি সাময়িক ভাবে হয়ত কোনও কর্ম্ম-তালিকাকে সম্পাদন কত্তে পারেন কিন্তু তাঁর মন, বুদ্ধি ও লক্ষ্য কর্ম্মতালিকার অতীত জগতে বাস ক'রে। তালিকার তিনি অধীন নন, পরন্তু তাঁর

অনাসক্ত উদাসীন মন কোটি কোটি অযোগী মানবের জন্য সকলের অজ্ঞাতসারে সহস্র সহস্র অভাবনীয় কর্ম্ম-তালিকা সৃষ্টি ক'রে দেয়।

পুপুন্‌কী আশ্রম ও যোগী কর্ম্মী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ তোমরা প্রাণপণ ক'রে পুপুনকী আশ্রমকে গ'ড়ে তুলছ, গভীর বনকে উৎখাত ক'রে সেইখানে এক নন্দন-কানন সৃষ্টি কচ্ছ, বিষধর সর্পের সাথে নির্ভয়ে একত্র রাত্রি-যাপন কচ্ছ, অখাদ্য বন-লতা খেয়ে প্রাণ-ধারণ কচ্ছ, কিন্তু তাই ব'লে মনে ক'রো না, একদিন যখন এই আশ্রম সুন্দর রূপে সুগঠিত হ'য়ে যাবে, তখন যদি ভাঙ্গার আদেশ বিধাতার রুদ্রকণ্ঠে নিঃসৃত হয়, তাহ'লে সে-দিন মায়া করলে চল্‌বে। প্রাণের মায়া না ক'রে আজ যেমন কঠোর পরিশ্রম কচ্ছ আশ্রম গড়বার জন্যে, আশ্রমের মায়া না ক'রে সেইদিন তেমন আবার লাগ্‌তে হবে অন্য কোনও মহত্তর কর্ম্মে। আজ আশ্রমটীকে গড়াই হচ্ছে তোমাদের জীবনের মহত্তম ব্রত, সেইদিন আশ্রমকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে ক'রে পরিত্যাগ করাই হয়ত হবে জীবনের পরম সাধনা। বিষবৃক্ষ নাকি রোপণ ক'রে নিজ হাতে কেউ কাটতে পারে না। কিন্তু সে কথা অযোগীর পক্ষেই সত্য। পরন্তু অমৃত-বৃক্ষও যদি নিজ হাতে রোপণ ক'রে থাক, তবে, যদি প্রকৃত কর্ম্মযোগী হ'য়ে থাক, বিধাতার আদেশে নির্ম্মম চিত্তে অব্যাকুল হৃদয়ে নিজের হস্তেই তাকে ছিন্নমূল করার জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। যোগীর শাস্ত্রে "ভাঙ্গা" বা "গড়া" ব'লে কোনও নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান নেই, এগুলি তাঁর দৃষ্টিতে আপেক্ষিক সত্য মাত্র।

পুপুন্‌কীতে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দর্শন-শাস্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, পুপুন্‌কীতে যে আশ্রম-প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হ'ল, এর পশ্চাতেও একটা বিরাট দর্শন শাস্ত্র রয়েছে। সেই দর্শনের মূল ভিত্তি হ'ল এই এক মহাসত্য যে, —"আলস্যই ভারতের জাতীয় শত্রু"। এই মহাশত্রুর নিপাতই হ'ল তোমাদের আশ্রম-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কিন্তু বৃত্রাসুর বজ্র ছাড়া নিহত হয় না। তাই তোমাদের অভিক্ষা। অভিক্ষা তোমাদিগকে বজ্রে পরিণত কর্ব্বে তবেই তোমাদের তেজে দেশব্যাপী আলস্যের বিনাশ হবে। অলসের আলস্য বক্তৃতায় কখনো যাবে না, যাবে তোমাদের অভিক্ষা-সাধনার পূর্ণ-সিদ্ধির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দর্শনে। আলস্য আজ মহামারীর তুল্য সংক্রামক হয়েছে। সমগ্র দেশ একেবারে বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছে যে, বিধাতার কৃপা অলসের দুয়ারে পৌছে না। তোমাদিগকে আজ অভিক্ষার শক্তিতে তার প্রতিকার কত্তে হবে। তোমাদের যে ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন, তাকে শুধু কথার আন্দোলন-রূপেই থাক্‌তে দিলে হবে না, তাকে পরিণত কত্তে হবে এক অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মান্দোলনে এবং সেই কর্ম্মান্দোলনকে সমাজের গলগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত না ক'রে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে কর্ম্মীদের নিজেদের পায়ের উপরে। কর্ম্মী যদি তাঁর কদন্ন, তাঁর অর্দ্ধাশন, তাঁর ছিন্নচীরখণ্ড গায়ে খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জ্জন কত্তে না পারেন, তাঁকে যদি চাঁদা-দাতার মুখপানে তাকিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কত্তে হয়, তবে আর দেশব্যাপী সহস্র দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর্ব্বেন তিনি কেমন ক'রে ? এই জন্যই তোমাদের জীবন থেকে ভিক্ষাবৃত্তির নির্ব্বাসন। তোমাদের জানতে হবে, ভিক্ষুকের জাতির ধর্ম্মও হয় না, কর্ম্মও

হয় না। তোমাদের জান্‌তে হবে, ভিক্ষার্থী পরাধীন, হীনমনাঃ, দুর্ব্বল।

ব্রহ্মচর্য্য ও বংশানুক্রম

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—সন্ন্যাসীর দল পুরু করার দুর্ব্বুদ্ধি তোমাদের থাকবে না। কেননা, তোমরা একটা বা দুইটা মাত্র লোকের কৃতকৃতার্থতা চাইতে পার না, তোমাদের চাইতে হবে সমগ্র জাতির কৃতকৃতার্থতা। সন্ন্যাসের অনাবিল শুদ্ধতা দেখিয়ে দু-চার জনকে পূর্ণতার পথে প্রেরণা দেওয়াই তোমরা যথেষ্ট ব'লে মনে কত্তে পার না, তোমাদের চাইতে হবে সমগ্র জাতির পূর্ণতা। কিন্তু গার্হস্থ্য তু'লে দিলে জাতির জাতিত্ব থাকে না, সেটা একটা সম্প্রদায় মাত্রে পরিণত হ'য়ে যায়। বংশধারা বেয়ে বেয়ে পূর্ণতার সুকৃতি সমগ্র জাতির প্রত্যেকটী নর-নারীর উপরে এসে পড়ুক, এইটিই হবে তোমাদের প্রধানতম কাম্য। তাই তোমাদের চাইতে হবে ব্রহ্মচর্য্যকে বংশানুক্রমিক কত্তে। ব্রহ্মচারী গুরু ত' চাই-ই,—এবং অধিকাংশ স্থলে তিনি হয়ত সন্ন্যাসীই হবেন, কিন্তু ব্রহ্মচারী পিতা-মাতা না পেলে, ব্রহ্মচারী গুরু আর কতখানি কি কর্ব্বেন ? উপাদান যদি নিকৃষ্ট হয়, তাহ'লে খুব ভাল শিল্পীও উৎকৃষ্ট জিনিষ গড়্‌তে পারেন না।

বংশানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য

অন্যান্য নানা কথার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বংশানুক্রমিক সুজননের চেষ্টার ফলে য়ুরোপের পশু-ব্যবসায়ীরা অভাবনীয়-গুণ-সম্পন্ন পশু উৎপন্ন করেছেন। দৌড়ের ঘোড়া

আর অপরাধী-অন্বেষণপটু কুকুর এই বংশানুক্রমিক সুজননেরই ফল। আমেরিকার কৃষি-যাদুকর লুথার বারবাঙ্ক পুরুষানুক্রমিক যত্নের ফলে সামান্য এক একটী বীজের বংশে অসামান্য উদ্ভিদসমূহ সৃষ্টি করেছেন। এসব যেমন সম্ভব হয়েছে, ভারতবর্ষেও তেমন বংশানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার ফলে এক অত্যদ্ভুত-শক্তিশালী মহামানবজাতির অভ্যুদয় হবে। এখনও এদেশে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার অনুকূল অবস্থা-নিচয় রয়েছে। এই আনুকূল্যের সুযোগ যদি তোমরা উপেক্ষা না কর তা' হ'লে তোমরা যে জগতের বুকে কত বড় বিশাল ইতিহাস রচনা ক'রে যেতে পার্ব্বে, তা' কল্পনা ক'রেও বোঝা অসাধ্য।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১৫ই আষাঢ়, ১৩৩৫

কর্ম্মই ব্রহ্ম

আশ্রমের এখনও হাল-বলদ হয় নাই। সুতরাং পয়সা দিয়া অন্য লোকের হাল-বলদের সহায়তায় কার্য্য চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু হাল-বলদ মিলিতেছে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—There shall be no Alps (আল্পস্ পর্ব্বতের বাধা থাক্‌বে না।) এস আমরা কোদাল চালিয়ে এই একশত বিঘা জমি চূর্ণ ক'রে দেই।

একজন কর্ম্মী বলিলেন,—আপনার শরীরে যে সইবে না!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—Lame excuse (বাজে অজুহাত!) অভ্যাসে কি না হয় ? জানো না, কর্ম্মই ব্রহ্ম, কর্ম্মই তপস্যা ? চালাও কোদাল জোর্‌সে!

সেই দিন হইতে আশ্রম কর্ম্মীদের কোদালই মৃত্তিকার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। অবিরাম বর্ষায় মৃত্তিকা কোমল হইয়াছে বলিয়া গাতি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইল না। অবিরাম বারিপাতের মধ্যে আপাদমস্তক জলসিক্ত হইয়া কর্ম্মীরা শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত কাজ করিতে লাগিলেন।

ভবিষ্যতের সুযোগ ও উপস্থিত শ্রম

কয়েক দিবস পরে অবশ্য হাল-গরু সংগ্রহ হইল, কিন্তু তখন দেখা গেল যে, হালের আর প্রয়োজন নাই। যতটুকু জমির জঙ্গল নির্ম্মূল হইয়াছে, সবটুকুই কোদালের মুখে কোমল হইয়াছে। সেই সময়ে আশ্রমের জনৈক কর্ম্মী আফশোষ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই কঠোর শ্রমটা না করিলেও পারিতাম।" শ্রীশ্রীবাবামণি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"ভবিষ্যতে সুযোগ পাইবার আশায় যে উপস্থিত পরিশ্রমকে এড়াইতে চাহে, সে প্রকৃত কর্ম্মী নহে, সে আলস্যেরই ক্রীতদাস।"

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৫

আপন হাত জগন্নাথ

পুপুন্‌কীতে আশ্রম হইবার পর হইতে পার্শ্ববর্ত্তী কোনও কোনও গ্রামের অধিবাসীরা কাহারও বিনানুরোধেই দিনের পর দিন শুধু এই কথাটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত জানাইয়া যাইতেছেন যে, বর্ষাপাত হইলেই তাঁহারা এক এক গ্রাম হইতে পঁচিশ ত্রিশখানা করিয়া হাল আনিয়া বিনা পারিশ্রমিকে আশ্রম-ভূমি কর্ষণ করিয়া দিয়া যাইবেন। শ্রীশ্রীবাবামণি প্রত্যেককে ধন্যবাদ

প্রদান করিয়া বিদায় দিয়া নিজ কর্ম্মীদিগকে বলিলেন,—''বাল্যকালে পিতৃদেবের নিকট হইতে যে সব মূল্যবান্ উপদেশ পাইয়াছি, তার মধ্যে একটী হইতেছে,—'যে সহকর্ম্মীকে একটী কাজের জন্য দুইবার আদেশ দিতে হইবে, তাহাকে বর্জ্জন করিবে,' দ্বিতীয়টী হইতেছে—'কাজের আগেই যাহারা বেশী বেশী কথা বলে, তাহাদের কথার উপর কোনও মূল্য-নির্দ্ধারণ করিও না।' দেখিও, এই সব বাক্য-বীরেরা কার্য্যকালে আত্মপ্রকাশ করিবেন না।''

কার্য্যকালেও ব্যাপার তাহাই ঘটিল। বর্ষা-সমাগমে 'আজ আসি', 'কাল আসি' করিয়া গ্রামবাসিগণ নিরন্তর সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন কিন্তু লাঙ্গল-কাঁধে এক দিনও কাহারও দর্শন মিলিল না। আশ্রমের একজন কর্ম্মী এই ব্যাপার লইয়া একটু দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দূর বেটা ভিক্ষুক! আপন হাত জগন্নাথ। ভিক্ষার্থীই যে যথার্থ পরাধীন।

সত্যহীনতাই বলহীনতা

কর্ম্মী বলিলেন,—আমি তাদের সাহায্যের লোভী হ'য়ে দুঃখ-প্রকাশ করিনি বাবামণি। তাদের এই সত্যবাদিতার অভাবই আমাকে দুরন্ত পীড়া প্রদান ক'রেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তা হ'লে আমি আমার এই ভর্ৎসনাটা ফিরিয়ে নিলাম রে! কিন্তু বাছা! এই রকমের সত্যহীনতা আজ ভারতবর্ষের প্রতি সমাজে রাজত্ব কচ্ছে। একটুখানি সত্য অতি কষ্টে বেঁচে আছে আজ সতী রমণীদের অঞ্চলের ছায়ায়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্ব্বার আক্রমণে

সেইটুকুও বুঝি আর থাকে না। সত্যহীনতাই আমাদের জাতীয় জীবনে বলহীনতার সর্ব্বপ্রধান কারণ, আর এই বলহীনতাই সর্ব্ববিধ পরবশতাকে নিয়ে এসেছে আমন্ত্রণ ক'রে।

স্বাবলম্বন ও অপরের প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—মানুষ যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, নিশ্চয়ই অন্তরের সদ্বুদ্ধির প্রেরণায় তা' দেয়। কিন্তু যখন প্রতিশ্রুতি পালনের সময় আসে, তখন দেখে যে তা' পূরণের ক্ষমতা তার নেই। অথবা দেখে যে, প্রতিশ্রুতি রক্ষার অবসর তার নেই। কিম্বা দেখে যে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা কত্তে গেলে যতখানি স্বার্থত্যাগ করা প্রয়োজন, ততখানি স্বার্থত্যাগের রুচি বা প্রবৃত্তি তার সৃষ্ট-পুষ্ট হয়নি। তখন তালবাহানা করে। কিন্তু সমাজ-সেবক যদি এসব প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর ক'রে নিজের কর্ত্তব্যে ঢিলা দেয়, তবেই বিপদ। মহাসমারোহে উচ্চারিত প্রতিশ্রুতিগুলিই অধিকাংশ সময়ে একেবারে মাঠে মারা যায়। যে যত তাড়াতাড়ি তার প্রতিশ্রুতি-বাক্য উচ্চারণ করে, সে তত তাড়াতাড়ি সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায়। প্রতিশ্রুতি দেবার কালে লোকে মনে মনে এক রকম আশা পোষণ ক'রে কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনের কালে বাধাগুলিকেই প্রামাণ্য ব'লে মেনে নেয়, নিজের স্বার্থের সেবাকেই বড় ক'রে দেখে। সুতরাং কারো প্রতিশ্রুতির উপরে অত্যধিক আস্থা দিয়ে নিজের চেষ্টা-উদ্যোগকে শিথিল কর্ব্বে না। প্রতিশ্রুতিদাতা ইচ্ছা ক'রেই কতকগুলি মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছেন, এরূপ মনে ক'রে তাঁকে অপমানিত করার

প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস কর যে, তিনি শাদা মনে সরল প্রাণে মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য নিশ্চিত চেষ্টা কর্ব্বেন, এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু একথাও স্মরণে রাখ যে, বলায় আর করায় অনেক তফাৎ, বলার পরে করার মাঝে অনেক অপ্রত্যাশিত বাধা এসে বিপত্তি সৃষ্টি কত্তে পারে এবং অনেক সৎ-লোককেও দায়ে প'ড়ে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ কত্তে দেখা যায়। দুর্ভিক্ষের চাঁদার প্রতিশ্রুতি, কাউন্সিলের ভোটের প্রতিশ্রুতি, এসব যে কত ভঙ্গ হচ্ছে, ইয়ত্তা নেই। সবাই ইচ্ছা ক'রেই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ ক'রে, তা' নয়, অনেকে দায়ে প'ড়ে ক'রে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক'রে। প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি-দাতার যখন সব সময়ে কর্ত্তৃত্ব চলে না, তখন তুমি লোকের প্রতিশ্রুতির উপরে ভরসা ক'রে নিজের কাজে অবহেলা কেন কর্ব্বে ? জাতির জীবনের এক ঘোরতম সন্ধিক্ষণে দেশমাতৃকা যখন আহ্বান কর্ব্বেন,— 'কে দিবি সেবা, কে দিবি দান, কে দিবি হৃদয়, কে দিবি প্রাণ' —সেই দিন হয়ত এই রকম ভিত্তিহীন প্রতিশ্রুতি সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হবে এবং যথার্থ দেশসেবককে প্রতারিত কর্ব্বে। আন্তর্জ্জাতিক জীবনের ঘোরতর বিপদের মুহূর্ত্তে হয়ত এক জাতির প্রতিশ্রুতি অপর জাতির অতন্দ্রিত আত্ম-গঠনের মাঝে এনে দেবে আলস্য-তন্দ্রা, উদগ্র কর্ম্মের জাগ্রত সাধনার মাঝে এনে দেবে শৈথিল্যের সর্ব্বনাশ। অতীতে এরূপ শতবার ঘটেছে, সুতরাং ভবিষ্যতেও যে ঘট্‌বে না, এমন মনে করা মূর্খতা।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫

তালে তালে নাম কর

শ্রীশ্রীবাবামণি কোদাল চালাইতেছেন। ব্রহ্মচারীরাও নিজ নিজ কোদালসহ নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাইতেছেন। সকলের কোদালই এক তালে পড়িতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি সর্ব্বদাই বলেন,—তালে তালে কাজ কর, তালে তালে নাম কর। কোনো কাজই বেতালে ক'রো না।

নবযুগের সেনাপতি

কিছুক্ষণ কাজের পর গাছতলে বিশ্রামের জন্য গেলে দূরবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে আগত জনৈক ঔষধ-প্রার্থী পল্লীবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবারে বাবা,—আপনাকেও এত পরিশ্রম কত্তে হয়? আপনার শিষ্যেরাই ত' আছেন!

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এক যুগের সেনাপতিরা নিজেরা থাক্‌তেন শিবিরে, সৈনিকেরা লড়াই ক'রে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মরত। নূতন যুগের সেনাপতিরা নিজ নিজ সেনাদলের সঙ্গে থেকে লড়াই করবেন,—মরতে হ'লে তাদের সঙ্গেই মরবেন, জিততে হ'লে তাদের সঙ্গেই যুদ্ধজয় কর্ব্বেন। যে নেতা কেবল হুকুম চালায়, সে নেতাই নয়।

কোদালের সাথে সাথে মালা জপ

অপর এক ঔষধ-প্রার্থী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ, অন্যান্য আশ্রমের সাধুরা ত' ব'সে ব'সে মালা জপ করেন। আপনারা মালা ছেড়ে কোদাল ধ'রছেন কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁরা জপেন মালার সাথে সাথে,

আর আমরা জপি কোদালের সাথে সাথে। জপটা ত' ঠিকই হচ্ছে, বাছা!

উৎকৃষ্ট বৈদ্য

প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীশ্রীবাবামণির কথার কোনও অর্থ বুঝিলেন বলিয়া মনে হইল না।

যে ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবামণির আদেশে ঔষধার্থ সমাগত ব্যক্তিদের ঔষধের পুরিয়া বাঁধিতেছিলেন, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,----ঔষধের পুরিয়া বাঁধাকেও যে মালাজপের সামিল ক'রে নিতে পারে, সে কিন্তু উৎকৃষ্ট বৈদ্য। ঔষধ দিয়ে সে কচ্ছে গ্রাম্য লোকের রোগারোগ্য, আর নাম জ'পে সে কচ্ছে ভবব্যাধির প্রতীকার।

কোদাল-মারা-যোগ

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় কোদাল-চালান আরম্ভ হইল। সমাগত ঔষধ প্রার্থীদের মধ্যে একজন একখানা কোদাল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাজ ধরিলেন। কিন্তু অসম্ভব রকমের কথাবার্ত্তাও সুরু করিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না বাবা, গোল কত্তে পাবে না। মালাজপ করা যেমন একটা যোগ, কোদাল মারাও তেমন একটা যোগ। যোগ-সাধনার ভিতরে কোলাহলের স্থান নেই।

যোগিরাজ-কর্ম্মী ও কর্ম্মিরাজ-যোগী

কোদালের কাজ শেষ হইলে বিশ্রাম করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীদের বলিলেন,—বহির্ম্মুখ কর্ম্ম এবং

অন্তর্ম্মুখ যোগ এক সাথে চল্‌বে। তবে বল্‌ব বাহাদুর। যাঁরা একাধারে কর্ম্মী ও যোগী ভবিষ্যতের দাবী তাঁদের উপর। সমুদ্র গুপ্ত দিগ্বিজয় ক'রেছেন, বাবা গম্ভীরনাথ চিত্ত জয় ক'রেছেন। দুজনই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ভাবী যুগ দাবী কচ্ছে যে, একটা মানুষেরই দেহের ভিতরে এই রকম বিভিন্ন দিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুইটী জীবন ফুটিয়া উঠুক। শুধু যোগিশ্রেষ্ঠ বা শুধু কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতের দাবী নয়। ভবিষ্যতের দাবী তাঁর উপরে, যিনি যোগিরাজ হ'য়েও কর্ম্মী, যিনি কর্ম্মিরাজ হ'য়েও যোগী।

পুপুনকী আশ্রম,
১৮ই আষাঢ়, ১৩৩৫

বর্ষার পীড়ন

অদ্য শেষ রাত্রি হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। আশ্রমের কোনও কর্ম্মীর পক্ষে বাহিরে যাইয়া কোনও কাজ করা সম্ভব নহে। আশ্রম-কুটিরের খড়ের ছাদন খুব ভাল নহে বলিয়া উপর হইতে প্রায় পনের বিশটী স্থানেই জল পড়িতেছে। কুটীরের বেড়া বাঁধা হইয়াছিল গাছের ডাল একত্র জড় করিয়া, বাঁধিবার সূত্র ছিল বনলতা। বারিপাতে সেই বেড়ার অতি দুরবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া পার্শ্বদেশ হইতেও গৃহমধ্যে প্রচুর জল প্রবেশ করিতেছে। কুটীরের কোনও উচ্চ ভিটা ছিল না, ক্রমাবনত প্রান্তরের মাঝখানে কয়েকটা খুঁটী গাড়িয়া কুটিরখানা বাঁধা হইয়াছিল বলিয়া প্রান্তরের জল স্রোতোবেগে আসিয়া গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করিতেছিল। রাত্রিতে বিছানা-পত্র কাপড়-চোপড় সবই ভিজিয়া গিয়াছিল। শুষ্ক জ্বালানী

কাষ্ঠের অভাবে একজন কর্ম্মী ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া উনানে আগুন ধরাইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সেই সময়ে প্রসিদ্ধ স্বরদী ও বেহালা-বাদক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর অত্যদ্ভুত অধ্যবসায়পূর্ণ জীবনী বলিতে লাগিলেন।

অধ্যবসায়ী আলাউদ্দিন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আলাউদ্দিন নিজ মুখে তাঁর এই জীবনী বলেছিলেন এবং আমি তাঁর সামনে ব'সে সঙ্গে সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করি।

শ্রীযুক্ত আলাউদ্দিনের জন্মস্থান ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে। আলাউদ্দিনের পিতা আগরতলার মহারাজের ওস্তাদ প্রসিদ্ধ রবাবী কাশিমালি খাঁর নিকট সেতার বাজনা শিক্ষা করিতেন এবং এজন্য আগরতলাতেই অধিকাংশ সময়ে অবস্থান করিতেন। আলাউদ্দিনের মাতাই তাঁহার শিশু-সন্তানদিগকে লালন-পালন করিতেন।

আলাউদ্দিনের প্রপিতামহ একজন হিন্দু ছিলেন, তাঁর নাম ছিল দীননাথ দে। দীননাথের পিতা একটী দস্যুদলের সর্দ্দার ছিলেন। তিনি এমন প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার দলকে পরিচালনা করিতেন যে, কেহ ঘুণাক্ষরেও তাঁহাকে দস্যু-সর্দ্দার বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত না। শিবপুর, বাঘাউড়া, মীরপুর, মেরকোটা প্রভৃতি অঞ্চলে যে শান্তিপ্রিয় হরিসঙ্কীর্ত্তনানুরক্ত কপালী কৃষক-সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল দীননাথের পিতার সৈনিক-দল। দিবাভাগে ইহারা কৃষিকার্য্যাদি করিত, রজনীযোগে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া স্বকার্য্য-সাধনে বাহির হইত।

একবার দীননাথের পিতা তাঁহার দস্যুদল লইয়া শ্রীহট্ট জেলার মুরাকরি-ফান্দাউক অঞ্চলে কোনও সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপতিত হন। ব্রাহ্মণ বিপদ বুঝিয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই সকল পরিজন লইয়া গুপ্ত-পথে পলায়ন করেন। কিন্তু অতিশয় ব্যস্ততা-নিবন্ধন একটী অল্প-বয়স্কা নিদ্রিতা কন্যাকে ভ্রমক্রমে ফেলিয়া যান। দীননাথের পিতা এই কন্যাটীকে আনিয়া নিজ গৃহে পালন করেন এবং দীননাথের সহিত বিবাহ দেন।

দীননাথের পিতা সামাজিক উৎপীড়ন বশতঃ জিদের বশে-মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একসময়ে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চলের কুকীরা বর্গী দস্যুর ন্যায় নিম্ন ত্রিপুরার প্রজাবৃন্দের উপরে আপতিত হইয়াছিল। কুকীর অত্যাচার প্রশমিত হইলে সামাজিকবর্গ দীননাথের পিতাকে এই বলিয়া বর্জ্জন করেন যে, তিনি কুকীর হাতে ভাত খাইয়াছেন। দীননাথের পিতা তখন ক্ষোভবশতঃ সপরিবারে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

এই বংশেই আলাউদ্দিনের জন্ম। এই জন্য দেখা যায় যে, মুসলমান হইয়াও আলাউদ্দিন হিন্দু দেব-দেবীতে একান্ত বিশ্বাসী, হিন্দু সাধু এবং ব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণ এবং হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। শুধু আলাউদ্দিন নহে, আলাউদ্দিনের পরিবারের স্ত্রীপুরুষ সকলেই হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত। আলাউদ্দিনের অগ্রজ শ্রীযুক্ত আপ্তাবুদ্দিন এমন কি সাধন-দীক্ষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন একজন হিন্দু সাধুর * নিকট হইতে। হিন্দুভাব ইহাদের মধ্যে এমন গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট যে, আলাউদ্দিন ও আপ্তাবুদ্দিন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরামিষ আহার করিতেন।

---

* সাতমুড়া-নিবাসী বহু ধর্ম্ম-সঙ্গীতের রচয়িতা স্বর্গত মনোমোহন দত্ত।

আলাউদ্দিনের যখন নয় বৎসর বয়স, সেই সময়ে আপ্তাবুদ্দিন তাঁহাকে বেহালার ছড় দিয়া আঘাত করেন। সেই আঘাতের ফলে আলাউদ্দিন প্রতিজ্ঞা করেন,—''দাদার চাইতে বড় ওস্তাদ্ না হইয়া আর গৃহে ফিরিব না''—এবং কয়েকটী মাত্র টাকা সংগ্রহ করিয়া রজনীযোগে গৃহত্যাগ করেন।

নয় বৎসর বয়সের গ্রাম্য বালক বিরাট কলিকাতা সহরে আসিয়া মহা ফাঁফরে পড়িয়া গেলেন। সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের খোঁজ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে হাওড়া সেতুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আর কোনও আশ্রয় না পাইয়া গঙ্গার ঘাটেই নিদ্রিত হইলেন। রাত্রিতে রক্ষকরূপী ভক্ষক পুলিশে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং চৌর্য্যের অভিযোগ দিয়া তাঁর যা সামান্য টাকা-পয়সা সব কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রাতঃকালে ঘুরিতে ঘুরিতে আলাউদ্দিন নিমতলা শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একজন সাধুকে শ্মশানে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন এবং প্রাণের দুঃখ জানাইতে লাগিলেন। সাধু বলিলেন,—''নিমতলা ষ্ট্রীটে যাও, সেখানে এক সঙ্গীতের ক্লাব আছে।''

আলাউদ্দিন সেই ক্লাব খুঁজিয়া বাহির করিলেন কিন্তু দ্বারবান্ তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না। ক্লাবের ঠিক বিপরীত দিকে এক ডাক্তারখানার বারান্দায় আলাউদ্দিন রাত্রিতে ঘুমাইয়া থাকিতেন, সারাদিন সহর ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া এক বেলার মত অন্নের সংস্থান করিতেন আর সন্ধ্যার সময়ে প্রতিদিনই ক্লাবে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু প্রতিদিনই দ্বারবানের নিকট গলাধাক্কা খাইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইত। তখন

তিনি ডাক্তারখানার বারান্দায় বসিয়া ক্লাবের গান-বাজনা শুনিতেন। এই ভাবে তাঁর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে দ্বারবান্ আলাউদ্দিনকে গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করিতেছে, এমন সময়ে কিরণচন্দ্র ঠাকুর নামক জনৈক সদস্য ক্লাবে প্রবেশ করিতেছিলেন। তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় দ্বারবান্ বলিল,—''ছোঁড়াটা ভিক্ষুক, অতিশয় নোংরা, ক্লাবে ঢুকিতে চাহিতেছে।'' কিরণবাবু আলাউদ্দিনকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই আলাউদ্দিন তাঁহার সমস্ত ইতিহাস সংক্ষেপে নিবেদন করিলেন এবং সঙ্গীত-শিক্ষাই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এই কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিরণবাবুর দয়া হইল, তিনি আলাউদ্দিনকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

অপরিচ্ছন্ন-বেশ পূর্ব্ববঙ্গীয় ছোক্‌রাকে দেখিয়া ক্লাবের সদস্যেরা কেহই প্রীত হইলেন না কিন্তু যখন তাঁহার সঙ্গীত-শিক্ষার আগ্রহ ও কয়েক মাস যাবৎ প্রত্যহ গলাধাক্কা খাওয়ার বিষয় অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা আলাউদ্দিনের সঙ্গীত-বিষয়ে কোনও জ্ঞান আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আলাউদ্দিন চারি পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই ত্রিপুরার অন্তর্গত বাঙ্গোরার প্রসিদ্ধ তবলা-শিক্ষক রামধন ওস্তাদের নিকট তবলা শিখিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 'অতি সামান্য তবলা বাজাইতে পারি।'

বাবুরা বলিলেন,—''বাজাইয়া শুনাও'' এবং একজন বাবু গান ধরিলেন। আলাউদ্দিন তবলা ধরিয়া দুই মিনিট সাধারণ ভাবে বাজাইয়াই যখন রং পড়ল্ রেলা প্রভৃতি বাজাইতে আরম্ভ

করিলেন, তখন সাড়ে নয় বৎসর বয়সের বালকের এই অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গাইতে পার কি ?"

আলাউদ্দিন রামধন ওস্তাদের ভ্রাতা রামকানাই ওস্তাদের নিকটে গানও শৈশবাবধিই শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি শোরি মিঞার একটী টপ্পা ধরিলেন। গান শুনিয়া সকলেই খুব প্রীত হইলেন।

বাবুরা একজন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর কিছু বাজাইতে পার কি ?

আলাউদ্দিন তখন বেহালা ধরিলেন। আলাউদ্দিনের সহজাত প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল বেহালায়। তাঁর বাদনে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। ক্লাবে তাঁহাকে একজন অবৈতনিক সদস্য করিয়া নেওয়া হইল এবং একজন সদস্য দ্বিপ্রহর বেলা আলাউদ্দিনকে আহারীয় দিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিছুকাল সঙ্গীতালোচনা চলিবার পরে পূর্ব্বোক্ত ক্লাব কোনও কারণে উঠিয়া গেল। যিনি আলাউদ্দিনকে একবেলা আহারীয় দিতেন, তিনি তাঁহাকে রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ গায়ক নূনোগোপাল ওস্তাদের নিকট লইয়া গেলেন। নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নাদি করিয়া নূনোগোপাল ওস্তাদ যখন দেখিলেন যে, এই শিষ্য কিছুতেই ভাগিবেন না, তখন তিনি তাঁহাকে স্বর-সাধনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাত্রি তিনটার সময়ে বেত খাইঁয়া আলাউদ্দিনকে শয্যা-ত্যাগ করিতে হইত। হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পরে ওস্তাদ তাঁহাকে একটা তানপুরা দিয়া একটা কুঠরীতে তালাবন্ধ করিয়া রাখিতেন। বেলা বার ঘটিকার সময়ে দুয়ার খুলিয়া দিতেন।

এই সময় আলাউদ্দিন পূর্ব্বোক্ত সদস্যের বাড়ীতে গিয়া আহার করিয়া আসিতেন। পুনরায় বৈকাল তিনটার সময়ে আলাউদ্দিনকে শিক্ষাগৃহে তালাবন্ধ করা হইত এবং রাত্রি নয় ঘটিকায় ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই ভাবে তিনি প্রত্যহ বারো চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া শুধু স্বর-সাধনাই করিতেন, অথচ ওস্তাদ একদিনের তরে জিজ্ঞাসাও করিতেন না যে, ছাত্র কোথায় খায়, কি খায়। মাস ছয়েক অতীত হইবার পরে একদিন সহসা ওস্তাদের দয়া জাগরিত হইল এবং তিনি আলাউদ্দিনের রাত্রির আহারের ব্যবস্থা নিজের নিকটে করিলেন।

চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত অসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা সহকারে শুধু স্বর-সাধনের পরে গান শিক্ষা আরম্ভ করিবেন, এই রকম সময়ে আপ্তাবুদ্দিন তাঁর নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার খোঁজ করিতে করিতে নূনোগোপাল ওস্তাদের নিকট আসিয়া আলাউদ্দিনকে দেখিতে পাইয়া ওস্তাদের অনুমতিক্রমে ধরিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং একপ্রকার কৌশল করিয়াই বিবাহ করাইয়া দিলেন।

বিবাহ করিবার পরে আলাউদ্দিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন ক্ষণিকের তরে নিষ্প্রভ হইল। বৎসরেক কাল তিনি দেশেই গান-বাজনা করিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু সহসা একদিন পুনরায় তাঁহার সুপ্ত উৎসাহ জাগিয়া উঠিল, তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, সঙ্গীতাচার্য্য নূনোগোপাল স্বর্গীয় হইয়াছেন। যদিও তৎকালে আরও দুই একজন বিখ্যাত সঙ্গীত-শিক্ষক কলিকাতায় ছিলেন, তবু এই ঘটনায় আলাউদ্দিন অন্তরে

এত বড় আঘাত পাইলেন যে, মনের দুঃখে কণ্ঠ-সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্কল্পই ত্যাগ করিলেন এবং কর্ণেট লইয়া ইংরেজী-যন্ত্র-সঙ্গীতবিৎ হাবু দত্তের শরণাপন্ন হইলেন।

হাবুবাবু এক ত্রিতল বাড়ীতে বাস করিতেন। আলাউদ্দিন হাবু বাবুর নিকটে বসিয়া বাজ্না শিখিতে আরম্ভ করিলেই গৃহের কর্ত্রী আসিয়া আলাউদ্দিনকে কানে ধরিয়া নীচের তলায় একেবারে রাস্তার পাশে নামাইয়া নিয়া আসিতেন। ঐখানে বসিয়া গুরুদত্ত পাঠটুকু অভ্যস্ত হইলেই উপর হইতেই হাবু বাবুর ডাক আসিত। নূতন পাঠ লইবার জন্য আলাউদ্দিন উপরে আসিলে হাবুবাবু যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন এবং তাঁহার সমক্ষে বসিয়াই অভ্যাস করিতে বলিতেন। কিন্তু বলিলে কি হইবে ? গৃহকর্ত্রী পুনরায় আসিয়া কর্ণমর্দ্দন করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। এইভাবে লাঞ্ছনা পাইয়া প্রায় ছয় সাত বৎসরে আলাউদ্দিন ইংরেজী সঙ্গীত, নানাবিধ ব্যাণ্ড ও কনসার্ট প্রভৃতি শিক্ষা করিলেন।

অতঃপর তিনি রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ স্বরদী আহম্মদ আলী খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং স্বরদ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ওস্তাদের রান্না করা, ঘর ঝাট দেওয়া, হাত-পা টিপা প্রভৃতি সকল কার্য্যই আলাউদ্দিন করিতেন। আলাউদ্দিনকে পাইবার পর হইতে ওস্তাদ ময়লা কাপড়-চোপড় ধোপা বাড়ী দেওয়া বন্ধ করিলেন, ধোপার কাজ আলাউদ্দিনই করিতে আরম্ভ করিলেন। ওস্তাদ্ আহম্মদ আলি যখন কোথাও বায়না লইয়া বাজনা শুনাইতে যাইতেন, তখন যে সব তবলচি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গত করিতেন, তাঁহাদের পারিশ্রমিক আহম্মদ আলিকেই নিজ পকেট হইতে নির্ব্বাহ করিতে হইত। আলাউদ্দিন

এই তবলচির কাজ চালাইবার জন্য ওস্তাদের অনুমতি চাহিলেন। ওস্তাদ্ আলাউদ্দিনকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, ইনি অসাধারণ শ্রেণীর প্রতিভাবান্ ছাত্র। অতএব ভারতীয় সঙ্গীতের হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ সচরাচর যাহা করিয়া থাকেন, সেই সনাতন কার্পণ্য অবলম্বন করিলেন। আলাউদ্দিন সঙ্গত করাতে আহম্মদ আলির তবলাবাদকের খরচ বাঁচিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তবু শিখাইবার যত্ন নেয় কে ? নিজ প্রতিভার শক্তিতেই আলাউদ্দিন যাহা যাহা পারিলেন, গুরুর বিদ্যা শুনিয়া শুনিয়া আয়ত্ত করিতে লাগিলেন।

অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য একবার আহম্মদ আলি সমগ্র ভারত পর্য্যটনে বাহির হইলেন। আলাউদ্দিন সঙ্গে রহিলেন। দেশভ্রমণের সময়ে আহম্মদ আলি যখন যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তখনই তাহা আলাউদ্দিনকে রাখিতে দিতেন। এই ভাবে তিনি বারো হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। কিন্তু লোকটীর হিসাব-জ্ঞান খুব প্রখর ছিল না। তিনি রামপুর আসিয়াই আলাউদ্দিনের নিকট ছয় হাজার টাকা চাহিলেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এইবার দেশ-ভ্রমণে তিনি উক্ত পরিমাণ অর্থই উপার্জ্জন করিয়াছেন। আলাউদ্দিন গণিয়া ছয় হাজার টাকা ওস্তাদ্‌কে দিলে তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

তখন আলাউদ্দিন বলিলেন,—"হুজুর, আপনার হিসাব করিতে ভুল হইয়াছে।"

আহম্মদ আলি ভাবিলেন, এই ছয় হাজার টাকার মধ্য হইতে আলাউদ্দিন বুঝি নিজের প্রাপ্য বলিয়া কিছু অর্থ চাহে। তাই বলিলেন,—"না, এই ছয় হাজার টাকার সবই আমার পাওনা, তুমিই ভুল করিতেছ।"

আলাউদ্দিন বলিলেন,—"আপনার যে হুজুর আরও ছয় হাজার টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে।"

আহম্মদ আলি বিস্মিত হইলেন। আলাউদ্দিন তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছে নাকি ?

আলাউদ্দিন নিজের বাক্স হইতে আরও ছয় হাজার টাকা বাহির করিয়া ওস্তাদের হাতে দিলেন।

আহম্মদ আলির পিতা বৃদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য আবেদ আলি খাঁ এই নির্ল্লোভতা ও সততা দেখিয়া গদগদ কণ্ঠে আলাউদ্দিনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন কিন্তু আহম্মদ আলি একটী মাত্র কথাও বলিলেন না। শুধু ক্ষিপ্র হস্তে টাকাগুলিই পকেটস্থ করিলেন।

দুই চারি দিনের মধ্যেই আহম্মদ আলির জীর্ণ পৈতৃক বাস-ভবনের পুনঃসংস্কারের জন্য প্রচুর ইষ্টক জমা হইতে লাগিল। আহম্মদ আলি বলিলেন,—"আলাউদ্দিন, তুমি যদি মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু কাজ কর, তাহা হইলে আমার কুলী-খরচ কিছুটা বাঁচিয়া যায়।" ওস্তাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া আলাউদ্দিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কুলীর মতই মাথায় করিয়া ইষ্টকের বোঝা বহিতে লাগিলেন। আলাউদ্দিনের বাধ্যতা দেখিয়া চক্ষু-লজ্জাহীন ওস্তাদ্ ইট বহিবার জন্য আহূত কুলীদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং সঙ্গীত-শিক্ষার্থী আলাউদ্দিনই একাকী সকলের কাজ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু একদিন রজনীযোগে আহারের পরে বসিয়া স্বরদ-বাজনা অভ্যাস করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা আলাউদ্দিন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সমগ্র শরীরটা ধনুষ্টঙ্কারের

মতন করিতে লাগিল। তখন তখনই হেকিম ডাকান হইল। তিনি নানাবিধ ঔষধাদি প্রয়োগের দ্বারা আলাউদ্দিনকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং বলিলেন,—"নিশ্চয়ই কোনও প্রকার গুরুতর দৈহিক শ্রম হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়াছে।" আবেদ আলি অনুসন্ধানের দ্বারা আহম্মদ আলির কীর্ত্তি-কাহিনী অবগত হইলেন এবং পুত্রকে তিরস্কারপূর্ব্বক আলাউদ্দিনের প্রতি খুব যত্নশীল হইলেন।

আলাউদ্দিন সুস্থ হইলে পরে আহম্মদ আলি পুনরায় অর্থোপার্জ্জন-মানসে বিদেশে বাহির হইলেন। তিনি আলাউদ্দিনকে সঙ্গে নিতে চাহিলেন। কিন্তু বিবেচক আবেদ আলি খাঁ তাহা হইতে দিলেন না। তিনি কৌশল করিয়া আলাউদ্দিনকে নিজের কাছেই রাখিয়া দিলেন। অগত্যা আহম্মদ আলি একাকীই বাহির হইলেন।

আবেদ আলি খাঁ তৎকালে রামপুরের গুণি-সমাজে স্বরদ-বাজনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। অসংখ্য সুপ্রতিষ্ঠিত স্বরদীর যশোভাতির ম্লানতা-বিধায়ক আহম্মদ আলি খাঁ তাঁহার এই যশস্বী পিতার পদপ্রান্তে বসিয়াই স্বরদ শিখিয়াছিলেন। উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া আবেদ আলি খাঁ তাঁহার সমগ্র সম্পদ অকাতরে ঢালিয়া দিবার জন্য মনস্থ করিলেন। তিনি আলাউদ্দিনকে বলিলেন,—"আমি আমার সমস্ত ঘরাণা চাল তোমাকে শিখাইয়া দিব, কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমার পুত্র আহম্মদ আলি যখন যেখানে থাকিবে, সেইখানে তুমি আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত বিদ্যার চর্চ্চা করিবে না।" আলাউদ্দিন ইহাতে সম্মত হইয়া স্বরদ শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর পরে আহম্মদ আলি স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে একদিন রজনীতে আলাউদ্দিন একাকী নিজ কক্ষে বসিয়া আবেদ আলির প্রদত্ত রাগ-রাগিণী-সমূহের অভ্যাস করিতেছিলেন। দৈবক্রমে দূর হইতেই বাজনা শুনিয়া আহম্মদ আলি স্তম্ভিত হইলেন। ''আমারই ঘরাণা জিনিষ সব কে বাজাইতেছে রে?''—ভাবিতে ভাবিতে তিনি আলাউদ্দিনের কক্ষে আসিয়া পদাঘাতে দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং আলাউদ্দিনকে দেখিতে পাইবামাত্রই তাহাকে নানাপ্রকার গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাগ পড়িল না। তিনি গিয়া বৃদ্ধ পিতাকে শয্যা হইতে টানিয়া তুলিলেন এবং নানা প্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

আবেদ আলি ক্ষুব্ধ হইয়া আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—''তোমাকে আমি যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছিলে?''

আলাউদ্দিন বলিলেন,—''আমি ভাবিয়াছিলাম, প্রকাশ্য সভাতে বাজানোই আপনি নিষেধ করিতেছেন। সঙ্গোপনে বসিয়া রেওয়াজ করাও যে নিষেধ, তাহা ত' আমি বুঝিতে পারি নাই! পারিলে নিশ্চয়ই আমি করিতাম না।''

আবেদ আলি কহিলেন,—''যাহা হইবার হইয়াছে। তুমি আর কি করিবে? আহম্মদ আলি আমার আদুরে ছেলে, তাই সে দুরন্ত অভিমানী ও অসহিষ্ণু। তাহার হাতে আমার অপমান কপালে লেখা ছিল, তুমি আর তাহা কি করিয়া খণ্ডাইবে?''

পর দিবস আবেদ আলি রামপুরের প্রসিদ্ধ ও বৃদ্ধ ওস্তাদবর্গকে নিজ আলয়ে আমন্ত্রণ করিলেন। ওস্তাদগণ সকলে সমবেত

হইলে আবেদ আলি আলাউদ্দিনের সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দিয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—''এই যুবকটী সুদূর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এখানে আসিয়া আমার নিকটে স্বরদ শিক্ষা করিতেছে। সম্প্রতি সে দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহে। আপনারা ইহার বাজনা শুনিয়া যদি মনে করেন যে, ইহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহা হইলে দেশে যাইতে পারে। আপনারা যদি অনুমতি দান করেন, তবে সে বাজাইয়া শুনাইতে পারে।''

ওস্তাদগণ অনুমতি করিলে পর আলাউদ্দিন নিজ রুচি অনুযায়ী কিছু বাজাইয়া শুনাইলেন। তৎপরে বিভিন্ন ওস্তাদেরা বিভিন্ন প্রকারের ফরমায়েস করিতে লাগিলেন। একটার পর একটা করিয়া পরীক্ষায় আলাউদ্দিন কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। আহম্মদ আলিও সমীপেই উপস্থিত ছিলেন। আলাউদ্দিনের নৈপুণ্য-দর্শনে তাঁহার যেন অন্তর্দ্দাহ হইতে লাগিল।

পরীক্ষা সমাপ্ত হইবার পরে সমগ্র সঙ্গীতাচার্য্যমণ্ডলী এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—''আমাদের ওস্তাদদের মধ্যে এই এক গোঁড়ামি বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, নিজ বংশের ছেলে না হইলে প্রাণান্তেও কাহাকেও ঘরাণা চাল শিক্ষা দিব না। আর, যদিও বা একটু আধটু দেই ত' তার মধ্যেও যথেষ্ট কৃপণতা করিব। কিন্তু খাঁ সাহেব আবেদ আলি এই চির-প্রচলিত প্রথাকে পদদলিত করিয়া অসাধারণ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।'' তাঁহারা আরও বলিলেন,—''এই রকম শিষ্য-লাভও বিধাতার বিশেষ কৃপা ছাড়া হয় না। আমরা তাঁহার এই শিষ্য-ভাগ্যে ঈর্ষ্যা বোধ করিতেছি।''

এই সময়ে আবেদ আলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়গণ, এই শিষ্য আমার নয়, শিষ্য হইতেছে আমার পুত্র আহম্মদ আলির।" এই কথা বলিয়া তিনি আলাউদ্দিনের গুরু-সেবা, আলাউদ্দিনের নির্লোভতার ও সততার প্রমাণস্বরূপ সেই বারো হাজার টাকার কথা এবং তাহার আজ্ঞাবহতার দৃষ্টান্তস্বরূপ ইষ্টক-বহনের কাহিনী আদ্যোপান্ত বিস্তারিত ভাবে বলিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন,—"মহাশয়গণ, এই রকম একটী ছাত্রকে আমি অকপটে শিক্ষা দান করিয়াছি বলিয়া আজ আমার প্রাণাধিক পুত্র আমার প্রতি রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ। এই জন্য সে আমাকে অকথনীয় অপমান করিয়াছে এবং আমার সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। হে ওস্তাদগণ, আপনারা ইহার বিচার করুন।"

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই আলাউদ্দিন আসিয়া তাঁহার স্বরদখানা আহম্মদ আলির পদপ্রান্তে রাখিলেন এবং আহম্মদ আলির পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন,—"ওস্তাদজী, আমি স্বরদ শিখিয়াছি বলিয়া যদি আপনার মনে দুঃখ জন্মিয়া থাকে, তবে এই রহিল স্বরদ, আমি সমগ্র জীবনে আর এই যন্ত্র স্পর্শ করিব না। নূনোগোপাল ওস্তাদের মৃত্যুতে মনের দুঃখে কণ্ঠসঙ্গীত চিরতরে ত্যাগ করিয়াছি, আজ আপনার মনে দুঃখ উৎপাদিত করিয়াছি জানিয়া স্বরদও জন্মের মত ত্যাগ করিলাম।"

পিতা এবং শিষ্য উভয়ের চক্ষে জল দেখিয়া আহম্মদ আলি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনিও আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং একবার শিষ্যের নিকট, একবার পিতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

আবেদ আলি খাঁর নিকটে শিক্ষার পরে অনেকেই আলাউদ্দিনকে দেশে ফিরিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, রামপুর-নবাবের ওস্তাদ অদ্বিতীয় বীনকার মহম্মদ উজির খাঁর নিকটে শিক্ষা লাভ করিবেন। ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত তিনি উজির খাঁর বাড়ী যাতায়াত করিলেন কিন্তু দ্বারবানেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই দিল না। তখন তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে, আত্মহত্যাই করিবেন।

রামপুর-প্রবাসী একজন বাঙ্গালী মুসলমান বন্ধু আলাউদ্দিনের এই সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া কহিলেন,—"ভাই, আত্মহত্যাই যখন করিতে বসিয়াছ, তখন তার পূর্ব্বে আর একটা চেষ্টা করিয়াই দেখ না কেন ? রামপুর-নবাব যখন থিয়েটার দেখিয়া ফিরিবেন, তখন তুমি প্রাণের ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার মোটর আটক করিও। তিনি স্বাধীন রাজা, হয়ত তোমার এই অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডও দিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তুমি সে সব গ্রাহ্য না করিয়া এই কাজটী একবার করিয়া দেখ। মোটর আটক করিবার অপরাধে সিপাই-শান্ত্রীরা যখন তোমাকে ধরিবে, তখন তুমি এই আবেদন-পত্রখানা নবাব বাহাদুরকে দিতে চেষ্টা করিও।"

এই বলিয়া বন্ধুটী উর্দ্দূতে এই মর্ম্মে একখানা দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন যে, দরখাস্তকারী আলাউদ্দিন নবাব-বাহাদুরের ওস্তাদ বীণকার মহম্মদ উজীর খাঁর নিকটে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে চাহেন, নবাব বাহাদুর যেন নিজ কৃপাগুণে তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দেন।

যথাসময়ে আলাউদ্দিন থিয়েটার হইতে ফিরিবার পথে নবাবের মটর আটক করিলেন। সৈন্য-সামন্তেরা দ্রুত গিয়া আলাউদ্দিনকে বন্দী করিতেই তিনি তাঁহার পকেট হইতে সেই দরখাস্তখানা বাহির করিলেন। নবাব সাহেব প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, লোকটা কোনও পাগল হইবে। কিন্তু নবাবের সেক্রেটারী যখন দরখাস্তের মর্ম্ম পড়িয়া শুনাইলেন, তখন তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আলাউদ্দিনের আগ্রহ পরীক্ষার জন্য ভীতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিয়াও যখন দেখিলেন যে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বা সাহস বিন্দুমাত্র টলিল না, তখন তিনি বাঙ্গালী জাতির অসমসাহস সম্বন্ধে নানা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিতে করিতে বলিলেন,—"আগামীকল্য দরবারে যাইও।" নবাবের সেক্রেটারী তখনই দরবারে প্রবেশের এক অনুমতি-পত্র লিখিয়া দিলেন।

পরদিন রাত্রিতে আলাউদ্দিন নবাব-দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবাব বাহাদুর প্রথমতঃ তাঁহার স্বরদ-বাজনা শুনিলেন। বলিলেন,—"চমৎকার শিক্ষা হইয়াছে, দেশে যাও, তোমার ভাতের অভাব হইবে না।" বেহালা-বাদন শুনিবার পরে নবাব তাঁহাকে নিজ দরবারে চাকুরী করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রলোভনে আলাউদ্দিনের সঙ্কল্প টলিল না। তখন অগত্যা নবাব তাঁহার ওস্তাদ বীণকার উজীর খাঁ সাহেবকে ডাকাইলেন। অনেক অনুরোধের পরে উজীর খাঁ আলাউদ্দিনকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন।

আলাউদ্দিন ভাবিয়াছিলেন, এতদিনে বুঝি দুঃখ-নিশার অবসান হইল। উজীর খাঁর বাড়ী গেলে দ্বারবান আর পথ রুখিয়া দাঁড়ায় না বটে কিন্তু উজীর খাঁ স্বয়ং বিরূপ রহিলেন। স্বরদখানা

বগলে করিয়া আলাউদ্দিন প্রাতে সাতটায় গুরুগৃহে যান, বারোটায় ফিরেন; বৈকালে চারিটায় যান, রাত্রি দশটায় ফিরেন,—ওস্তাদ তাঁহার এই শিষ্যের পানে একবার ফিরিয়াও চাহেন না, এমন কি একবার বসিতেও বলেন না। অগত্যা আলাউদ্দিন দিনের পর দিন ওস্তাদ্ সমীপে যাইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দণ্ডায়মান অবস্থায় আদেশ-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উজীর খাঁ হয়ত কোনও দিন বীণ বাজাইতেছেন অথবা বংশী-সহযোগে রাগ-রাগিণীর আলাপ করিতেছেন কিম্বা নিজ পুত্রদিগকে গান শিখাইতেছেন,—এমন সময়ে যদি কখনও আলাউদ্দিন গিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি সঙ্গীতের চর্চ্চা বন্ধ করিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিতেন। এইভাবে আলাউদ্দিন দুই দিন কম আড়াই বৎসর কাল দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করতঃ ওস্তাদের কৃপা-কণার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক বিশেষ ঘটনা ঘটিল।

আলাউদ্দিন দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ কাল স্বামি-বিরহে একান্ত ক্লিশ্যমানা হইয়া এক স্ত্রী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন। অপরা স্ত্রীও উন্মাদিনী-প্রায় হইয়া বারংবার আত্মঘাতী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গৃহে মাতা সন্তান-দর্শনের জন্য অধীরা, ব্যাকুলা। এই সংবাদ লইয়া অগ্রজ আপ্তাবুদ্দিন রামপুর আসিলেন। সংবাদ শুনিয়া আলাউদ্দিন বলিলেন,—"ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হউক কিন্তু সঙ্গীতের শেষ না দেখিয়া গৃহে ফিরিব না।" আপ্তাবুদ্দিন উজীর খাঁকে গিয়া ধরিলেন। উজীর খাঁ আলাউদ্দিনকে গৃহে ফিরিবার জন্য আদেশ করিলেন। আলাউদ্দিন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"যাঁর এক কণা

অনুগ্রহের আশায় দুয়ারে দুয়ারে রুটীর টুক্‌রা ভিক্ষা করিয়া জীবন-ধারণ করিতেছি, আজ আমি তাঁহার আদেশও অমান্য করিব। কেন না, সঙ্গীত-শিক্ষা ত' আমার শেষ হয় নাই! এই রামপুরেই আমার অস্থি-পঞ্জর সমাধিস্থ হইবে কিন্তু যাহার জন্য আসিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করিয়া দেশে ফিরিব না।''

আপ্তাবুদ্দিন ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু ভগবান ইতিমধ্যে আলাউদ্দিনের অধ্যবসায়ের পুরস্কার-বিধানের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। উজীর খাঁ যখন একান্ত শিশু, তখন তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। সেই জন্য উজীর খাঁর পিতা নিজের সমগ্র বিদ্যা একজন শিষ্যকে শিখাইয়া তাঁহার উপর আদেশ দিয়া যান যে, তিনি যেন গুরু-পুত্র উজীর খাঁকে সকল বিষয় শিক্ষা প্রদান করেন। শিষ্য গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু উজীর খাঁ কোনও এক বিশেষ জলসাতে পিতৃ-শিষ্যের সেই অধ্যাপনার কথা গোপন করেন। ইহাতে উজীর খাঁর শিক্ষাদাতা মনে মনে বড়ই দুঃখিত হন এবং উজীর খাঁর এই অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ লইবার জন্য কয়েকটী মেধাবী ছাত্রকে প্রাণপণে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই ছাত্রগণের মধ্যে শিক্ষাদাতার বিলাত-প্রবাসী পুত্রও অন্যতম। পিতার সম্মান রক্ষার জন্য পুত্র বিলাতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

কথাটা অবশ্য গোপন রহিল না। তখন একদিকে আলাউদ্দিনের অসামান্য অধ্যবসায়ের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া, অপর দিকে নিজ শিক্ষাদাতার বিশেষ ছাত্রদিগের সহিত সঙ্গীতের লড়াই দিবার জন্য, উজীর খাঁ আলাউদ্দিনকে প্রাণপণে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, উজীর খাঁ স্বকীয় তিন কৃতী পুত্রকেও

আলাউদ্দিনের শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এইভাবে দৈনিক দ্বাদশ ঘণ্টা করিয়া পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর কাল সঙ্গীত শিক্ষা করিবার পর বাংলার অখ্যাত অজ্ঞাত আলাউদ্দিন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরদ-বাদকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

জাতীয় সাধনায় অধ্যবসায়

আলাউদ্দিনের অধ্যবসায়পূর্ণ চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করিবার পর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যে অদমিত অধ্যবসায়, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেই জাতি বড় হয়। একটা জাতির প্রত্যেককেই কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট পথেই যে নিজের অধ্যবসায় পরিচালিত কত্তে হবে, তার কোনও মানে নেই। কিন্তু জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিই যখন নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এক একটা লক্ষ্যকে করায়ত্ত কর্ব্বার জন্যে মরণ-পণ ক'রে সাধনা কত্তে সমর্থ হয়, জাতি তখনি বড় হয়। প্রতিভা খুব বড় জিনিষ সত্য কিন্তু অধ্যবসায়হীন প্রতিভা মাঠে মারা যায়। জগদীশ বসুর অসামান্য প্রতিভা বাঙ্গালী জাতির গৌরব কিন্তু তাঁর অধ্যবসায়ই এই গৌরবকে পরিপুষ্ট করেছে। মহাত্মা গান্ধীর জীবনটা কি? অধ্যবসায়েরই কি তিনি প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ নন? শরৎ চট্টোপাধ্যায় ত' মস্ত বড় প্রতিভাবান লেখক। কিন্তু তিনিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে থাকেন যে, লিখ্‌তে শিখবার জন্য, ভাব্‌তে শিখ্‌বার জন্য তাঁকে অসামান্য সাধনা কত্তে হয়েছে। অল্প-সাধনায় যাঁরা সিদ্ধ হন, তাঁরা প্রায় অসিদ্ধই থাকেন। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ নরক-লাভেরই নামান্তর। আলস্য-পরতন্ত্র জাতি শুধু কৌশলে কিস্তিমাৎ কর্ব্বার ফন্দী

খুঁজে বেড়াচ্ছে,—আমাদের জাতীয় অধঃপতনের এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। মেদা, মহামেদার অভাবে শতমূলী বা শিমূল-মূল দেওয়া চলে কি না, স্বর্ণভস্মের বদলে লৌহভস্মে কাজ চলে কি না, মধুর পরিবর্ত্তে গুড় দিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধের শ্রদ্ধাহীন লোকাচার রক্ষা করা যায় কি না, এই হচ্ছে দেশের মনোগতি। ত্যাগ না ক'রে ভোগ, মূল্য না দিয়ে বস্তুলাভ, এই হচ্ছে আমাদের ফিকির। বাইরের ফোঁটা-তিলকে যদি কাজ চ'লে যায়, তাহ'লে ভিতরের সন্ন্যাস-বৈরাগ্য আমাদের অনাবশ্যক। কষ্ট সইতে কেউ আমরা রাজী নই,—বিনা যত্নে রত্ন কেন পেলাম না, এই হ'ল আমাদের আক্ষেপ। এমন যে বুদ্ধিহীন জাত, বিধাতা তাদেরই ললাটে চির-দুঃখের কালো সাইনবোর্ড লাঞ্ছনার পেরেক ঠুকে এঁটে দেন। আলস্য সে যতদিন না ছাড়ে, ততদিন এই সাইনবোর্ড অচল অক্ষয় হ'য়ে বিরাজ করে।

পুপুনকী আশ্রম,
১৯শে আষাঢ়, ১৩৩৫

নেতা ও আদর্শ

অদ্য রাত্রিতে আশ্রমের ব্রহ্মচারী কর্ম্মীদের সঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বহুবিধ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। সেই সকল কথা অতিশয় মূল্যবান্ হইলেও ব্যক্তিগত বলিয়া তাহার অধিকাংশই এখানে লিখিত হইল না। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নেতা-বিশেষকে জয়যুক্ত করার জন্যেই তোমাদের জীবনোৎসর্গ নয়। তোমরা জীবন দেবে আদর্শের জয়ের জন্যে। আদর্শের তোমরা ধ্যান কর্ব্বে, তারই পদতলে নিজেদের উপঢৌকন দেবে। দেশ জু'ড়ে শত শত নেতা হোক্, শত শত গুরু হোক্, কারো মাথা কারো

কাছে হেঁট করাবার জন্যে তোমরা ব্যস্ত হ'তে পার না। একটা লোককে জগদ্গুরু বা অবতার ব'লে প্রচার তোমরা কখনো কত্তে পার না। হয়ত সে লোকটা সত্যই তোমাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করেছে, হয়ত তোমাদের হৃদয়, মন, প্রাণ সব জয় ক'রে ফেলেছে, হয়ত তার মঙ্গল-ইচ্ছা অলক্ষিতে সমগ্র জগতের উপর প্রভাব বিস্তার কচ্ছে, কিন্তু তবু পার না। অন্যে করে করুক, কিন্তু তোমরা যদি কখনও কত্তে যাও, তবে জানবে, আমাকে খাটো করা হচ্ছে।

গুরু-ভক্তির লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক বস্তুই তার লক্ষণ দিয়ে চেনা যায়। যেমন স্বর্ণ তার ওজন আর ঔজ্জ্বল্য দিয়ে, হীরক তার স্বচ্ছতা ও কাচ কাটবার ক্ষমতা দিয়ে আর চন্দন তার স্নিগ্ধকারকতা ও সুগন্ধ দিয়ে চেনা যায়। গুরু-ভক্তিরও এই রকম কতকগুলি লক্ষণ আছে। প্রাণ দিয়ে গুরুকে ভালোবাসাই গুরুভক্তির প্রথম লক্ষণ,—"জয় গুরু—জয় গুরু" ব'লে তুমি গগন-বিদারী উচ্চ চীৎকার কর কি না কর, তাতে ভক্তির কিছু আসে যায় না। গুরুকে শিবাবতার, কৃষ্ণাবতার বা রামাবতার ব'লে পথে পথে জয়ঢাক পিটিয়ে হয়ত তুমি যাচ্ছ কিন্তু গুরুর একটি তুচ্ছ আদেশকেও নিজ জীবনে প্রস্ফুটিত ক'রে তুল্তে পার নাই। কে বলে তুমি গুরুভক্ত ?

গুরু-বাক্য পালনে শিষ্যের অক্ষমতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য, কোন শিষ্যেরই এত শক্তি থাকে না যে, গুরুবাক্য যথাযথই পালন ক'রে

উঠতে পারে। কিন্তু তার জন্য তুমি দোষভাক্ হবে না। তোমার চাই গুরুবাক্য পালনের অকপট ইচ্ছা। গুরুর আদেশ প্রতিপালনের জন্য যার চেষ্টা আছে, সে যদি কার্য্যতঃ সফল নাও হয়, তবু সে সফলতারই যোগ্য পুরস্কার আহরণ করে।

গুরুতে আনুগত্য ও কুল-কুণ্ডলিনী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুর আদেশ পালনের মত অনুগত মনোভাব আসা মাত্র সাধনে আপনা আপনি রুচি বেড়ে যায়। এ এক আশ্চর্য্য রহস্য। সাধনে রুচি বাড়াবার পক্ষে এমন কৌশল আর কিছু নেই। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি সাধনে উদ্যম প্রযুক্ত হয়, তবে ত সোণায় সোহাগা। কিছুদিন যেতে না যেতেই অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস-মুখ খুলে যায়। দেহে মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রেমাবেশের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় এক এক আধারের বিশেষত্ব অনুযায়ী এক এক প্রকারের অনুভূতি বা উপলব্ধির আমেজ আসতে থাকে। একেই যোগীরা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ব'লে থাকেন। কুল-কুণ্ডলিনী নিয়ে শত শত জনে নানা ধোঁয়াটে ব্যাখ্যা করেছেন, যা শেষ পর্য্যন্ত কতকগুলি শব্দেরই সমষ্টি থেকে যায়, অর্থের বাহক হয় না। সেই শব্দের জঙ্গলে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে অনেকে অসহায় পথিকের মতন উদ্বিগ্ন হয়। কিন্তু চারিদিকে বৃথা না তাকিয়ে, মনকে বৃথা কৌতূহলী না ক'রে অকপট আনুগত্য নিয়ে গুরুদত্ত সাধনে লেগেই যদি কেউ থাকে, তবে শাস্ত্রের গহন অরণ্য আর কুজ্ঝটিকা ভেদ করার চেষ্টা না ক'রেও সাধকের অন্তর্নিহিত শক্তি জেগে ওঠে। তখন রক্তমাংসের মানুষটা দেবতায় পরিণত হয়, প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেমে যায়, স্নিগ্ধ সন্তোষে প্রাণমন পূর্ণ হ'য়ে যায়।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
২০শে আষাঢ়, ১৩৩৫

তপস্বিনী পত্নী লাভের উপায়

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি মেদিনীপুর জেলার বাঘাস্তি-নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকটে এক পত্রে লিখিলেন,—

"আদর্শভাবে বিবাহিত জীবন যাপন করা ক্ষমতা-সাধ্য। কিন্তু সেই ক্ষমতা অর্জ্জন করা অসাধ্য নহে। স্ত্রীকে নিজের মনের মতন করিয়া গড়িয়া তাঁহাকে দেশ-সেবার্থ নিয়োজিত করিয়া উভয়ের সমযোগে আত্মোপলব্ধি লাভ করা একান্তই কবির কল্পনা নহে। ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং সম্পূর্ণই বাস্তব। ইহা শুধু অনুমান নহে, ইহা শত শত জীবনে প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণ বলিয়া জানিও; এবং ইহাও জানিও, তোমার নিজস্ব সাধন-নিষ্ঠাই এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারকে সংঘটিত করিবে।

"বিবাহের পূর্ব্বেই পাত্রী-পরীক্ষা আবশ্যক। কিন্তু পাত্রী-পরীক্ষা করিতে খোলা চক্ষু চাই। বাহিরের চক্ষুর কথা বলিতেছি না, অন্তরের চক্ষু চাই। এই অন্তরের চক্ষু সাধন ছাড়া খোলে না। তাই, বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই যথেষ্ট সাধন-ভজনের আবশ্যকতা আছে। আমি বলি, তুমি এখন বিবাহের পাত্রী সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা বা কল্পনা না করিয়া প্রাণপণ প্রয়াসে সাধন-সমুদ্র মন্থন করিতে থাক। এই মন্থনের ফলেই একদিন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে, একান্ত আশ্চর্য্যরূপে ত্রিলোকের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় সমুৎপাদিত করিয়া তোমার গৃহলক্ষ্মী সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গরাজি ভেদ করিয়া আবির্ভূতা হইবেন। লক্ষ্মীকে খুঁজিবার জন্য তোমাকে দুয়ারে দুয়ারে ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে হইবে না, পরন্তু

তোমার সাধনের অলঙ্ঘনীয় শক্তিতে আপনিই তিনি সংশয়-তিমির-জাল ছিন্ন করিয়া সমুদিতা হইবেন।

"ইষ্টনাম তোমার এই সমুদ্র-মন্থনের মন্দর পর্ব্বত, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস ইহার বাসুকি এবং সর্ব্বপ্রযত্নে বীর্য্যধারণ ইহার কূর্ম্ম।

"এখন সর্ব্বাগ্রে এই সমুদ্র-মন্থনে ব্রতী হও। মন্থন যতই তীব্র হইবে, মা লক্ষ্মীও ততই তোমার নিকটগামিনী হইবেন। অন্তরের সাত্ত্বিকী আকর্ষণ তোমাকে তাঁহার সহিত এবং তাঁহাকে তোমার সহিত যুক্ত করিয়া দিবে। যদি সাধিকা স্ত্রী চাও, যদি তপস্বিনী সহধর্ম্মিণী চাও, যদি সংযম-পরায়ণা পত্নী চাও, তবে নিজের মন-প্রাণ সমগ্র ভাবে সাধনে ডুবাইয়া দাও।"

নাম-মাহাত্ম্য

রাজসাহী জেলা-নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকট লিখিত অপর একখানা পত্র হইতেও নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"ইষ্টনাম সাধক-জীবনের পরম-অমৃত। ইহা সংসারের সকল মৃত্যুসঙ্কুল হলাহলের জ্বালা ভুলাইয়া দেয়, মন-প্রাণ শীতল করে, দুঃখ ও ব্যথা প্রশমিত ক'রে। নাম তোমার অবসাদের উৎসাহ, দুর্ব্বলতার বল, নৈরাশ্যের আশা-রবি-রশ্মি এবং মৃত্যু-নিবারক পরম-রসায়ন। যে ইহার সেবা করে, তাহারই দুঃখ সহিবার, বীরের মত দুঃখ দূর করিবার, অপরের দুঃখ ঘুচাইবার সামর্থ্য বর্দ্ধিত হয়। * * * সংসারীর কর্ত্তব্যে ডুবিয়া রহিয়াছ, —চিত্ত-মালিন্য ত' পদে পদে। কখনও মন ভোগবাসনার দ্বারা, কখনও অপরিমিত ক্রোধের দ্বারা, কখনও লোভের দ্বারা, কখনও হিংসা-দ্বেষ ও অসত্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নিয়ত বিক্ষিপ্ত হইতে চাহিতেছে। এই বিক্ষেপের ত' জ্বালা আছে, দুঃখ আছে,

প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার দায় এড়াইবে কি করিয়া ?—সেই দায় এড়াইবার উপায় নামের সেবা। নাম তোমার মনের সকল উন্মত্ত বাসনা-নিচয়কে সংহার করিবে, চপল-চিত্তকে শান্ত করিবে, ব্যথিত মনকে প্রসন্ন করিবে, অন্ধ কু-সংস্কারকে সুসংস্কৃত করিবে, বৃথা আর্ত্তনাদকে প্রশমিত করিবে। নাম তোমার বুকে দিবে বল, হৃদয়ে দিবে সাহস, আর প্রাণে দিবে শান্তি। নাম তোমার দুর্ব্বলতা ঘুচাইবে, হিংসা-দ্বেষ প্রশমিত করিবে, কাম-ক্রোধ নির্ম্মূল করিবে।"

সদ্গুরুর সন্ধান

খুলনা জেলা-নিবাসী জনৈক অপরিচিত পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিতেছেন,—

"এ জগতে সে-ই ধন্য, যে সদ্গুরুর সন্ধানে নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে।

"কিন্তু বাছা, একজনের পর একজন করিয়া নব-নব দীক্ষাদাতা গুরুর পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইবার নামই সদ্গুরুর অনুসন্ধান নহে। নিজের প্রকৃত পরিচয় ও সন্ধান লাভের নামই সদ্গুরুর সন্ধান। তুমি কে, ইহা চিনিবার নামই সদ্গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করা।

"ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেরই এই এক বদ্ধমূল ধারণা যে, দীক্ষা না লইলে ভগবদ্দর্শন হয় না। বলা প্রয়োজন যে, এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমহীন নহে। দীক্ষা লওয়া বা না লওয়ার উপরে ভগবদ্দর্শন লাভ করা বা না-করা ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে তোমার সাধনের নিষ্ঠা ও প্রাণের ভক্তির উপর। ভক্তিতেই ভগবান্ বিগ্রহ ধরিয়া তোমার নয়ন-সমক্ষে চারু-

চঞ্চল চরণে আসিয়া আবির্ভূত হইবেন, প্রেমেরই টানে তিনি রসস্বরূপ হইয়া তোমার হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া জীবন জুড়াইবেন।

"তুমি যে গুরুর পরে গুরু পরিবর্ত্তিত করিয়াছ, আর প্রণালীর পর প্রণালী ধরিয়া সাধন-পথে শুধু ব্যর্থতাই চয়ন করিয়াছ, তাহার কারণ এই বদ্ধমূল দীক্ষাবাদ। কিন্তু পরীক্ষায় ত' প্রমাণিত হইল যে, দীক্ষা লইলেই ভগবানকে মিলে না, ভগবানকে পাইবার জন্য আরও কিছু চাই। প্রত্যক্ষ ত' দর্শন করিলে যে, মানুষের কাছে মাথা নত করা আর না-করার পার্থক্য অতি অল্পই আছে, যদি না নিজের ভিতরের কুণ্ডলিনী-শক্তি হুহুঙ্কারে জাগ্রত হইয়া উঠে।

"তাই আজ তোমার পক্ষে প্রয়োজন হইতেছে গুরুকরণের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করা। তোমাকে আজ বজ্রকণ্ঠে বলিতে হইবে,—গুরুর কোনও প্রয়োজন নাই, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে আর একজন তীর্থের পাণ্ডা বা কমিশনী দালালের দরকার নাই। তোমাকে আজ জানিতে হইবে, প্রত্যক্ষভাবে, সরাসরিভাবে, অবিচ্ছেদভাবেই তোমার সাথে আর তোমার পরমোপাস্য পরমব্রহ্মের সাথে যোগ, এই যোগের সূত্র হইবার স্পর্দ্ধা করিবার ন্যায্য দাবী অপর কোনও মানব বা মানবী, দেবতা বা দেবীর নাই।—অর্থাৎ অবস্থার ফেরে পড়িয়া তোমাকে গুরুবাদের বিদ্রোহী হইতে হইবে।

"সকলের পক্ষেই গুরুবাদের বিদ্রোহ করিতে হইবে, তাহা বলি না। অনেকের পক্ষে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে, অনেকের পক্ষে গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার প্রবৃত্তিও সত্যসঙ্গতই হইবে। কিন্তু ঘটনার আবর্ত্তন

তোমাকে তাহাদের শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। চক্ষের উপর তুমি দেখিয়াছ, কুল-গুরুর প্রদত্ত দীক্ষা তোমার জীবনে কার্য্যকরী হইল না। স্পষ্টরূপে তুমি অনুভব করিয়াছ, তোমার দ্বিতীয় গুরুর সাংসারিকতার দৃষ্টান্ত তোমার চিত্ত ও মনকে উন্নয়নের পথে টানিয়া নিতে পারিল না। মর্ম্মে মর্ম্মে তুমি অনুভব করিয়াছ, প্রলোভন-প্রেরিত হইয়া যে পরমহংস নামধেয় গুরুর শরণাপন্ন হইয়াছিলে, তাঁহার 'ভেল্‌কি ও বুজরুকি', তাঁহার 'শঠতা' তোমার জীবন-তরীকে ভব-সমুদ্রের একটী তরঙ্গাভিঘাত সহিবারও শক্তি দিতে পারিল না, তাঁহার উপদেশ তোমার জীবনে কার্য্যকর হইল না। তবে কেন আর নূতন করিয়া মানুষ-গুরুর কাছে মাথা নত করিতে চাহিতেছ ভাই ? আমি বলি, তুমি একটু শক্ত হও এবং গুরুবাদের প্রতি তোমার যে অপরিসীম আনুগত্য এতদিন ধরিয়া শুধু পরিপুষ্ট পরগাছার মত বাড়িয়াই চলিতেছিল, তাহাকে ডালে-মূলে উৎপাটিত কর। প্রাণে এক নূতন বিশ্বাস জাগাইয়া তোল যে, নিজের বলেই মানুষ সদ্‌গুরুর সন্ধান করিতে পারে, স্বাধীনভাবে, আত্মপ্রতিষ্ঠভাবে কার্য্য করিবার শক্তি পরমাত্মাই তাঁহাকে দিয়া রাখিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন গুরু, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ও সাধন দিয়া তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তুমি একযোগে সকল মন্ত্র ও সকল সাধন পরিত্যাগ কর এবং একমাত্র 'সদ্‌গুরু' এই নাম-যোগে পরমাত্মার উপাসনা করিতে থাক। ইহাই তোমার পক্ষে পন্থা। এই পন্থাই তোমাকে সত্যে নিয়া পৌছাইবে। * * * সদ্‌গুরুর সেবা করিবার জন্য কোনও তীর্থে বা আশ্রমে যাইবারও প্রয়োজন নাই। সদ্‌গুরু দীন, দুঃখী, আর্ত্ত ও ব্যথিতের মধ্যে

আজ যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার যদি পূজা করিতে পার, তবেই সদ্‌গুরুর পূজা হইবে।'' †

† পরবর্ত্তী কোনও সময়ে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণি এই পত্রখানার অনুলিপি পাঠ করিতেছিলেন। পাঠান্তে বহুগুরুর শিষ্যের দুর্গতির সম্বন্ধে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। তাহা নিম্নে লিখিত হইল,—

(১) তোমার জলের প্রয়োজন, কূপ খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছ। চল্লিশ হাত খুঁড়িলে হয়ত জল পাইবে কিন্তু পনের হাত খুঁড়িবার পরেই স্থানান্তরে জলের অন্বেষণে গেলে। পুনরায় সেখানে বিশ হাত খুঁড়িলে, জল মিলল না, আবার গেলে আর এক স্থানে। গুরুর পর গুরু, আর সাধনের পর সাধন যাহারা পরিবর্ত্তন করে, এইভাবে তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় অত্যধিক, কিন্তু জল পায় না তাহারা এক কণাও। কিন্তু আমাদের এই পুপুন্‌কীর কুয়ার মতন অনেক খুঁড়িয়াও যার জল মিলে না, অন্যত্র কূপ খুঁড়িবার সহস্র উপদেশ-দাতার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, এমন কি ''গোঁয়ার-গোবিন্দ'' আখ্যা পাইয়াও যাহারা জিদ্ ছাড়ে না, কঠিনতম প্রস্তর ভেদ করিয়া হইলেও এই রকম সুস্বাদু জল তাহারা পায়।

(২) তুমি কৃষক, উৎকৃষ্টভাবে জমি তৈয়ারীর পর একজনের কাছ হইতে ঢেঁড়সের বীজ আনিয়া বপন করিলে। কিন্তু বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই পুনরায় আর একজনের নিকট হইতে বীজ আনিয়া ক্ষেত্রময় অড়হর বুনিয়া দিলে। কিন্তু তাহারও গাছ গজাইবার সবুর সহিল না—পুনরায় আর একজনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া এক ধার হইতে সোনামুগের বীজ ছড়াইয়া গেলে। এদিকে কৃষির ঋতু চলিয়া গেল, মেঘ-বর্ষণের অভাব ঘটিল, অনুকূল আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইল।—এভাবে যাহারা আবাদ করে, সেই চাষাদের ভিক্ষা-পাত্র হস্তে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া মরিতে হয়।

(৩) সঙ্গীত-শিখিতে আসিয়া পাঁচদিন বেহালা বাজাইয়া ধরিলে সেতার, সাতদিন সেতার অভ্যাস করিয়াই ধরিলে স্বরদ, স্বরদে হাত বসিল না দেখিয়া দুই চারি দিন যাইতে না যাইতে ধরিলে সানাই, এক সপ্তাহকাল সানাই ফুঁকিয়া গলা-ব্যথা হইল, অমনি ধরিলে জল-তরঙ্গ, দু'দিন পর উহাতেও অরুচি ঘটিল, ধরিলে কণ্ঠ-সঙ্গীত। এইভাবে যাহারা সঙ্গীত শিখে, জন্মেও তাহারা কিছু শিখিতে পারে না। নিত্যনূতন সাধন-পরিবর্ত্তনকারীর এইরূপই অবস্থা।

আত্ম-প্রচার ও অসত্য-সমাবেশ

বাহিরে প্রবল-ধারায় বৃষ্টিপাত ঘটায় অদ্য বৈকালে আর কৃষি-কার্য্য করা সম্ভব হয় নাই। ঘরে বসিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি স্তূপীকৃত চিঠিপত্রের উত্তর দিলেন এবং তৎপরে কথা-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—আত্মপ্রচার সাধুত্বের এবং সত্যসঙ্কল্পের হানি ঘটায়। তোদের প্রতিষ্ঠান সবার চাইতে বড় বা তোদের গুরুর মত গুরু আর কেউ নেই, এসব কথা যদি তোরা কখনও বড় গলায় বল্‌তে যাস্ তাহ'লে জান্‌বি, তোদের মধ্যে বুজ্‌রুকি ঢুকেছে। সত্য পথই যদি পেয়ে থাকিস্ তাহ'লে জান্‌বি, তোদের জীবনের দীপ্তি দেখেই সহস্র শুদ্ধাত্মা নরনারী তোদের আদর্শের পায়ে আত্মবলি দেবার জন্য ছুটে আস্‌বে। কোনও প্রচার-চেষ্টার প্রয়োজনই থাক্‌বে না একবিন্দু। জগতের সকলকে একই গুরুর চেলা বা একই আদর্শের ভক্ত করার জন্যে যে চেষ্টা, জান্‌বি, সেই চেষ্টাটা কখনো দীর্ঘকাল ধ'রে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাতে অল্প একটু সত্যের সঙ্গে সহস্র গুণ অসত্যের অজানিত সমাবেশ ঘটে যায়।

(৪) আম-বাগানে ঢুকিয়াছ, আম খাইবে। একটা গাছে দু'হাত না উঠিয়াই ভাবিলে অপর গাছের আম বেশী মিষ্টি। সেই গাছটার আবার তিন হাত না-উঠিতেই ভাবিলে তৃতীয় গাছটার আম বেশী বড়। আম বাগানে ঢুকিয়া মুহুর্মুহু এইরূপ চিত্ত-পরিবর্ত্তন যাহার হয়, অমৃতরস আস্বাদনের অনেক পূর্ব্বেই সে ডাল ভাঙ্গিয়া মরে।

(৫) কলিকাতা হইতে পুপুন্‌কী আসিবার জন্য পুরুলিয়া পেসেঞ্জারে চাপিয়া খড়্গপুর আসিয়াই যে ব্যক্তি ভাবে যে, বি. এন. আর গাড়ীগুলি নিতান্ত সেকেলে, অতএব ই. আই. আর এর গাড়ীতে যাইব, এবং এইরূপ মনে করিয়া ধানবাদ দিয়া আসিবার জন্য গয়া পেসেঞ্জারে চাপে, তার মুহুর্মুহু মত-পরিবর্ত্তনের দরুণ আজ পাটনা, কাল ভাগলপুর, পরশ্ব দ্বারভাঙ্গা যাওয়াই হয়, পুপুন্‌কী পৌছান হয় না।

প্রকৃত মহাত্মা ও আত্মপ্রচার

আত্মপ্রচারে প্রকৃত মহাত্মাদের কিরূপ অনাস্থা, তাহা বুঝাইতে গিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রশংসা ক'রে একজন লোক গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন তিনি এসে ব্রহ্মচারীর আশ্রমে হাজির হ'লেন। ব্রহ্মচারী তাঁকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বল্লেন,—"বেটা হতভাগা, আমি যে মহাপুরুষ, একথা তুই জানলি কেমন ক'রে রে? ফের যদি আমাকে এমন ক'রে প্রচার করিস্, তা' হ'লে তোর সর্ব্বনাশ ক'রে দেব।" এক সময়ে নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একখানা জীবনী প্রণয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথা শুনে গিরিশবাবুকে ধমকে ব'লেছিলেন,—"দেখো জি, সি, ঠাকুরের জীবনী লিখ্‌তে গিয়ে যদি আমার কথা কিছু লেখ, তবে, তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেলব।"

লোকসংগ্রহের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিতে লাগিলেন,—ফুল যখন ফোটে, সৌরভ আপনি বেরোয়, মধু আপনি সঞ্চিত হয়, ভ্রমরেরা সব আপনি ছুটে আসে। এজন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয় না, দালাল রেখে বাড়ী বাড়ী খবর পৌছাতে হয় না, আসুন, "আসুন, মহাপুরুষ দেখে যান,—জীবন যৌবন ধন্য ক'রুন, —পেয়ে রতন হারাবেন না," —ব'লে রাস্তার লোক ধ'রে ধ'রে আশ্রমে নিয়ে আসতে হয় না। রাস্তার লোককে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দে। আপনজনেরা প্রাণের আকর্ষণে আপনি আসবে। প্রাণময় জগৎ,—একজনের প্রাণ যখন জাগে, তখন সকলের প্রাণ অজ্ঞাতসারে সেইদিকে আকৃষ্ট হয়। লোক-সংগ্রহই যদি কত্তে হয়, জান্‌বি, সত্যে অবিচলিত নিষ্ঠার চাইতে এর অপর কোনও শ্রেষ্ঠ উপায় নেই। টাকা দিয়ে খবরের কাগজ হাত কত্তে পার্লেই দেশের লোককে হাত করা যায় না। জগতের হিতৈষণা তোদের যত অকপট হবে, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড তত তোদের কর-মুষ্টির ভিতরে আসবে।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
২১শে আষাঢ়, ১৩৩৫

ভাঙ্গা ও গড়া

কৃষি-কর্ম্মের সামান্য অবসরে অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি অনেকগুলি পত্রের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে একখানাতে লিখিলেন,—"এখন প্রাণপাত শ্রম স্বীকার করিয়া, অখাদ্যে কুখাদ্যে জীবন ধারণ করিয়া যে শুভ প্রতিষ্ঠান গড়িতেছি, সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত যদি ইহার কখনও বিরোধ ঘটে, তবে আমিই স্বহস্তে ইহাকে চূর্ণীকৃত করিব। যাহা সযত্নে গড়িতেছি, তাহা নিমেষমধ্যে ভাঙ্গিবার ক্ষমতা আমি রাখি।"

জাতি-গঠনের ধারা

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বড় বড় শোভাযাত্রা বা সংবাদ-পত্রের মোটা মোটা অক্ষরের বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়া কোনও জাতি আত্মগঠন করে নাই। জাতি গঠনের ধারা অধিকাংশ স্থলেই অন্তঃসলিলা। মূর্খ লোকেই বাহ্যাড়ম্বরকে শক্তি-সঞ্চয় বলিয়া ভ্রম করে এবং যথার্থ শক্তি-সঞ্চয়ের পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। যত নীরবে এবং যত

গোপনে জাতি নিজের পূর্ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, জগতের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে তার পরাজয় সম্ভাবনা তত কমিয়া যায়।"

গায়ত্রী ও ব্রহ্মচর্য্য

নোয়াখালি জেলা-নিবাসী জনৈক ব্রহ্মচর্য্যানুরাগী যুবকের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হও না তুমি যে-কোনও বংশজাত, গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিবার তোমার নিশ্চিতই অধিকার আছে, যেহেতু তুমি তোমার মধ্যে ব্রহ্মশক্তির স্ফূরণ দেখিতে চাহ। ব্রহ্মচারী-মাত্রেরই পক্ষে গায়ত্রী কল্পলতাস্বরূপিণী এবং স্মৃতি বা লোকাচার, যিনিই বিরুদ্ধতা করুন, গায়ত্রীর পুণ্যময় মন্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য-প্রার্থী মাত্রেরই পূর্ণ অধিকার। এই বিষয়ে মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা দ্বিধা রাখিও না। গায়ত্রী ব্রাহ্মণের সাধন এবং ব্রহ্মচারীই যথার্থ ব্রাহ্মণ। সিদ্ধ-তপস্বীর ঘরে যে সব লম্পট ও অকাল-কুষ্মাণ্ডের দল জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া দেশের সতী-কুল-লক্ষ্মীদের আতঙ্ক ও শঙ্কা বৃদ্ধি করিতেছে, জীবনের স্রোতকে অসংযমের পঙ্কিলতা দিয়া আবিল করিতেছে, সেই সকল যজ্ঞসূত্রধারী পশুগুলিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম করিও না। জানিয়া রাখ, বীর্য্যবানই ব্রাহ্মণ, বীর্য্যহীন নহে। তোমাকে বীর্য্যবান্ হইতে হইবে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইবে, সুতরাং গায়ত্রী তোমার নিত্য-সাধনের পরম-ধন হউন।"

মহিলা-প্রতিষ্ঠান গঠন

মেদিনীপুর জেলা-নিবাসী অপর একজন জিজ্ঞাসুর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নারীজাতির নবজীবনোন্মেষ-সাধনের জন্য যে প্রতিষ্ঠান-সমূহ আবশ্যক, তাহা গঠন করিবার জন্য আমার নিজের পক্ষে

কোনও প্রকার কৃত্রিম প্রয়াসের আবশ্যকতা আমি দেখিতেছি না। যে-সব মায়েদের মধ্যে নিজ জাতির সেবা-সাধনের যোগ্যতা স্বভাবতঃই অল্প বা বিস্তর প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহারা নিজেরাই অন্তরের প্রেরণার দায় অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া কর্ম্মিণীরূপে চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া আসিবেন এবং তাঁহাদের ঐকান্তিকতার আশ্চর্য্য শক্তিতে এই সন্তানের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সূত্র সৃষ্টি করিয়া লইবেন। আমি তাঁহাদিগকে দিয়া কোনও কাজ করাইবার দায়িত্ব স্বীকার করি না, পরন্তু সময় আসিলে তাঁহারাই জোর করিয়া আমাকে তাঁহাদের ত্রিলোক-বিস্ময়কর কর্ম্মকৌশলের সাক্ষী করিয়া লইবেন।—পুরুষ-জাতির চেষ্টায় গড়া মহিলা-প্রতিষ্ঠান নারী-মর্ম্মের প্রতিনিধি হইতে পারে না, পরন্তু তোমার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভা যখন প্রতিষ্ঠানকে গড়িবে, তখন তাহা নিত্যকালের জন্য নারীজাতির মহিমাকেই দেদীপ্যমান করিবে।"

গৃহীর ভোগ

ময়মনসিংহ জেলা-নিবাসী জনৈক গৃহী-ভক্তের নিকটে লিখিলেন—

"প্রকৃত গৃহী ভোগ-ব্যাপারকেও সাধন-বর্জ্জিত রাখেন না। বৃথা ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা তিনি যত্নতঃ পরিহার করেন কিন্তু সম্ভোগ মাত্রকেই সাধনের সহিত যুক্ত রাখেন। এই যোগ স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই অনুশীলনের বিষয়ীভূত হয়। দেহ যখন দেহের সহিত যুক্ত হইতেছে জীবের ধর্ম্মে বা সংসারাশ্রমের প্রয়োজনের দাবী পূরণের জন্য, আত্মা তখন আত্মায় তথা পরমাত্মায় যুক্ত হইতেছে শিবের ধর্ম্মে বা অনাদি অনন্ত, অদ্বয়, অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় ও

সর্ব্বতোমুখ মিলনোৎসবের প্রেরণায়। গৃহী-জীবনের এই দ্বিমুখ অভিযান সত্যই এক বিচিত্র ব্যাপার, যাহা যোগীর পক্ষেই সম্ভবে, ভোগীর পক্ষে নহে।"

গৃহীর ইন্দ্রিয়-জয়

ময়মনসিংহ জেলা-নিবাসী অপর একজন বিবাহিত ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গৃহীর ইন্দ্রিয়-জয় স্ত্রী-বর্জ্জন দ্বারা বা স্বামীকে বয়কট করিয়া নয়। পরস্পরের শ্বাসে-প্রশ্বাসে মিলাইয়া সাধন কর, একের অপূর্ণতা অপরের পূর্ণতা দ্বারা দূরীভূত হইবে, নক্র-কুম্ভীর সমাকুল সমুদ্রেও অনায়াসে সাঁতার কাটিয়া পার হইবে। যে স্থলে উভয়ের চিত্তই সমান চঞ্চল, সমান অসংযত, সেখানেও ইহার ভিতর দিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু প্রশমিত হইবে।"

বিবাহ কথার অর্থ

ঢাকা জেলা-নিবাসী অপর একজন গৃহী ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্ত্রীপুংসয়োরাত্মশক্ত্যোরেকত্বসম্পাদনং বিবাহঃ। অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের আত্মশক্তির একত্ব সম্পাদন করার নাম বিবাহ। নিকৃষ্ট লালসার বশবর্ত্তী হইয়া পুরোহিতের সম্মুখে মন্ত্র পড়িয়া মিলিত হইবার নাম বিবাহ নহে, হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্নি সাক্ষী করিয়া সমাজের নিকট হইতে যৌন-অধিকার প্রাপ্তির নামও বিবাহ নহে। পরন্তু স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম-শক্তি অহর্নিশ বিরাজ করিতেছে, সাধনের বলে, তপস্যার বলে, একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের বলে তাহাকে একীভূত

করিয়া সেই সম্মিলিত শক্তির সহায়তায় দেশের, দশের ও জগতের হিত-সাধন করার নাম বিবাহ। পুরুষের সুমতি দ্বারা স্ত্রীর সুমতিকে এবং স্ত্রীর সদ্‌গুণের দ্বারা পুরুষের সদ্‌গুণকে বিকশিত করিয়া লইয়া তাহাই ব্রহ্ম-সাধনে প্রয়োগ করিবার নাম বিবাহ। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে মোহময় আকর্ষণ যৌবনের স্ফূরণের সঙ্গে সঙ্গে অশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয়, তাহার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া সমাজের সম্মিলিত অভিমতে তাম্র-তুলসী স্পর্শ করিয়া ভোগ্য-ভোগ্যা ভাবে পরস্পর মিলিত হইবার নাম বিবাহ নহে। পরন্তু অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-লালসাকে সাধনের দ্বারা পরিশোধিত করিয়া, চঞ্চল ভোগ-লিপ্সাকে নিত্যানিত্য-বিবেকের দ্বারা নির্ম্মল করিয়া একজনের ভিতরে যে-সকল আত্মিক অপূর্ণতা রহিয়াছে অপর জনের সাত্বিক সহায়তায় তাহা দূরীভূত করিবারই নাম বিবাহ। কাম-লালসার চরিতার্থতাই বিবাহের উদ্দেশ্য নহে, অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা লাভের যে তাড়না প্রাণকে নিয়ত চঞ্চল করে, তাহারই দাবী মিটাইবার আধ্যাত্মিক প্রযত্নের নাম বিবাহ। মোট কথা, বাজারের গণিকার সহিত লম্পট ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, স্ত্রীর সহিত স্বামীর সম্বন্ধ তাহা নহে। সুখ-লোভই বিবাহের প্রেরণা নয়, ব্রহ্ম-দর্শনই বিবাহের প্রেরণা, ভগবান্‌কে লাভ করাই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য।"

২১শে আষাঢ়, ১৩৩৫
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুপুন্‌কীর কৃচ্ছ্র

মানুষকে যত প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, পুপুনকী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার কর্ম্মীদিগকে তাহাই সহিতে হইতেছে।

তাঁহাদিগকে শুধু অনশন সহিতে হয় না, অনশনের সঙ্গে সঙ্গে অতিশ্রম করিতে হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৈশ-বর্ষণে সিক্ত-কলেবর হইয়া রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হয় অথবা ঐ বৃষ্টি-সিক্ত ছিন্ন শয্যাতেই প্রতি মুহূর্ত্তে খরিশ সাপের আক্রমণের সম্ভাবনা নিশ্চিত জানিয়া অতিক্লান্তির অপরিহার্য্য ফল স্বরূপ নিদ্রাসম্ভোগ করিতে হয়।

পুপুন্‌কীর আশ্রমবাসীর জীবন এই প্রকার।

ভিক্ষাকেই অগতির গতি বলিয়া যে দেশের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বরমাল্য দিয়া অর্চ্চনা করিতেছে, সেই দেশে যে শ্রীশ্রীবাবামণি ভিক্ষাবৃত্তি বর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত মূল্য তাঁহাকে এবং তাঁহার কর্ম্মিবৃন্দকে দিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষায় কখনও তাঁহাদিগকে ঢেঁড়শ পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইয়াছে, কখনও বা বিষাক্ত বনলতা সেবনে আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা হইতে শুধু ভগবৎ-কৃপায় বাঁচিতে হইয়াছে। কোনও দিন কাঁচা ঝিঙ্গা চিবাইয়া, কোনও দিন কচি ভুট্টার পাতা খাইয়া, কোনও দিন বা বহুদিন যাবৎ বীজার্থে সঞ্চিত ন্যাপ্‌থালিনের তীব্রগন্ধে উৎকটতা-প্রাপ্ত কুমড়ার বীজ সেবন করিয়া * পঞ্চদেবতার প্রীতিসাধন করিতে হইয়াছে।

গ্রাম্য দুষ্টের দৌরাত্ম্য

তার উপরে আবার গ্রামবাসিগণের অত্যাচার। শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েক দিন স্বহস্তে হলচালনা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর প্রচারকার্য্য চলিল। একদিন একজন হিতৈষী গ্রামীণ

* এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে করিতে কৌতুকভরে শ্রীশ্রীবাবামণি একদিন বলিয়াছিলেন,—"We have out Gandhi-ed-Gandhiji"

গোপনে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি আশ্রমের কুটিরখানা জ্বালাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ-দাতার হস্তে দিয়াসলাই দিয়া বলিলেন,—তাহাদিগকে এই দিয়াশলাইটী দিও এবং বলিও যেন তাঁহারা ঘর পোড়াইয়া দিতে আর একটী দিনও বিলম্ব না করেন।

সংবাদদাতা ষড়যন্ত্রকারীদিগের নিকট এই সংবাদ পৌছাইলেন। বলা বাহুল্য, গৃহ দগ্ধ করিতে আর কেহ আসিলেন না।

স্বহস্তে হলচালনা শ্রীশ্রীবাবামণি বন্ধ করিলেন না। একদিন শুনা গেল, চতুর্দ্দিকের গ্রামবাসীরা আশ্রমকে বয়কট করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা কেহ আশ্রমে আর ঔষধ নিতে আসিবেন না। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গ্রামবাসীরা ভালই করিয়াছে। এখন হইতে আমি প্রত্যহ গ্রামে গ্রামে গিয়া ঘরে ঘরে ঔষধ বিতরণ করিব।

কার্য্যতঃ শ্রীশ্রীবাবামণি তাহা করিতে লাগিলেন।

এইখানে আশ্রম হওয়াতে মিশ্র মহাশয়দের বন হইতে কাঠ চুরি করিবার অসুবিধা হওয়াতে অজ্ঞাত-পরিচয় প্রচ্ছন্নচারী ভদ্রলোকদের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। সাধুকে তাড়াইবার জন্য তাহারা রজনী-যোগে প্রচুর গরু-মহিষ আনিয়া সমস্ত আবাদ পদ-বিমর্দ্দিত করিয়া দিতে লাগিল। † পরিশেষে ব্যাঘ্রভীতি

† ১৩৩৬ সালের ভাদ্রমাসে এক রাত্রিতে আশ্রম হইতে চারিশত ত্রিশটি মিষ্টি কুমড়া এবং শতাধিক শশা কোনও এক বা একাধিক ভদ্রলোক না বলিয়া লইয়া গেলেন, শতাধিক কুমড়া ফল দ্বাবিংশটী শশা গাছ ও বহুসংখ্যক পেঁপে গাছের মূল টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রাখিয়া গেলেন, অসংখ্য ফলবান্ লঙ্কার গাছ সমূলে উৎপাটিত করিয়া গেলেন।

উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। জনরব হইল, দিন কতক আগে পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে সত্যই নাকি একটী বলবান্ গুরুকে বাঘে খাইয়াছিল এবং এতদঞ্চলে সত্য সত্যই নাকি বাঘের উৎপাত মাঝে মাঝে হইত। এই তথাকথিত সত্যটুকুর আবরণে দৌরাত্ম্যপ্রয়াসী গ্রামবাসীগণ বনের মধ্যে জড় হইয়া প্রায়ই নানা প্রকার চীৎকার প্রভৃতির দ্বারা ব্যাঘ্রের আগমন-বার্ত্তা জানাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাঘ যদি আসিয়াছই বাবাধন, তাহা হইলে আমার এই কুটীরে আসিয়া খরিশ (গোখুরা) সাপের সঙ্গে একবার দেখাটাই করিয়া যাও! শ্রীশ্রীবাবামণি হুকুম দিলেন, —'ঘরের ভাঙ্গা দুয়ার আর রুদ্ধ করিতে হইবে না; দরজা খুলিয়া রাখিয়া সবাই ঘুমাও।' আদেশ প্রতিপালিত হইল, কিন্তু ব্যাঘ্র আর আসিল না।

কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইল, ব্যাঘ্র-সম্বন্ধীয় চীৎকারাদি শুধু দুষ্টের দুষ্টামি। তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাড়াব বল্লেই পালাচ্ছি কি না! যেদিন যাবার, স্বেচ্ছায় যাব, হাজার লোক যদি পায়ে প'ড়ে কাঁদে, তবু দাঁড়াব না, কিন্তু ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

জাতীয় উন্নতির শত্রু

এই বৎসর গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতেই কঠোর-কর্ম্মা শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার অক্লান্ত-কর্ম্মা সহকর্ম্মীদের লইয়া অবিশ্রান্ত যত্নে বাঁধ (পুকুর) খনন কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছিলেন।

একদিন দেখা গেল, ছোটনাগপুরের গ্রীষ্মকালীন অসহ্য রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া বাঁধের যে পাড় তোলা হইয়াছিল, বহু গো-মহিষের

খুরাঘাতে তাহা যা-দশাপন্ন হইয়াছে। আশ্রমের সকল কর্ম্মীই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— বাপু হে, অত অল্পেতেই যদি হতাশ হইবে, তাহা হইলে বাপ-মাকে কাঁদাইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলে কেন? শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—ভারতের মঙ্গল-পথের যত কণ্টক আছে, তার মধ্যে সব চাইতে ভয়ঙ্কর দুইটার নাম হইতেছে আলস্য আর অসহিষ্ণুতা। বসিয়া থাকাও পাপ, ব্যস্ত হওয়াও পাপ।

চিকশিয়া গ্রামে রাস্তা-নির্ম্মাণের সূত্রপাত

সম্প্রতি আবার পর্য্যায়ক্রমে গ্রামে গ্রামে কথকতা আরম্ভ হইয়াছে। সারাদিন মাঠে কোদাল চালাইয়া সূর্য্যাস্তের পরে আধপেটা খাইয়া ক্লান্ত অবসন্ন শরীরের ভার কোনও রূপে বহন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী সহকর্ম্মী সহ দুই মাইল পথ দুই তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া আসিয়া হয়ত কোনও গ্রামে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন, গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্তে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কথকতা করিতে আসিবেন বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ব্বেই গ্রামে সংবাদ-প্রেরণ করিয়াছিলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য গ্রাম্য নেতার উপরে ভারও দিয়াছিলেন, এই বিষয়ে প্রচুর বাচালতা-পূর্ব্বক অনেক পরামর্শও গ্রাম্য নেতারা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল, সব ফক্কীকার। একদিন ত' চিকশিয়া গ্রামে পৌছিতে পথিমধ্যে উচ্চনীচ-প্রস্তর-সঙ্কুল এই সঙ্কটময় পথে পদস্খলিত হইয়া গুরুতর বিপদ ঘটিবারই সম্ভাবনা হইয়াছিল। সেই দিনই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"এই

পথটায় আমি ত' চলি সপ্তাহে দুই দিন, কিন্তু গ্রামবাসীরা চলে বৎসরের মধ্যে তিনশত পঁয়ষট্টি দিন। এই রাস্তার পাথরগুলিকে দূর করিতে হইবে।''

চিকশিয়া গ্রামে পৌছিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দেখিলেন, গ্রাম নিঃস্তব্ধ। গ্রামের নেতা শ্রীযুক্ত হরদয়াল শর্ম্মাকে অনেক ডাকাডাকির পর তোলা গেল। হাঁকাহাঁকির পর চক্ষু মুছিতে মুছিতে দুই একজন আসিয়া বসিল এবং বলিল, কথকতা আরম্ভ করুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ আর মহাভারতের গল্প নয়। আজ তোমাদের পাথুরে রাস্তার গল্প। এই পাথর তোমাদিগকে ভাঙ্গিতে হইবে।

গ্রামবাসীরা বলিলেন,—এযে ভয়ঙ্কর শক্ত পাথর। বাপ-দাদা চৌদ্দ-পুরুষের আমলের পাথর। এ পাথর কখনো ভাঙ্গিবে না।

একজন বলিলেন,—বছর পনের আগে একবার আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু শাবল, ছেনী প্রভৃতির কিছু দিয়াই কিছু করিতে পারি নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এবার পারিবে।

আর একজন বলিলেন,—বারুদ না হইলে এই পাথর ফাটিবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার বাক্যই বারুদ। যাইবে তোমরা আমার সঙ্গে ?

হরদয়াল শর্ম্মা বলিলেন,—আপনার দৈব-বল আছে। আমাদের নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাহু-বলই দৈব বল। তোমরা সব প্রস্তুত থাকিও। আমি আগামী চৈত্রে আসিয়া পাথরভাঙ্গা * আরম্ভ করিব।

তখন গ্রামবাসীরা উল্লাস-সহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, এই রাস্তায় আজ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কেহ বোঝাই গরুর গাড়ী চলিতে দেখে নাই। অথচ পাঁচ ছয় খানা গ্রামে যাইবার আসিবার ইহাই একমাত্র পথ! মাল-বোঝাই গাড়ী আনিয়া পাথরের নিকটে খালি করিয়া মাথায় বহিয়া প্রায় দুই হাজার হাত দূরে নিয়া মাল রাখিতে হয় এবং কতক্ষণে সাত আট খানা গাড়ী একত্র হইবে, তজ্জন্য তীর্থকাকের মত অপেক্ষা করিতে হয়। অনেকগুলি গাড়ী একত্র হইলে সব গাড়ীর গাড়োয়ান মিলিয়া এক একখানা করিয়া গাড়ী ধরিয়া অতি কষ্টে পার করিয়া তবে পুনরায় গাড়ীতে মাল বোঝাই দেয়।

চিত্ত-সংযম রক্ষার উপায়

অফুরন্ত কৃষি-কর্ম্মের মধ্যে যে সামান্য অবসর আজ মিলিয়াছিল, তাহার শনিগ্রহ হইয়াছিল স্তূপীকৃত চিঠি। (কয়েকখানা চিঠির অংশ-বিশেষ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।) এই কয়দিন অবিশ্রাম বৃষ্টি চলিতেছে বলিয়া শুধু কোদালের কষ্টসাধ্য কাজই চলিতেছে। কিন্তু 'রুটীন' তাহা শুনিবে কেন ? সৈনিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায়ই টেনিসনের সেই কবিতাটুকু বলেন,—

"Their's not to make reply,
Their's not to reason why,
Their's but to do and die,—"

* পরে সত্য সত্যই শ্রীশ্রীবাবামণি এই পাথরভাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে এই রাস্তায় স্বচ্ছন্দে গাড়ী যাতায়াত করিতেছে।

আজ কালাপাথরের পালা। কালাপাথর যাইতে যাইতে একটী জিজ্ঞাসু গ্রামীণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— মনকে যদি অপবিত্র স্থানে যেতে দাও, তাহ'লেই সে অপবিত্র হবে। তাই সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টা কর্ব্বে, যেন মন কখনো অধোগামী না হয়। মনকে সর্ব্বদা দেহের উর্দ্ধদেশে রাখবে নাভির নিম্নে কখনো নামতেই দেবে না। ভ্রূ-মধ্যে মনঃস্থির কর্ব্বার অভ্যাস কর্ল্লে এই চেষ্টাটী সহজে সফল হয়। নিজের কি অপরের অপবিত্র অঙ্গে মনকে যেতে দিয়েছ কি মরেছ। তখনি মনের ভিতরে যত পাপ-ভাব ও দেহের ভিতরে যত খারাপ উত্তেজনা জেগে উঠবে। সুতরাং সাবধান থেকো!

বৈধ ও অবৈধ ভিক্ষা

কালাপাথরে আজ রাত্রিতে যে সকল ধর্ম্মালাপ হইল, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রথমে বলিলেন,—কর্ম্মীর দৃষ্টিতে ভিক্ষামাত্রই অবৈধ। কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য *, গুরুসেবার জন্য †, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদানের জন্য ‡ ভিক্ষা করা দোষের নয়। কিন্তু যতক্ষণ নিজস্ব বল্‌তে একটী কপর্দ্দকও আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সকল কারণেও ভিক্ষা করা চল্‌বে না। নিজের পরিপোষণ ও পরিতোষণের জন্য কোনও সময়েই ভিক্ষা করা চল্‌বে না। তবে যদি কেহ অহর্নিশ নিজেকে ভগবৎ-সাধনে সমর্পণ করেন, তাহ'লে তাঁর পক্ষে শুধু প্রাণ-ধারণের উপযোগী আহার্য্য ভিক্ষা চল্‌তে পারে। অবশ্য, এইটুকু সংগ্রহ যদি তাকে অধিক সময়ক্ষেপ কত্তে হয়, তবে প্রাণ-ধারণের জন্যও ভিক্ষা অবৈধ। আবার

---

* যথা, সঙ্গীতাচার্য্য আলাউদ্দিন, † যথা, বাঘাউড়ার ছালাবুড়ী, ‡ যথা, —শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি।

একথাও নিশ্চিত জান্‌বে, ভগবৎ-সাধনে যে অহর্নিশ প্রাণ ঢেলে দেয়, তার ভার ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন। এজন্য ভিক্ষা-চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

ভিক্ষার নিদান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মতে, মানুষ যদি মানুষ হয়, ভিক্ষা তাকে কোনো অবস্থাতেই কত্তে হয় না। মানুষের আলস্যই তাকে ভিক্ষুক ক'রেছে। মজ্জাগত আলস্যের বিষময় ক্রিয়াতেই আজ ভারতের এই দুর্দ্দিন। ঘরে ঘরে তোমরা বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখে দাও,—"আলস্যই তোমাকে ভিক্ষুক করিবে, পরপদলেহী করিবে, পুরুষত্বহীন অমানুষ করিবে।" হৃদয়-ফলকে লিখে রাখ—"আলস্য অপমৃত্যু অপেক্ষাও ভয়াবহ।"

গুরুর অনুকরণ

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক শিষ্য গুরুর অনুকরণ ক'রে অসত্যাচরণ করে। চিরকালের সংযমী গুরু একদিন হয়ত অসংযমী হ'য়ে পড়েছিলেন, সেই নজিরে নিজেও অসংযত হয়। চিরকালের ত্যাগী গুরু একদিন হয়ত ভোগসুখাসক্ত হ'য়েছিলেন, তারই দোহাই দিয়ে নিজের ভোগের পথ প্রশস্ত ক'রে নিতে চেষ্টা করে। এটা কিন্তু যথার্থ শিষ্যের লক্ষণ নয়। প্রকৃত শিষ্য গুরুর জীবনের অনিচ্ছাকৃত বা ভ্রম-প্রমাদ-প্রেরিত পদস্খলনগুলিকে নিজের পথ-প্রদর্শন স্তম্ভ ব'লে মনে করেন না,—ঐগুলিকে তিনি বর্জ্জন করেন। শিষ্যকে হ'তে হবে গুরুর চাইতেও অধিকতর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অধিকতর পবিত্রচেতা,

অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবেই না শিষ্য নাম সার্থক হ'ল। প্রত্যেক শিষ্যকে এই সঙ্কল্প কত্তে হবে যে, গুরুর জীবনের অনুকরণ করাই তার চরম কর্ত্তব্য নয়, গুরুর পবিত্র জীবনকে ভিত্তি ক'রে নিজের জীবনটাকে আরও উন্নত, আরও বিশাল ক'রে গ'ড়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। শিষ্য গুরুর উপরে কেন নির্ভর কর্ব্বে ? গুরুর চাইতে মনুষ্যত্বে ও মহত্ত্বে ছোট থাক্‌বার জন্যে কি ? না, তা নয়। গুরুর মহত্ত্বের সাহায্য নিয়ে তাকে মহত্তর হ'তে হবে, তাই তার গুরু-স্বীকৃতি। নতুবা গুরুকরণের কোনও যথার্থ উপযোগিতাই থাক্‌তে পারে না। পুত্রকে হ'তে হবে পিতার চাইতে মহান, তবেই না জন্মগ্রহণের সার্থকতা! পিতার অঙ্গে যদি শ্বেতী রোগের দাগ থাকে, পুত্রকে কি তা' হ'লে সেই কদর্য্য রোগটাকে নিজ দেহেও শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হ'তে দিতে হবে ? নিশ্চয়ই পুত্রকে চেষ্টা কত্তে হবে, যেন পিতার দোষ থেকে, পিতার ব্যাধি থেকে, পিতার গ্লানি থেকে পুত্র সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হ'তে পারে। এইখানেই পুত্রের পুত্রত্ব এবং যথার্থ পুরুষকার।

নারীর পবিত্রতার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ

অপর প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোকদের জীবনেই সর্ব্বাগ্রে পবিত্রতার জ্যোতিকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। এঁদের দেহমন যখন পবিত্রতায় অভিসিঞ্চিত হবে, তখন কোনো অপবিত্র চক্ষু আর এঁদের পানে তাকাতে সাহস পাবে না, অপবিত্র জিহ্বা এঁদের বিষয়ে চর্চ্চা কত্তে গিয়ে বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট হ'য়ে পড়্‌বে। এই জন্যই আমি স্ত্রীজাতির সুশিক্ষার এমন পক্ষপাতী। পবিত্র-স্বভাবা স্ত্রীর সংসর্গে প'ড়ে ভবিষ্যতের স্বামীরা সব পবিত্র হবেন,

পুণ্যচরিতা মায়েদের গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে ভবিষ্যতের পুত্র-কন্যারা সব স্বভাব-ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে অবতীর্ণ হবেন। প্রলোভনের মায়াজাল সেই সব পুত্র-কন্যাদের বাঁধতে পারবে না, অবৈধ লালসার মরু-তৃষ্ণিকা তাদের অপথে বিপথে ঘুরিয়ে মার্‌তে সমর্থ হবে না।

পুত্রোৎপাদনের উদ্দেশ্য

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,----অনেকে বলেন, পুত্রোৎপাদনই বিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধু পুত্রোৎপাদনই যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হবে, তবে বিবাহ-সংস্কারের আর কোন্ আবশ্যকতা আছে ? বেশ্যার গর্ভেও কি সন্তান জন্মান যায় না? কিন্তু বারাঙ্গনার গর্ভে পুত্র জন্মালে পুত্রোৎপাদনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। তারই জন্য বিবাহ-সংস্কারের আবশ্যকতা। পুত্রোৎপাদনের উদ্দেশ্য কি শুধু পুত্রোৎপাদনই? যেমন-তেমন একটা ছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ কত্তে কত্তে ভূমিষ্ঠ হ'লেই কি পুত্রোৎপাদনের উদ্দেশ্য সার্থক হয় ? একপাল শূকর বা ছাগলের জন্ম দিতে পার্‌লেই কি পুত্রোৎপাদনের প্রকৃত দাবী মিটে ? না, তা' কখনো নয়। পুত্রোৎপাদনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বংশের উৎকর্ষ-সমূহকে বিস্তারিত করা এবং বংশের অপকর্ষ-সমূহকে নির্ম্মূল করা। পুত্রোৎপাদন একটা বিদ্যা, একটা বিজ্ঞান। বংশানুক্রমিক ভাবে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন ক'রেই ভারতবর্ষে এমন এক নবযুগ সমাগত হবে, যে দিন হাটে-মাঠে ভীষ্ম, অর্জ্জুন, রাম ও কৃষ্ণ প্রভৃতির সাথে সাক্ষাৎকার হবে। পুত্রোৎপাদন একটা সাধনা, সৎসঙ্কল্পের সাধনা, কায়মনোবাক্যে সত্য আদর্শের সাধনা।

ভারতীয় জীবনে সতীত্বের সমাদর কেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জন্যই ভারতীয় জীবনে সতীত্বের এত সম্মান, এত সমাদর, এত মূল্য। একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য না থাক্‌লে পুত্রোৎপাদনের এই বিজ্ঞানকে কেউ নিজ জীবনে সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারে না। একটী দুইটী বৎসরে সাধারণের জীবনে এই বিদ্যা সম্যক্ আয়ত্তে আসে না। সকল বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যাতেও পূর্ণসিদ্ধি দীর্ঘ-সাধনের ফলে আসে। যে সমাজে নারীর সতীত্বের প্রতি দৃষ্টির তীক্ষ্নতা কম, সেই সমাজে এই বিদ্যার অনুশীলন অসম্ভব ব'লেই ভারতীয় জীবনে সতীত্বকে সকল গুণের শ্রেষ্ঠ ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে।

পুত্রোৎপাদনের কৌশল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দম্পতীর সাধন-জীবনে ঐক্য-সংস্থাপনই পুত্রোৎপাদনের নিগূঢ় কৌশল। যে নারী স্বামিগতপ্রাণা, আর যে পুরুষ স্ত্রী ব্যতীত অপর নারীর প্রতি লালসাশূন্য, তাদেরই সাধন-জীবনে ঐক্য সংস্থাপিত হয় অতি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে। পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা-জনিত ইতর আকর্ষণ সহস্রবার চিত্ত-প্রবৃত্তিকে দূষিত কত্তে চাইলেও, একাসনে ব'সে শ্বাসে-শ্বাসে মিলিয়ে নামের সাধন কত্তে কত্তে তাঁদের ভিতরে অপার্থিব খাঁটী প্রেম জেগে যায় এবং দেহ-লালসার ঊর্দ্ধে অবস্থান ক'রেই তাঁরা সন্তান জনন কত্তে পারেন। ভারতের গৃহী যোগীরা বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেই এই মহাসত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ ক'রেছিলেন। আগে সন্তানের পিতা-মাতা পরস্পরের মধ্যে বিদেহী চৈতন্যকে জাগ্রত ক'রে তুলবে, একের সাথে অপরে আধ্যাত্মিক

একত্ব প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে, উভয়ের মধ্যে যত প্রকার দ্বিত্ববোধের অস্তিত্ব রয়েছে, সমযোগে সাধনের দ্বারা তার বিলোপ সাধন কর্ব্বে, একজনের দেহকে অপরে দেহ বা ভোগ-পদার্থ ব'লে ভাবতে ভুলে যাবে, তার পরে সন্তানার্থে সংযোগ। সে সংযোগে দেহ-বুদ্ধি থাক্‌বে না, দেহ-চেতনা, দেহ-সুখ-লালসা থাক্‌বে না, থাক্‌বে অধ্যাত্ম-বুদ্ধি, অধ্যাত্ম-চেতনা, অতীন্দ্রিয়-সুখের অনুভূতি আর অকৈতব ব্রহ্মদৃষ্টি। ভারতে এক বীর্য্য-বরীয়ান্ দুর্দ্ধর্ষ মহাজাতি সৃষ্টির অকাট্য কৌশল হ'ল এই।

সৌজাত্য-শিক্ষা ও গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য এই কৌশলও শিক্ষা-সাপেক্ষ। এর প্রাথমিক প্রয়োগগুলি উপযুক্ত গুরুর কাছে শিখে নিতে হয়, তবে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস সহজ হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমগুলি প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে গৃহ-গমনের প্রাক্কালে এই তত্ত্বের শিক্ষা দিয়ে দেবে, তারপর তরুণ গৃহী নিজের সহধর্ম্মিণীকে নিজেই সব শিখিয়ে নেবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার অনেক পূর্ব্ব থেকেই সাধনের কৌশলে দীক্ষিত না করে, তাহ'লে বিবাহিত জীবন নিতান্তই একটা খেলার জিনিষে পরিণত হ'তে চায়।

যথার্থ ও অযথার্থ বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিতে লাগিলেন,—সুখভোগ-লালসায় বিবাহ করা আর পশুজীবন যাপন করা সমান কথা। কেন না, তাতে জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ হয় না। জীবনের পূর্ণতালাভ এবং পূর্ব্ব-পুরুষদের ইষ্টসাধন বা গৌরব-বর্দ্ধন,—এই দুই কামনা

দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে যে বিবাহ করে, তার বিবাহই যথার্থ বিবাহ। অপরের বিবাহ শুধু লোকাচার বা অভিনয় মাত্র।

বিবাহিত জীবনকে সার্থক করিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—বিবাহিত জীবনকে সার্থক কত্তে হ'লে স্ত্রীপুরুষের সমযোগে যত্ন চাই, উভয়ের সমরুচি, সমবুদ্ধি, সমলক্ষ্য হওয়া চাই। যাদের রুচি, বুদ্ধি ও লক্ষ্যের সমতা নেই, তাদের মধ্যে বিবাহ অনর্থই সম্পাদন করে। এই অনর্থকে দূর করার জন্যে এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যক, যাতে উভয়ের মধ্যে সমতার প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে। উভয়কে সমান ভাবে সুশিক্ষিত হ'তে হবে, উভয়কে একই জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে, উভয়কে একই লক্ষ্যের প্রতি অনুরক্ত হ'তে হবে।

পদস্খলনেও সাধন ছাড়িও না

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে বসিয়া এই সব উপদেশ হইতেছিল। কার্য্য সমাপনান্তে শ্রীযুক্ত বিভূতি প্রশ্ন করিলেন, —স্বামি-স্ত্রীর একত্র সাধনের পথে যদি পদস্খলন হয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হয় ত' হোক্, তার জন্য আর চিন্তার কি? স্খলিতপদ হ'য়েও যদি তোমরা পুনরায় অগ্রসর হও, তবে একদিন না একদিন লক্ষ্যে পৌছুতে পারবেই। পিচ্ছিল পথে চল্‌তে গিয়ে প'ড়ে গিয়েছ ব'লে যদি নর্দ্দমায় জড়াজড়ি ক'রে পড়েই থাক, তবে ত' আর চলবে না। পড়েছ ত' পড়েছ,— পুনরায় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সমযত্নে অগ্রসর হও।

যতবার পড়িবে, ততবার উঠিবে

বিভূতি।—বারংবার যদি এরূপ পদস্খলন হয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথম সময়েই পদস্খলনটা বেশী বেশী হয়। যতই পথে চলবার অভ্যাস হবে, ততই পদস্খলনের সম্ভাবনা কমতে থাকবে। প্রথম পাদচারণার সময়ে সোজা পথেও, এমন কি দিবালোকেই, আছাড় খেতে হয়। কিন্তু দৃঢ়বীর্য্য-সহকারে চলতে চলতে শেষে এমন হবে যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্য্যোগের রাত্রেও পদস্খলন হবে না, দুর্গম পথেও পা পিছ্‌লে পড়্‌বে না। যতবার পড়্‌বে, ততবার উঠ্‌বে, এবং অবিচ্ছেদে পথ চল্‌তেই থাকবে। পথ চলার আর বিরাম দেবে না, কারণ, সাধন ছাড়্‌লেই অপমৃত্যু।

নরনারীর ঘনিষ্ঠ যোগ

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৃহি-জীবন নর-নারীর অতি ঘনিষ্ঠ-যোগের জীবন। সকল উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আস্তে আস্তে টেনে এনে মনকে বিবেক-প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার শক্তি যদি সাধনের না থাকত, তবে প্রকৃতই এ জীবন বড় দুঃখময়, বড় দৈন্যময়, বড় বিড়ম্বনাময় হ'ত। গৃহীর জীবনে দেহের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। প্রয়োজন হচ্ছে, তারই উপলক্ষ্যে আত্মাকে আত্মার ঘনিষ্ঠ করা।

Work and Plan
কর্ম্ম ও তাহার পদ্ধতি-চিন্তা

আশ্রমে কৃষিকার্য্যাদি আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবামণি একশত বিঘা বনভূমির সর্ব্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

পরীক্ষা করিয়া কোন্ স্থানে কিসের কৃষি হইবে, তাহার Plan (নক্সা) ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। একটা স্থান প্রায় তিন শত ঢেঁড়শ গাছের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, এবং স্থির হইয়াছিল যে, এই গাছগুলিকে এমনভাবে যত্ন করিতে হইবে, যেন বিশেষ সুপুষ্ট ফল তাহাতে পাওয়া যায়। কারণ, প্রতি গাছেই দুই তিনটী করিয়া ফল শুধু আগামী কৃষির জন্য বীজ-রক্ষার্থে রক্ষা করা হইবে। সুতরাং দুই হাত অন্তর অন্তর এক একটা গর্ত্ত করিয়া তাহাতে অর্দ্ধ ঝুড়ি হইতে এক ঝুড়ি পর্য্যন্ত গোবর মাটির সহিত মিশাইয়া রাখা হইয়াছিল। এ দেশের মাটিতে "হিউমাস্" এক প্রকার নাই বলিলেই হয়, কঙ্কর এবং বালুকারই প্রাচুর্য্য, এ জন্য এ দেশে কচু গাছ পর্য্যন্ত বিনা গোবরে জন্মে না। তাই, সমগ্র বন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গরু ও মহিষের বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া একটু অতিরিক্ত পরিমাণেই এক একটা গর্ত্তে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বৈশাখ মাসে দুইজন কর্ম্মীকে আশ্রমে রাখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে গমন করিলে পরে তাঁহার অনুপস্থিতিতে গ্রাম্য হিতৈষী ব্যক্তিরা আসিয়া ঐ ঢেঁড়শের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে কাক্রোলের মূল পুঁতিয়া দেন। কৃষির সামান্য অবসরে অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি পাত্না (বীজতলা) হইতে ঢেঁড়শ গাছের চারা তুলিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে লাগাইতেছেন। এই সময়ে দেখিলেন,—ঢেঁড়শের গর্ত্তে মাঝে মাঝে কাক্রোল লাগান রহিয়াছে। কাকরোলের গাছগুলিকে শ্রীশ্রীবাবামণি তুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, —"Work without plan is no work, and plan without work is no plan" (অর্থাৎ পরিকল্পনা-বর্জ্জিত কাজ কাজই নয়, কর্ম্ম-বর্জ্জিত পরিকল্পনা পরিকল্পনাই নয়।)

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন, শুধু চাষের কাজই নয়, আমাদের দেশের সকল কাজ এখন সুচিন্তিত plan (পরিকল্পনা) এর অভাবে নষ্ট হচ্ছে। plan (পরিকল্পনা) করা একটা হিসাবের কাজ। মাথায় খুব জোর বেশী না থাকলে কেউ কখনো দূরদর্শী হ'তে পারে না। অতএব perfect (নিখুঁত) একটা plan (পরিকল্পনা)ও ঠিক কর্তে পারে না। এই জন্যই বড় বড় কর্ম্মচেষ্টা হঠাৎ মাঠে মারা যাচ্ছে। —"A perfect plan is half the work done,"—(অর্থাৎ নিখুঁত পরিকল্পনা করেছ ত' অর্দ্ধেক কাজই হ'য়ে রইল।) তোমরা এই কথাটী মুখস্থ ক'রে রেখো।

প্রেরণা ও হিসাবী-বুদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য, একদল লোক বল্বেন, —'দেশের কাজে বাবা হিসাব-ফিসাব বুঝি না, বুঝি শুধু প্রেরণা। প্রাণ যখন জেগেছে, সে হিসাব ক'রে জাগে নি, ত্যাগের প্রেরণা এসেছে ব'লেই প্রাণ জেগেছে।' তাঁদের একথা সত্য। তুমি তোমার একক জীবনটাকে কি ভাবে বলি দেবে, সেই বিষয়ে হিসাব-নিকাশের আবশ্যকতা তোমার না-ই থাকুক, কিন্তু একটা সমগ্র জাতির আত্মোৎসর্গ বে-হিসাবীতে হ'তে পারে না। লক্ষ লক্ষ লোককে যেখানে জীবন দিতে হবে, সেখানে জমা-খরচের খাতায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেই হবে। বৃথা জীবন-দানের ফলে যদি জাতির শক্তি হ্রাস পায় ? একটা সমগ্র জাতিকে যখন জাগাতে চাচ্ছ, তখন তোমাকে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হ'তেই হবে, জাতির একটা শতাব্দীর অনাগত ইতিহাস অনুমান ক'রে অবধারণা কর্ব্বার শক্তি তোমাকে লাভ কত্তেই হবে। তোমার

প্রাণে শারদীয়া মহাষ্টমীতে মহামায়ার পূজা কর্ব্বার প্রেরণা জাগ্‌ল কিন্তু পূজারম্ভের অনেক পূর্ব্বেই কি তোমাকে ভাব্‌তে হবে না, কি কি আয়োজন আবশ্যক, কি কি উপচার সংগ্রহ প্রয়োজনীয়? যদি বাড়াবাড়ি না ক'রে শুধু ফুল-বেলপাতা দিয়েই মায়ের পুজো কর, তবু কি তোমাকে ঐ ফুল-বেলপাতা সংগ্রহের জন্যই আগে থেকেই মনে মনে বন্দোবস্ত কত্তে হবে না ? ইমারত যদি তুল্‌তে চাও, ভিত কাট্‌তে আরম্ভ করার ঢের আগেই মাটিকে কাদা ক'রে কাঁচা ইট গড়্‌তে হবে, কাঁচা ইটকে কয়লায় পুড়িয়ে পাকা ইট কত্তে হবে, কতকগুলো পাকা ইট ও ঝামাকে টুক্‌রো ক'রে সুরকি ও গুটি করতে হবে, প্রান্তরে প্রান্তরে অন্বেষণ ক'রে চূণা-পাথর সংগ্রহ কত্তে হবে, তাকে ভাটায় পুড়িয়ে চূণ কত্তে হবে। দালান তৈরী আরম্ভ হওয়ার ঢের আগেই চৌকাঠ, দুয়ার, জানালা প্রভৃতি কাঠের মিস্ত্রী দ্বারা তৈরী করিয়ে রাখতে হয়। নইলে ইমারত গড়া হয় না। সামান্য একটা একতালা দালান তুলতেই আগে থেকে কত আয়োজন কত্তে হয়, আগে থেকে তার হিসাব খতিয়ে দেখতে হয়। আর, একটা দেশের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ত' তার চেয়ে ঢের বড় কথা। ভিতটুকু খুঁড়ে ফেলে তার পর যদি ইট, চূণ আর সুরকি তৈরী কত্তে যেতে হয়, তাহ'লে এসব তৈরী হ'তে হ'তে এক বর্ষার জলেই ভিতের গড়িকে পূর্ব্ববৎ ক'রে দেবে। গোড়া থেকে দুই ফুট গেঁথে নিয়ে তারপরে যদি কাঠ-গুদামে যেতে হয় চৌকাঠের অর্ডার দিতে তাহ'লে চৌকাঠ আস্‌তে আসতেই অতি মূল্যবান্ দুই মাস সময় পার হ'য়ে যাবে। ফলে,—"নূন আনতে পান্ত শেষ" অবস্থা হবে।'

হুজুগ ও প্রেরণা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—আসল মুস্কিলটা হচ্ছে কি জানিস্? অসাধক লোকগুলি নিজের শক্তিকে জানতে পারে না ব'লে 'হুজুগ' আর 'প্রেরণা' এই দুইটা বস্তুকে গুলিয়ে দেয়, অনেক সময় 'হুজুগ'কেই প্রেরণা ব'লে ভ্রম ক'রে।

ঢেঁড়শ গাছ পুঁতিতে পুঁতিতে একজন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হুজুগে আর প্রেরণায় পার্থক্য ধরিবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হুজুগ জাগে বাইরের উত্তেজনায়, প্রেরণা জাগে অন্তরের অন্তঃস্থলে। হুজুগ হয় বিদ্যুতের মত ক্ষণপ্রভা, প্রেরণা হয় পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায় সমগ্রজীবনব্যাপী। হুজুগে অন্তরের সমৃদ্ধি অপেক্ষা বাইরের উন্মাদনা বেশী, প্রেরণায় অন্তরের অনুভূতি বাইরে প্রস্ফুটনের চাইতে সহস্র গুণ প্রগাঢ়। হুজুগ বহুদূরগামী হয়, কিন্তু নিকটকে মথিত কত্তে পারে না, প্রেরণা intensive work করে, extensive manifestation তার কম। হুজুগ পরমতে অসহিষ্ণু, প্রেরণা বিরুদ্ধ মতের প্রতিও অক্রোধ, প্রশান্তচেতা। হুজুগ হিসাবকে ভয় করে, তাই এড়িয়ে যেতে চায়, প্রেরণা অতীত ইতিহাসের প্রত্যেকটী অক্ষরকে নিজ ব্যবহারে আনে, হিসাবে তার ভয় নাই। হুজুগ নাটকের ভীমের মত আড়ম্বর-পরায়ণ, প্রেরণা সতীনারীর প্রেমের মত নীরব ও গোপন। হুজুগ ফলের জন্য কালাপেক্ষা কত্তে অসমর্থ, প্রেরণা অসীম সহিষ্ণুতা নিয়ে অপেক্ষা করতে জানে। হুজুগ অল্পশ্রমে কাতর হয়, প্রথম বিফলতাতেই নিরস্ত হয়, প্রেরণা আমৃত্যু শ্রম ক'রেও অক্লান্ত, অকাতর, সহস্র বিফলতাতেও দ্বিধাহীন, কুণ্ঠাহীন। হুজুগ অব্রহ্মচারীরই চিরসঙ্গী, প্রেরণা আজন্ম-ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণেরই স্বভাব-সম্পদ।

পুপুনকী আশ্রম,
২৩শে আষাঢ়, ১৩৩৫

দৈবের সঙ্গে লড়াই

ক্রমাগত অনেকদিন পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বৃষ্টি হওয়ায় আশ্রমের কৃষি-ক্ষেত্রে কুমড়ার মাদা ঠিক করা বা বীজ-বপন সম্ভব হয় নাই। গতকল্য অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু রৌদ্র হওয়াতে ভূমি কিছু শুষ্ক হইয়াছে, অদ্য আর বৃষ্টি না হইলেই বীজ-বপন-কার্য্য অবাধে চলিয়া যায়। কিন্তু বৈকাল বেলা সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়, আমরা দৈবের সঙ্গে লড়াই কর্ব্ব এবং সেই লড়াই জিতে তবে ছাড়ব।

তৎক্ষণাৎ কুমড়ার মাদার উপরে ঝুড়ি, চট, বসিবার আসন এবং গায়ে দিবার কম্বল বিস্তারিত হইল। বৃষ্টি থামিয়া গেলে সেই শুষ্ক কুমড়ার মাদাতে যথাভিরুচি কার্য্য আরম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অলস হ'য়ে, নিরুদ্যম হ'য়ে, দৈবের মুখপানে তাকিয়ে থেকেই আমরা জাতীয় জীবনে যত দুর্গতি ডেকে এনেছি। মনে রেখো, ভগবানের সঙ্গেও আমাদের লড়াই দিতে হবে। তবে ত তিনি বীর-পুত্র ব'লে আমাদিগকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করবেন, ললাটে রাজটীকা পরিয়ে দেবেন।

তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—একটা ত্রিপাল, চারি কোণায় চারিটা কপি (Pulley), দড়ি আর খুঁটার সাহায্যে কি করিয়া কাজ চলিতে পারে, প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যেও ছায়ায় দাঁড়াইয়া কোদাল মারা যায়। তিনি বলিলেন,—নির্দ্দিষ্ট জমিতে ত্রিপাল টানিয়ে দিয়ে রৌদ্রের সময়ও নিশ্চিন্তে পরিশ্রম কত্তে

হবে, মাটি কোপাতে হবে, আর চারাগাছ transplant ক'রে প্রথম কয়েকদিনের রৌদ্রতাপ থেকে তাদের রক্ষা কত্তে হবে। বৃষ্টির সময়ে ছায়ায় ঢাকা ক্ষেত্রটুকুর চতুর্দ্দিকে নর্দ্দমা কেটে জল-নির্গমের পথ ক'রে দিয়ে মনের আনন্দে শুষ্ক ভূমিতে ইচ্ছানুযায়ী কাজ কত্তে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণির এই অভিনব পরামর্শ শুনিয়া সহকর্ম্মী ব্রহ্মচারীরা হাসিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরে, দৈবের সঙ্গে লড়াই করার মত পুরুষকারই ত' জীবনের চিহ্ন রে! য়ুরোপ জীবনের প্রতিপাদবিক্ষেপে এই পুরুষকারকে প্রয়োগ কচ্ছে। তাই না ওরা আজ পৃথিবীর অধিপতি! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। ভারতবর্ষের যারা অভ্যুদয় চায় তাদের আজ সমগ্র জাতির ভিতরে এই পুরুষকারকে সংক্রামিত কর্ব্বার জন্য চেষ্টা পেতে হবে। জগতে কিছু অসম্ভব থাক্‌বে না, থাক্‌তে পারে না,—এই জিদ্‌টাকে সমগ্র জাতির মধ্যে বিসর্পিত করা চাই। গুরুগোবিন্দের মত একটী চড়ুই-পাখী দিয়ে এক লাখ বাজের সঙ্গে লড়াই চালান চাই, নেপোলিয়ানের মত দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরিশ্রেণীর উন্নত শিখর পথশ্রান্ত, ক্ষুধাক্লান্ত সৈনিকদলের পাদপীড়নে অতিক্রম করান চাই। নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সবাইকে আজ পুরুষকারের উপাসক ক'রে তুলতে হবে। ভারতবর্ষের উদ্ধার এই পথে।

পুরুষকার ও ভাগবতী-শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য এইটীও জানতে হবে, আমার পুরুষকারের মূল ভিত্তি ভগবানের শক্তি। আমার বাহুই দিগ্বিজয় কর্ব্বে, কিন্তু এ বাহুর সমগ্র বল আসবে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম থেকে। য়ুরোপ বিজ্ঞানের বলে দৈবের সঙ্গে লড়াই

দিয়েছে সত্য, কিন্তু অন্ধের মত ব্রহ্ম-দৃষ্টিহীন হ'য়ে, নিজের পরমশক্তির উৎসকে না জেনে। ভারতবর্ষ সেই ভুলের অনুকরণ কর্ব্বে না। তার প্রমাণ জগদীশ বসু। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হ'য়েও তিনি ব্রহ্মদৃষ্টি হারান নি, সকল বলের মূল উৎস যে কোথায়, তা' ভুলে যাননি। এইখানেই আচার্য্য জগদীশের ভারতীয়ত্ব।

ভারতীয়ত্বের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ভারতবর্ষে জন্মালেই কেউ ভারতীয় হয় না, ভারতের নিজস্ব যে ব্রহ্মবিজ্ঞান, তা'কে নিজ জীবনে ফুটান চাই। ভারতের জড় বৈজ্ঞানিকও ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে চৈতন্যময় থাক্‌বেন, তবে তিনি ভারতীয়। যথা—চরক, সুশ্রুত। ভারতের যোদ্ধা শাণিত কৃপাণ পরিচালনের কালেও ব্রহ্মদৃষ্টি হারাবেন না, তবে তিনি ভারতীয়। যথা,—অর্জ্জুন, রাজা সুরথ। ভারতের রাজনীতিক কূট-কৌশলের প্রয়োগকালেও নিজের ব্রহ্ম-চৈতন্য হারাবেন না, তবে তিনি ভারতীয়। যথা—শ্রীকৃষ্ণ। ভারতীয় হওয়ার মানে ঋষি হওয়া, ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া, ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ করা বা ব্রহ্মত্বই প্রাপ্ত হওয়া। অবশ্য আপত্তি উঠবে, "মশাই, লক্ষ লক্ষ লোক যে দেশে না খেয়ে প্রাণে মারা যাচ্ছে, কোটি কোটি লোকের যে দেশে কটিতটে বস্ত্র নেই, সেই দেশে ঋষিত্বের কোনও প্রয়োজন নেই।" আপাতদৃষ্টিতে কথাটা খাঁটিই মনে হবে। কিন্তু জেনো, শ্রীকৃষ্ণের মত পুরুষ যখন রাজনীতি হাতে নেন, তখনই রাজনীতি ধর্ম্মনীতিতে পরিণত হয়, রাষ্ট্র-লোলুপ ভ্রাতৃবর্গের গৃহ-কলহ ধর্ম্মযুদ্ধে পরিণত হয়, সেই অতুলনীয় হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক কাহিনী ধর্ম্মকথায় পরিণত

হয়, ঋষির হাতে যখন বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ হয়, তখনই মহাপ্রলয় মহাসৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়।

পুপুনকী আশ্রমের অসাম্প্রদায়িকতা

সন্ধ্যাকালে আত্মিক কর্ত্তব্যসমূহ সমাপিত হইবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি কোনও কোনও দিন আশ্রমস্থ কর্ম্মীদিগকে অধ্যাপনা করেন। বলা বাহুল্য, আশ্রমের বর্ত্তমান কর্ম্মীরা সকলেই শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণাশ্রয়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য না হইলে যে কাহারও আশ্রমে কর্ম্মী হইবার উপায় নাই, এমত নহে। তাঁহার খোলা আদেশ রহিয়াছে,—যাঁর ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথ যাহাই হউক না কেন, যে যাহারই শিষ্য, ভক্ত বা অনুরাগী হউক না কেন, সাম্প্রদায়িক কারণ বশতঃ কখনই কোনও কর্ম্মীর প্রবেশ-পথ এখানে অবরুদ্ধ হইবে না। ইহা সম্প্রদায়-বিশেষের আশ্রম নহে, ইহা সর্ব্বসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধন।

পরবর্ত্তী কোনও সময়ে (১৭ই আশ্বিন, ১৩৩৬) তিনি একখানা পত্রে একজনকে লিখিয়াছিলেন,—

"কেহ আমার নিকটে ধর্ম্ম চাহিলে ব্যাকুল প্রার্থীর অন্তরের কামনা আমি নির্ব্বিচারে পূর্ণ করিব। কেহ আমার কর্ম্মের সহযোগী হইতে চাহিলে যোগ্যতা বুঝিয়া তাহাকেও সঙ্গে লইব। আমার ধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি আমার কর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিব না। আমার কর্ম্মের সাথী যাহারা হইয়াছে, তাহাদিগকে আমার ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিব না। আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ফলে স্বভাবতঃ যদি কেহ আমার কর্ম্মে অনুরাগী হয়, হউক। আমার কর্ম্ম গ্রহণ করিবার ফলে স্বভাবতঃ যদি কেহ আমার ধর্ম্ম পাইতে চাহে, পাউক। স্বভাবের পথে প্রত্যেক

ব্যক্তি চলুক, প্রত্যেকের নিকটে আমি স্বাধীনতা-দাতা। কাহারও জীবনকে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট পথেই ঠেলিয়া নিয়া ফেলিবার দায়িত্ব আমার নহে।"

অপর এক সময়ে তিনি আশ্রমের বিশেষ দায়িত্বভারপ্রাপ্ত জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন,—অন্য গুরুর যারা শিষ্য বা অন্য সাধনের যারা সাধক, তারা যদি কখনো এখানে এসে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা বা স্বার্থপরতার পরিচয় পায়, তোদের কোন ব্যবহারে, বাক্যে বা আকারে-ইঙ্গিতে পর-পর অনুভব করে, তবে জান্‌বি, নেড়া-নেড়ীর দলে পরিণত হ'তে তোদের আর ছয় সপ্তাহও দেরী নেই।

তথাপি যে শ্রীশ্রীবাবামণির শিষ্য ব্যতীত অপর কোনও কর্ম্মী এখানে বর্ত্তমানে নাই, তাহার কারণ তাঁহার আত্ম-প্রচারের অভাব। তাঁহার শিষ্যগণ ব্যতীত সাধারণ লোকে এই অলোকসামান্য নীরব প্রচেষ্টার কথা জানিবারই অবসর পায় নাই।

পিতা হওয়ার দায়িত্ব

যাহা হউক, অধ্যাপনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পিতা হওয়ার দায়িত্ব বড় বিষম, বড় বিরাট্। তাঁকে জান্‌তে হবে যে, তিনি পিতা, তাঁকে সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, সন্তানের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য অতীব গভীর, সন্তানের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁর বিশাল দায়। কিন্তু এইখানেই তাঁর দায়িত্বের আরম্ভ নয়, আরম্ভ হচ্ছে আরো আগে। সন্তান যখন শুক্ররূপে মাতৃগর্ভে আহিত হবে, তখনই তাঁকে জান্‌তে হবে যে, এই শুক্র সর্ব্বপ্রকার অশুদ্ধতা থেকে, অপবিত্রতা থেকে, ব্যাধি থেকে, যক্ষ্মার সম্ভাবনা বা উপদংশের বীজাণু থেকে মুক্ত থাকা চাই। সন্তান যখন

শুক্ররূপে পিতৃদেহ থেকে মাতৃদেহে গমন কর্ব্বে, তখন সন্তানের জনককে জান্‌তে হবে যে, তাঁর মন পাপ-লালসা-কাম-বুদ্ধি ও ভোগ-প্রার্থনা থেকে মুক্ত রয়েছে, তাঁর জনন-কর্ম্ম কাম-সম্ভোগ নয় পরন্তু জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মী সন্তানেরই আবির্ভাব-প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত। তাঁকে জান্‌তে হবে যে, তাঁর কামানুষ্ঠানের সঙ্গে ভগবৎ-প্রীতির বিরোধ নেই, ভগবৎ-সেবার বিচ্ছেদ নেই। এতখানি কত্তে পারলে তবে গিয়ে যথার্থ পিতা হওয়া যায়।

ভবিষ্যৎ গড়িবার প্রণালী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—পিতারা যদি যথার্থ পিতা হ'তে পারেন, তা' হ'লে সন্তানেরাও যথার্থ সন্তান হ'য়ে জন্মগ্রহণ কত্তে পারে। দুইটী প্রচণ্ড শক্তি সন্তানের জীবনের বিকাশকে আনুকূল্য বা বিরুদ্ধতা দিয়ে গ'ড়ে থাকে। প্রথম হচ্ছে বংশানুক্রম, দ্বিতীয় হচ্ছে শিক্ষা। বিশুদ্ধভাবে জন্ম হ'লে আর উৎকৃষ্ট বংশানুক্রম পেলে সহজেই সন্তান মনুষ্যত্ব লাভ কত্তে পারে। আবার, সুশিক্ষা লাভ হ'লেও অল্পায়াসেই সন্তানের সদ্‌গুণসমূহ বিকশিত হয়। বর্ত্তমানের তরুণ দম্পতীরা হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভারতের নির্ম্মাতা বা ভারতের ভবিষ্যতের ভাগ্য-বিধাতা। এঁরা পুত্র-কন্যার জনন যত শুদ্ধ চিত্তে, যত পবিত্র মনে, যত সাত্ত্বিক ভাবে দিতে পার্ব্বেন, সন্তানের পূর্ণ মনুষ্যত্বের সম্ভাবনা তত অধিক হবে। আজকে এই পুপুন্‌কীর বনে ব'সে বিরলে কাজ কর্ল্লে কি হয়, সুশিক্ষা ও বংশানুক্রমিকতার অনুকূলে তোমাদেরই এক স্থায়ী আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে জাতি-গঠনের ধারা প্রবর্ত্তন কত্তে হবে।

শিক্ষা ও বংশানুক্রম

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষা ও বংশানুক্রম নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বড় কলহ। একদল বলেন,—'শিক্ষা-দীক্ষা যতই দাও, কুকুরের ল্যাজ পঞ্চাশ বৎসর বাঁশের চোঙ্গায় ভ'রে রাখলেও সে সোজা হয় না, পাথরের উপর শত বৎসর ধ'রে ঘৃত মর্দ্দন কর্ল্লেও সে নরম হয় না; সুতরাং সদ্‌বংশে জন্মই আসল কথা, উৎকৃষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ না কর্ল্লে বাবা কিছুতেই কিছু নয়।' আবার আর একদল বলছেন,—'বংশ, ফংশ শুধু বাক্যাড়ম্বর, বংশের উৎকর্ষে বা অপকর্ষে কিছুই আসে যায় না, শিক্ষা যদি দিতে পার, তাহ'লে কুকুরকে দিয়ে অর্গান বাজিয়ে নিতে পার, বাঘ-ভালুক দিয়ে তাশ খেলা চালাতে পার, বানরকে দিয়ে টাইপ্-রাইটারের কাজ করাতে পার।' বাস্তবিক কিন্তু এই রকম সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাজ য়ুরোপের প্রাণি-ধুরন্ধরেরা ইতর জীবজন্তুদের দিয়ে করিয়েও নিয়েছেন। প্রথম দল বল্‌ছেন, —'অনুসন্ধানে নির্ভুলরূপে জানা গিয়েছে যে, একটা মাতাল থেকে যে বংশ আরম্ভ হয়েছে, তাতে মাত্র পঁচাত্তর বৎসর সময়ের মধ্যে দুইশত চোর, গাঁট-কাটা ও নরহন্তা, দুই শত চৌরাশীটী চিররোগী এবং নব্বইটী গণিকা জন্মেছে। * আর দেখা যাচ্ছে যে, যতই শিক্ষা দাও, আর যতই তন্ত্র-মন্ত্র পড়, বানরের গর্ভে কই মহিষ বা গণ্ডার ত' জন্মাচ্ছে না। বানরের বংশে যে বানরই জন্মাচ্ছে। সুতরাং বংশানুক্রমেরই জয়জয়কার।' অপর দল বল্‌ছেন,—'এই দেখ না, অধ্যাপক গার্ণার সেদিন বানরের ভাষার মূলসূত্র আবিষ্কার করেছেন—ফনোগ্রাফের

* The Criminal (Havelock Ellis)

সাহায্যে। অতি অল্পকালের মধ্যেই দেখো, এমন আশ্চর্য্য প্রণালী বেরুবে, যাতে বানর প্রভৃতি জন্তুকে সুশিক্ষিত ক'রে যুদ্ধের সৈন্যের কাজ, বাড়ীর দারোয়ানের কাজ, অফিস-বেয়ারার কাজ, হোটেলের চাকরের কাজ, জাহাজের খালাসীর কাজ প্রভৃতি সব সুচারুরূপে করান যাবে। সুতরাং শিক্ষারই শ্রেষ্ঠতা মানতে হবে।' এইভাবে দুই দলের তুমুল ঝগড়া চলেছে, কিন্তু বাস্তবিক প্রস্তাবে একটী জাতিকে বড় হ'তে হ'লে এই দুটো মতেরই সামঞ্জস্য স্থাপন করা চাই। 'হাইড্রোজেন' আর 'অক্সিজেন' না মিললে যেমন জল হয় না, পুরুষ-বীর্য্য আর রমণী-রজঃ না মিললে যেমন সন্তান হয় না, মৃত্তিকা আর বীজের সংযোগ ব্যতীত যেমন গাছ হয় না, এই দুইটী শক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মিলন ব্যতীত তেমন জগদ্‌গুরু যে ভারতবর্ষ, তার পূর্ণ বিকাশ হবে না।

য়ুরোপে বংশানুক্রম-আন্দোলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—য়ুরোপীয়দের বংশানুক্রম-আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, তাঁরা অপর সকল প্রাণীর সুজনন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, কেবল মানুষ ছাড়া। একটা সাধারণ ঘোড়ার বংশ থেকে কেমন ক'রে অত্যন্ত দ্রুতগমনশীল ঘোড়া জন্মাবে, একটা ছোট ছাগলের বংশে কি ক'রে বড় বড় ছাগলের জন্ম হবে, একটা সাধারণ শাদা ইঁদুরের বংশে কি ক'রে শূকরের মত অতিকায় জন্তু প্রসূত হবে, এক সের দুধওয়ালা গাভীর বংশে কি ক'রে দুই মণ দুধওয়ালা গাভী জন্মাবে, সিকি তোলা ওজনের আলুটার বংশে কি ক'রে দুই সের ওজনের আলু জন্মাবে, পাঁচ ইঞ্চি লম্বা সীমটার বংশে কি ক'রে সাড়ে তিন

হাত লম্বা সীমের উদ্ভব হবে, তাঁরা এই সব চিন্তা-চর্চ্চা নিয়েই ঘোরতররূপে অস্থির। এই জন্য কত বৈজ্ঞানিক সমস্ত জীবন দিয়ে দিচ্ছেন, কত মস্ত মস্ত পরীক্ষাগার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে তৈরী হচ্ছে। আর, অন্যদিকে মানুষের বংশোৎকর্ষ কি ভাবে বর্দ্ধিত হবে, সে সম্বন্ধে সমগ্র দেশ একেবারে নীরব। শুধু নীরব নয়, বরং যে সকল আন্দোলন উপস্থিত হ'লে বংশোৎকর্ষ নাশ হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা তারই প্রসার হচ্ছে প্রাণপণে। শুধু কাম-লালসায় বা অন্য কোনও নিকৃষ্ট কারণে যার তার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া, পরীক্ষার্থে সাময়িক ভাবে বিবাহ করা, বারংবার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা, স্বাধীন প্রেম, দাম্পত্য-সাধনহীন বিবাহিত-জীবন-যাপন, বিভিন্ন ধর্ম্মমত-বিশিষ্টদের মধ্যে বিবাহ হওয়া, সাংসারিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য থেকে মুক্ত থাকার জন্য চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করা এবং অবিবাহিত থেকেই তলে তলে অসংযমের সেবা করা, দারিদ্র্য প্রশমনের অজুহাতে কৃত্রিম উপায়ে জনন-নিরোধের চেষ্টা করা প্রভৃতি আন্দোলনগুলি সবই বংশোৎকর্ষনাশক অথচ য়ুরোপ-আমেরিকাতে এইগুলিরই বৃদ্ধি হচ্ছে দ্রুত। দেখাদেখি জাপান-ভায়াও তার পশ্চিমা-গুরুর বদ্‌খেয়ালের নকল কচ্ছেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই বিষয়ে সাবধান থাক্‌তে হবে এবং অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ এই বিষয়ে অনেকটা সতর্কও বটেন। ভারতবর্ষের যে বিবাহ-সম্পর্কিত গণ্ডীভেদ, তার মূল লক্ষ্য এই বংশানুক্রম বা সুজনন। সুজননের সৃষ্টিই ভারতীয় বিবাহের মর্ম্মের কথা। এই কথাটী মনে না রাখলে আমরা জাতিভেদ-ব্যবস্থার অনেকটাই বুঝতে পার্ব্ব না।

ভারতবর্ষে বংশোৎকর্ষ-নাশক আন্দোলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বংশোৎকর্ষ-নাশক আন্দোলন ভারতেও প্রসার পাচ্ছে। এটা য়ুরোপের দান। প্লেগের মত, সিফিলিসের মত বংশোৎকর্ষ-নাশক আন্দোলনগুলিও ভারত ছেয়ে ফেলল ব'লে। বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে কোথায় মানুষ বংশোৎকর্ষ বিধানে চেষ্টা কর্ব্বে, তা' না ক'রে ঠিক উল্টো ব্যাপারে দেশ আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। পাশ্চাত্যের ভারতীয় শিষ্যেরা যৌন-সম্ভোগকে ছাগ-ছাগীর মিলনের চাইতে বেশী কৌলীন্য দেবে না, স্ত্রীজাতির সতীত্বকে নারীত্বের চাইতে ছোট ব'লে গ্রহণ কত্তে কুণ্ঠিত হবে না, নরনারীর দাম্পত্য-জীবনে সমযোগে ভগবৎ-সাধনাকে একটা উপহাসের জিনিষ ব'লে মনে কর্ব্বে, সংযমের পথ এরা বর্জ্জন কর্ব্বে এবং ফলে ক্রমশঃ নির্ব্বংশ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ভারতের বুক থেকে মুছে যাবে। আর যারা পাশ্চাত্যের প্রলোভনে টল্‌বে না, আপাত-সুখের প্ররোচনায় ভুলবে না, ভারতীয় জীবনের সার-সত্যকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখবে, তারা সহস্র ঝঞ্ঝাবাত সহ্য ক'রে টিকে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবদের জন্মদান কর্ব্বে।

ভারতে শিক্ষা ও বংশানুক্রম

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন ভারতে শিক্ষার যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাই, গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে লোকের জাতি-নির্ণয় হ'ত। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ের পুত্র, বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র, সত্যকাম জাবালি পান্থ-নিবাসের পরিচারিকার পুত্র, কিন্তু তাঁদের ব্রাহ্মণ হবার বাধা হয়নি। শিক্ষা এঁদের

উন্নতির কারণ। শিক্ষা বলতে আমি শুধু পুস্তক পাঠ বুঝছি না, —শিক্ষা মানে সাধনা, অধ্যবসায় ও বড় হবার চেষ্টা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত পুরুষকার-জনিত উৎকর্ষ। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষার অর্থাৎ সাধনার সমাদর অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল এবং বংশানুক্রমেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। নানক, কবীর, তুকারাম, বিবেকানন্দ, গান্ধী প্রভৃতি অব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-গুরুর আবির্ভাব পুনরায় শিক্ষার অর্থাৎ ব্যক্তিগত উৎকর্ষের সমাদরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু তথাপি আজও ভারতবর্ষ বংশ-বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধ'রে আছে। অনেক তথাকথিত ব্রাহ্মণকে আমি বল্‌তে শুনি যে, ব্রাহ্মণের ঘরে না জন্মালে বীর্য্যধারণের নাকি ক্ষমতাই জন্মে না। কিন্তু উন্নতপন্থী ভারত কখনো মিথ্যাচারী বংশানুক্রমকে মানবে না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ যদি বংশ বেয়ে চল্‌তে পারে, তবেই সেই বংশে জাত সন্তানকে ব্রাহ্মণ ব'লে মান্‌বে।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
২৪শে আষাঢ়, ১৩৩৫

অসাত্ত্বিক দান

অদ্য প্রাতঃকালে কুমড়ী গ্রামের একটী লোক দামোদরের ওপারে কোনও কয়লার খনিতে যাইতেছিল। তাহার হাতে একটী গুড়পূর্ণ ঘড়া। গুড়টা কলিয়ারীর এক বাবুকে দিবার জন্য বাড়ী হইতেই সঙ্কল্প করিয়া লোকটী বাহির হইয়াছে। যাহাকে গুড়টা দিবে, তাহার নিকটে কিছু স্বার্থের দায় আছে। পথ চলিতে চলিতে লোকটী দেখিল যে ঘড়া হইতে উপছিয়া গুড় পড়িয়া যাইতেছে। সম্মুখেই পুপুন্‌কী আশ্রম। সে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিল,—"গুড়টার কতক অংশ আপনি গ্রহণ

করুন।" অপরের জন্য সঙ্কল্পিত বস্তু শ্রীশ্রীবাবামণি রাখিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু লোকটী জোর করিয়াই কতকটা গুড় শ্রীশ্রীবাবামণির অজ্ঞাতসারে আশ্রমের অপর একজন সেবকের নিকট রাখিয়া গেল।

আজকাল সমগ্র দিন সমানে কৃষি-কার্য্য চলিতেছে, রৌদ্র-বৃষ্টির বিচার নাই। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণির অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইল, তিনি পানীয় জল চাহিলেন। একজন কর্ম্মি-ব্রহ্মচারী জল ও ঐ সামান্য গুড়টুকু নিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি গুড়টুকু দেখিয়াই বলিলেন,—ফেলে দাও, এটা অসাত্ত্বিক দান। এ দান গ্রহণ কর্ল্লে পতিত হ'তে হয়।

কর্ম্মী জিজ্ঞাসিলেন,—কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' করার নাম দান নয়, ওটার নাম ফাঁকিবাজি। সেই 'উড়ো খৈ' স্বীকার কর্ত্তে নেই। কর্ল্লে প্রতিষ্ঠানে পাপ ঢোকে। যা শ্রদ্ধার দান, সৎ-সঙ্কল্প যে দানের প্রাণ, তাই শুধু গ্রহণীয়।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—এক দরিদ্র বৃদ্ধা রমণী কাশী-বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দুয়ারে ভিক্ষার্থিনী হ'য়ে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল। একজন শ্রেষ্ঠী বিশ্বনাথের পূজা দিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছেন, বৃদ্ধার ক্রন্দনে তিনি বিচলিত হলেন এবং ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বে'র ক'রে নিয়ে তাকে দিয়ে বল্লেন,—যা ত' বুড়ী-মাঈ, এই টাকাটা ভাঙ্গিয়ে আন্‌ত, চার আনা তুই নিবি, আর বারো আনা আমায় ফিরিয়ে দিবি। বৃদ্ধা নিকটবর্ত্তী দোকানদারদের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণের চেষ্টার পরে টাকাটা ভাঙ্গিয়ে আনল এবং দাতাকে বারো আনা ফিরিয়ে দিল। শ্রেষ্ঠী মনে মনে এই কথা বলতে বলতে চলে গেলেন,—"এক ঢিলে

দুই পাখী মারা গেল, মেকী টাকাও চ'লে গেল, চার আনা পয়সা দানের জন্য পুণ্যও কিছু হ'ল।''—এই রকমের দান, অতি নিকৃষ্ট দান। এতে দাতারও পুণ্য হয় না, গ্রহীতারও মঙ্গল হয় না। এক লক্ষপতি চোর সহস্র সহস্র দরিদ্র ও বিধবাকে ঠকিয়ে বিশাল সম্পত্তি অর্জ্জন ক'রে দেখলেন, ধরা প'ড়ে জেলে যেতে হবে, তখন আত্মহত্যা ক'রে জেলের দায় ঘুচালেন, আর সমগ্র চোরাই ধন একটা মুনি-ঋষিদের আশ্রমের নামে দান ক'রে গেলেন। এ রকম নীচ দান যারা গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে পাপ প্রবেশ করে, দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়; তাই, এই সব দান অগ্রাহ্য।

অভিক্ষুর দান

আশ্রমে প্রত্যহ নানাবিধ রোগীর ভীড় হইয়া থাকে। সকলকে বিনামূল্যেই ঔষধ দান করা হয়। কিন্তু নিয়ম এই যে, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও অশক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ঔষধ-প্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিকে আশ্রমের কৃষিক্ষেত্রে সামান্য সময়ের জন্য একটুকু কাজ করিতে হয়। যে অধিক করিতে না চাহে, তাহাকে অন্ততঃ এক কোদাল মাটি খুড়িতে হয়।

এই নিয়মটীর সার্থকতা সম্বন্ধে কথা উঠিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশের কাছে অভিক্ষুর দান হচ্ছে অনালস্য। তারই জন্য এই নিয়ম।

জাতীয় জীবনে দৈব ও পুরুষকার

বৈকাল বেলা নূতন একটি জুলি কাটিয়া চিনাবাদামের বীজ বপন করা হইতেছে।

কাজ করিতে করিতে নানা কথা উঠিল। ''হাতে কাম, মুখে রাম'' প্রবচনের সার্থকতা সমগ্র বর্ষাকালটা ধরিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। কৃষি কর্ম্ম ছাড়া অপর কর্ম্মে সময় আজকাল খুব কমই পাওয়া যাইতেছে দুই একজন ব্রহ্মচারী চুরি চামারি করিয়া উপাসনার সময় বাড়াইয়া লইতেছে নতুবা নিশ্চিন্তে উপাসনারও উপযুক্ত সময় মিলিতেছে না। কর্ম্মের হিড়িকে অবসরই মিলে না। উপাসনাতে কাহারও বেশী সময় লাগিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন,—''বেটারা, উপাসনার নামে আলস্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছিস্‌। ধর জোরসে কোদাল, আর শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম চালা। হাতে কামান দাগাবি, আর শ্বাসে নাম জপবি, তবে গিয়ে সাধক। ভণ্ডামি কর্ল্লে সাধক হয় নাকি রে ?'' সাধন-ভজনের প্রতি একজন শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ, বেচারী শুধু সাধন-ভজনের জন্যই ঘর-বাড়ী, ভ্রাতা-ভগ্নী এবং বৃদ্ধা মাতাকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কোথায় গুরুদেবের মুখের সান্ত্বনা-ভাষণে প্রাণ স্নিগ্ধ হইবে, বরং উল্টা তিরস্কার। বেচারী কাঁদিয়া ফেলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন,—''Remember you are born warriors, (মনে রাখিও, তোমরা জন্ম হইতেই যোদ্ধা)'' শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন,—''Ready and steady (সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং অধ্যবসায়ী)—এই হ'ল সৈনিকের আবশ্যকীয় গুণাবলী।''

পরিশ্রম করিতে করিতে কেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে নিমেষের জন্য শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে অবসর দিয়া কিয়ৎকাল পরেই অল্পতর-শ্রম-সাধ্য অন্য একটা কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। কিন্তু স্বয়ং যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন কেহ আসিয়া যদি বলে একটু বিশ্রাম করিতে, তিনি তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া

বলেন,—"Rest ? After Death please,—বিশ্রাম নিব মৃত্যুর পর।" ক্ষুধার সময়ে আহার মিলে নাই বলিয়া যন্ত্রণায় হয়ত কেহ উদর চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছে, শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"Hunger is your bosom-friend, then why touch your belly ? ক্ষুধা ত' তোমার হৃদয়-বন্ধু, হৃদয় স্পর্শ না করিয়া উদর স্পর্শ করিতেছ কেন ?"

যাহা হউক, চিনাবাদামের বীজ বপন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—Chance এ (দৈবে) কখনও একটা জাতি বড় হ'তে পারে না, দৈব হয়ত একটা লোককে কদাচিৎ বড় কত্তে পারে। আবার পুরুষকার হয়ত একটা লোকের জীবনে ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু সমগ্র জাতির জীবনে পুরুষকার কখনও ব্যর্থ হয় না। জাতিকে যদি বড় কত্তে হয়, তবে পুরুষকারের সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে।

জাতীয় স্বাধীনতার উপায়

কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীবাবামণি জাতীয়-স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রসঙ্গে বলিলেন,—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় যখন পরাধীন দেশ-মাত্রেরই প্রয়োজন, তখন তার প্রকৃত উপায়টির নির্দ্ধারণেরও পূরাদস্তুর প্রয়োজন। পরাধীনতা যে কারণে ঘটেছে, সেই কারণগুলিকে দূর করাই হ'ল স্বাধীনতা লাভের মুখ্য উপায়। পরাধীনতার কারণ হ'ল দুর্ব্বলতা,—দৈহিক, মানসিক ও সঙ্ঘগত বা Organisational দুর্ব্বলতা। বিদেশী শাসকদের শাসন-যন্ত্রে বিন্দুমাত্র আঘাত না ক'রেও যদি কেউ এই ত্রিবিধ দুর্ব্বলতাকে জাতির মধ্য থেকে দূর কত্তে পারে, তবে সেই ব্যক্তি পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-লাভে চৌদ্দ আনা সহায়তা

কর্ব্বে। একে তোমরা non-political politics (অরাজনৈতিক রাজনীতি) বলতে পার।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৫

ব্রহ্মসাধক রজনীকান্ত

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি একজন ব্রহ্ম-সাধকের কথা বলিতে লাগিলেন,—ঢাকার শক্তি ঔষধালয়ের মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপন ক'রে মন্দিরের সংলগ্ন একটী চতুষ্পাঠী ক'রেছিলেন। সেখানে পণ্ডিত রজনীকান্ত বেদান্তবাগীশ অবৈতনিকভাবে থেকে অধ্যাপনা কত্তেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাচীনপন্থী জ্ঞানী পুরুষ। তাঁর জীবন ও প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। ভণ্ডামি তিনি একদম সহ্য কত্তে পাত্তেন না। তাঁর জীবনটাও ছিল সরলতার সজীব মূর্ত্তি। কোনও অসুখ-বিসুখ হ'লে কাউকে তিনি কষ্ট দিতেন না। জ্বর হল, অমনি ঘরের দুয়ারটী বন্ধ ক'রে দিয়ে তাকিয়াটী কোলের উপর তুলে উপুড় হ'য়ে ব'সে তিনি অবিশ্রান্ত জপ কত্তে থাকলেন, "কোঽহং? সোঽহং।" অর্থাৎ—"কে আমি ? আমিই ত' ব্রহ্ম।" একদিন যায়, দুদিন যায়, তাঁর সোঽহং-স্মরণের আর বিরাম নেই। আহারও নেই, নিদ্রাও নেই, শুধু দিবা-রাত্রি ঐ এক কথা,—"কোঽহং ? সোঽহং।" আট দিন যখন পার হ'ল, তখন তিনি দুয়ারের খিল খুলে বের হ'লেন এবং বল্লেন, —ওরে গরম জল কর রে, স্নান কর্ব্ব। ভাত বাড়্‌রে, আহার কর্ব্ব।"

নারীবন্ধু মহেশচন্দ্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এসব ব্রহ্মসাধকদের গৃহ-সংসার ছেড়ে যেতে হয় নাই। অথচ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কেমন তাঁরা নিয়ত ব্রহ্ম-নাম স্মরণে রেখেছেন। আর একজন ব্রহ্ম সাধকের কথা শোন। তাঁর নাম মহেশচন্দ্র আতর্থী। ইনি যৌবনে কলকাতায় ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন এবং জুতার চামড়ার ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তাঁর প্রচুর অর্থলাভ হ'য়েছিল এবং গুদামে বহু টাকার চামড়াও সঞ্চিত ছিল। এই রকম সময়ে একদিন দুপুরে আহার কত্তে ব'সে হঠাৎ স্ত্রীলোকের আর্ত্তচীৎকার শুনে রাস্তায় নেমে আসলেন। এসে দেখেন, প্রকাশ্য রাজ-পথের উপরে পাঁচ ছয়টা পশ্চিমা গুণ্ডা একটী স্ত্রীলোকের উপরে পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা কচ্ছে, আর স্ত্রীলোকটী সাহায্যের জন্য চীৎকার কচ্ছে। রাজপথের দুইপার্শ্বে শত শত লোক ভীরু কাপুরুষের ন্যায় দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। মহেশচন্দ্রের তখনো শকড়ি হাত। কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও কল্লেন না,—অমিত বিক্রমে গিয়ে গুণ্ডাদের আক্রমণ কল্লেন। একজন গুণ্ডা তাড়াতাড়ি তার ছুরি স্ত্রীলোকের বুকে প্রবিষ্ট ক'রে তাকে হত্যা কর্‌ল, অপর জন মহেশচন্দ্রের মাথায় ছুরি বসিয়ে দিল। সে অবস্থাতেও মহেশবাবু দুইটা গুণ্ডাকে বগলে পুরে একেবারে ব্রাহ্মপল্লীর দুয়ারে নিয়ে এলেন। বিখ্যাত বিপিন চন্দ্র পাল আর নীলরতন সরকার তখন যুবক,—তাঁরা দুয়ারে দাঁড়িয়েছিলেন। মহেশবাবুর মাথা বেয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে রক্ত পড়্‌ছে দেখে তাঁরা আর গুণ্ডা ধরবেন কি, মহেশবাবুকেই তাড়াতাড়ি ধর্ল্লেন। সেই যে মহেশবাবু জ্ঞানহীন হ'লেন, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁর সংজ্ঞাই

ফিরে এল না। যে কয় মাস তিনি হাসপাতালে পড়েছিলেন, শুশ্রূষাকারীরা শুন্‌তে পেত, ঐ সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেও তিনি প্রতিনিয়ত 'জয় ব্রহ্ম' 'জয় ব্রহ্ম' বল্‌ছেন। বল দেখি কত বড় ব্রহ্ম-নিষ্ঠা থাক্‌লে মানুষ সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেও ব্রহ্ম-নাম কত্তে পারেন ? আজ যে নারী-রক্ষা আন্দোলনের এত প্রসার দেখ্‌তে পাচ্ছ, চল্লিশ বৎসর আগে এই ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ তার সূচনা করেন।

কালী-সাধক অখিলচন্দ্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এই রকম একজন সাধক ছিলেন, আমার বড় পিসেমশায়, অখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আমার ঠাকুরদাদার মুহুরী-গিরি কত্তেন। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থাতেও তাঁকে দেখ্‌তাম করে কর ফিরাচ্ছেন, ইষ্ট-নাম জপ কচ্ছেন। তিনি যে একজন সাধক পুরুষ, তা' তাঁর বাইরের জীবন দেখে একটুকুও বুঝা যেত না। বড়শী দিয়ে মাছ ধরতে তিনি ভালবাসতেন। বড়শী নিয়ে ব'সেছেন, মাছ টোপ গিলল্, কিন্তু বড়শী ফেলেই নাম-জপ আরম্ভ করেছেন, নামেই মন ডুবে আছে, মাছের টোপ্ গেলা ত' আর দেখতে পাননি। নিকটে যারা ছিল, তারা চীৎকার কর্ত্তে লাগল,—"বাড়ুয্যে মশাই, ও বাড়ুয্যে মশাই।" কিন্তু কে কার কথা শোনে গো। সচ্চিদানন্দ-সাগরে যিনি ডুবেছেন, জগতের তরঙ্গ তাঁকে আন্দোলিত কত্তে পারে না।

শাস্ত্রার্থ বুঝিবার উপায়

জনৈক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, আপনি আমাকে বলেছেন প্রত্যহ গীতা-পাঠ কত্তে, কিন্তু অর্থ যে বুঝি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অর্থ বুঝবার যথার্থ উপায় হচ্ছে সাধন করা। সাধন ছাড়া প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না।

প্রশ্ন।—তবে গীতা না প'ড়ে শুধু সাধন করলেই ত চল্‌তে পারে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খুব পারে, বাবা খুব পারে। কিন্তু সাধন কত্তে কত্তে যখন নিত্য নূতন অনুভূতিগুলি আস্‌তে থাকে, আর যখন দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ করা উপলব্ধিগুলি শাস্ত্রের কথার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে, তখন সাধনের প্রতি নিষ্ঠা ও আস্থা বর্দ্ধিত হয়। তারই জন্যে সাধনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ দরকার। আবার, যে ব্যক্তি সাধনে খুব অগ্রসর হয়নি শাস্ত্রের উপদেশ শুনে শুনে সাধনের প্রতি তার আগ্রহও বর্দ্ধিত হয়।

জ্ঞানের সহিত শাস্ত্র-পাঠের সম্বন্ধ

অপর এক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—শাস্ত্র-পাঠে কি জ্ঞান হয় না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হয়, কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞান। পুস্তক-লব্ধ জ্ঞান অনুমান-সিদ্ধ জ্ঞান, মেঘাবৃত চন্দ্র-রশ্মির মত অস্পষ্ট ও আবছায়াপূর্ণ। ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা থেকে সে মুক্ত নয়। কিন্তু অভ্রান্ত জ্ঞান সাধনলব্ধ বস্তু, সাধনের দুর্গম হিমাচল যে লঙ্ঘন করে নাই, এ পারিজাতপুষ্প তার ভাগ্যে ঘটে না। সাধনের ফলেই সে নিগূঢ় তত্ত্ব সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত জগতের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়, তাতে অস্পষ্টতা থাকে না, আবছায়া থাকে না, দ্বিধা-বোধ থাকে না, সংশয়-সন্দেহের মসীপাত থাকে না। অবশ্য, শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানেরও একটা মূল্য আছে, কেননা সেই জ্ঞান অজ্ঞানতার চেয়ে উৎকৃষ্ট। কিন্তু সাধন-লব্ধ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ

যে জ্ঞান, তার চেয়ে সে নিকৃষ্ট। রামকৃষ্ণ পরমহংস, নানক, কবীর, তুকারাম, দাদু, রোহিদাস প্রভৃতি মহাপুরুষেরা শাস্ত্র-জ্ঞানী না হ'য়েও তত্ত্বজ্ঞানী হ'য়েছিলেন। এঁদের জীবনে সাধনেরই মহিমা প্রস্ফুটিত হ'য়েছে, সাধনের বলেই এঁরা পরম প্রার্থনীয়কে পেয়েছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, স্বামী ভাস্করানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞানী হ'য়েও তত্ত্বজ্ঞানী হয়েছিলেন। তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে এঁদের শাস্ত্রজ্ঞান মিথ্যা হ'ত।

মথুরাবাবুর গীতা-জ্ঞান

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,—মথুরবাবু এক সময়ে সাধন-ভজনে শৈথিল্য ক'রে দিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে গীতার চর্চ্চা আরম্ভ কর্ল্লেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করেন,—গীতার এক একটী শ্লোক যেন হিমালয়ের মত এক একটা সমস্যা হ'য়ে পড়ে, সেই সমস্যার আর সমাধান হয় না। মথুরবাবুর গুরুভ্রাতা, শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর বিখ্যাত শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহারাজ এক বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানী ও পণ্ডিত। তিনি এক পক্ষে এবং অপর পক্ষে পণ্ডিতাগ্রগণ্য রজনীকান্ত বেদান্তবাগীশ কত ক'রে গীতার ব্যাখ্যা ও আলোচনা কত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু মথুরবাবুর মাথায় কিছুতেই কিছু প্রবেশ কত্তে চায় না। একদিন তিনি বিরক্ত হ'য়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার মর্ম্মর-মূর্ত্তির পদতলে গীতাখানা রেখে দিয়ে বল্লেন,—আর নয়, এই যথেষ্ট, এখন ঠাকুরের নাম ছাড়া আর কিছু কর্ব্ব না। এই ভাবে তিনি বৎসরেক কাল গভীর নিবিষ্ট ভাবে শুধু ইষ্টনামেরই

সেবা কত্তে লাগ্‌লেন। একদিন তাঁর কৌতূহল হ'ল গীতাখানা পড়্‌বার,—বেদী থেকে নামিয়ে এনে পড়্‌তে আরম্ভ কর্ল্লেন। পড়্‌তে গিয়ে দেখেন, গীতার সব উপদেশ আপনা-আপনি অনুভবে আস্‌ছে, পূর্ব্বতন সমস্যা-সমূহের একটীও আর উঁকি মারছে না।

বাঘাউড়ার পরমহংস মা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাঘাউড়ার বন্ধু-গোপালের মা, যাঁকে আমি পরমহংস-মা ব'লে ডাক্‌তাম, তাঁর গীতা-জ্ঞান ঠিক এই রকম ছিল। পড়্‌তে পার্‌তেন না, লিখ্‌তে পারতেন না কিন্তু যেই গীতার একটী শ্লোক উচ্চারণ করেছ, অমনি ভূরিভূরি আশ্চর্য্য জ্ঞানপূর্ণ কথা বেরুতে আরম্ভ কর্ল্ল। এসব তাঁর অসামান্য সাধনের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

আশ্রমের সাধন-পরায়ণ জনৈক ব্রহ্মচারী জনান্তিকে বলিলেন, —ও বাবা, ওদিকে বল কর্ম্মই ব্রহ্ম, কর্ম্মই তপস্যা, চুপ ক'রে থাকা ভণ্ডামি আবার এদিকে বল্‌ছ, সাধনই সারাৎসার, সাধনই পরমাশ্রয়, সাধন না কর্ল্লে কিছু হবে না। তোমার যে বাবা লীলা বুঝাই ভার।

মৃদুভাবে বলিলেও কথাটা শ্রীশ্রীবাবামণির কানে গেল। তিনি একটু হাসিয়াই অন্য কথা আরম্ভ করিলেন।

ত্রিবিধ ভণ্ড সন্ন্যাসী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গিয়েছিলাম উড়িষ্যার সুখিন্দার জঙ্গলে আশ্রম কত্তে। একজন সাধু ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর কথা ব'লেছিলেন। যথা, কাম-তরাসিয়া, প্রেম-উদাসিয়া আর সর্ব্ব-

নাশিয়া। সংসারে থাক্‌তে হ'লে কাজ কত্তে হয়, খেটে খেতে হয়, অতএব যা গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী হয়ে—এই শ্রেণীর সাধুরা হ'লেন, কাম-তরাসিয়া। কারণ কর্ম্মে এঁদের ত্রাস। আবার, কেউ হয়ত' কোনও বাড়ীর কুলবধূকে বের ক'রে নিয়ে সটকে পড়েছেন, এখন তাকে নিয়েই বাস্তব্য কচ্ছেন আর রুদ্রাক্ষ গেরুয়ার ভার বইছেন। এঁরা হ'লেন প্রেম-উদাসিয়া, কেন না, নারী-প্রেমই এঁদের উদাসী হবার কারণ। আবার, কেউ হয়ত' খুন ক'রে, ডাকাতি ক'রে বা জেলের গরাদ ভেঙ্গে পালিয়েছেন, আর পুলিশের চ'খে ধূলা দেবার জন্যে লম্বা জটা রেখেছেন, গায়ে ছাই মেখেছেন, ধুনি জ্বালিয়ে ব'সেছেন, আর ঘন ঘন ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি কচ্ছেন, এঁরা হ'লেন সর্ব্বনাশিয়া। কেন না লোকের সর্ব্বনাশই এঁদের সন্ন্যাসের কারণ।

ত্রিবিধ প্রকৃত সন্ন্যাসী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সন্ন্যাসীর ত্রিবিধ শ্রেণীর বিভাগ আমি করেছি অন্য প্রকারে। সন্ন্যাসী তিন প্রকার। আত্ম-ত্রাতা, পরিত্রাতা আর সহজ। নিজের ত্রাণের জন্য যাঁরা সন্ন্যাস নেন, তাঁরা আত্মত্রাতা। যেমন—তুলসীদাস, বিল্বমঙ্গল। পরের ত্রাণের জন্য যাঁরা সন্ন্যাস নেন, তাঁরা পরিত্রাতা। যেমন—বুদ্ধ বা বিবেকানন্দ। স্বভাবের সহজ আকর্ষণে যাঁরা বিনা কারণে সন্ন্যাস নেন, তাঁরা সহজ। যেমন—শঙ্করাচার্য্য বা রামকৃষ্ণ।

জনৈক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন,—ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —Each is great in its own place (প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিষ্ঠান-ভূমিতে শ্রেষ্ঠ।)

ব্রহ্মচারী।—তবু ইতর-বিশেষ আছে ত?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি, তার হিসাবে প্রথম স্থান সহজ সন্ন্যাসীর, দ্বিতীয় স্থান পরিত্রাতার, তৃতীয় স্থান আত্মত্রাতার, কিন্তু সমাজের প্রতি কল্যাণ-প্রভাবের হিসাবে তিন জনেরই শক্তি সমান। কারণ, সন্ন্যাস-গ্রহণ কালে যিনি হয়ত আত্মত্রাতা, সিদ্ধি-লাভের পরে তিনি স্বভাবতঃই পরিত্রাতা এবং তখন তাঁর সন্ন্যাস কোনও সঙ্কল্পকে আশ্রয় ক'রে আর থাকে না, তখন তাঁর সন্ন্যাস সহজ সন্ন্যাস। সিদ্ধির চরম-প্রাপ্তির হিসাবে বা সমাজের প্রতি কল্যাণ-প্রভাব হিসাবে তুলসীদাস, বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে ছোট বড় বিচার কত্তে যাওয়া বাতুলতা মাত্র, কেননা এঁরা তিনজনই ত্রিলোক-পাবন মহাপুরুষ।

আত্মত্রাতা ও পরিত্রাতা

একটু থামিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরো একটী কথা আছে। যিনি আত্মত্রাতা নন, তিনি কখনো পরিত্রাতা হ'তে পারেন না। নিজেকে যিনি উদ্ধার করেননি, পরের উদ্ধার তাঁর দ্বারা কিরূপে সম্ভব হবে? আজ যিনি পরিত্রাতা, কাল তিনি আত্মত্রাতা নিশ্চিত ছিলেন।

যথার্থ শিক্ষার প্রকৃতি

সন্ধ্যার পরে অধ্যাপনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যথার্থ শিক্ষার মধ্যে শিক্ষকের কোনও ব্যক্তিগত খেয়াল বা অভিসন্ধির স্থান থাক্‌তে পারে না। তিনি ছাত্র গড়্‌বেন, ছাত্রের শক্তি, সামর্থ্য, রুচি-প্রকৃতি ও সংস্কারের মুখ তাকিয়ে। ছাত্রকে

তিনি স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা দেবেন, স্বাধীন বুদ্ধি-বিকাশের সহায়তা দেবেন, নিজের কোনও ব্যক্তিগত গোঁড়ামি ও মতবাদ তার উপর চাপিয়ে দেবার অধিকার তাঁর নেই। যুগে যুগে ঘটনার যে বিবর্ত্তন হচ্ছে, তার সঙ্গে জীবনটাকে খাপ খাইয়ে নেবার পূর্ণ যোগ্যতা এবং সহস্র বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়াই ক'রে তাতে বিজয়ী হবার পূর্ণ সামর্থ্য যাতে ছাত্র লাভ কত্তে পারে, এটাই হবে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। পরন্তু নির্দ্দিষ্ট একটা দলের লোক-সংখ্যা বাড়াবার জন্য recruiting ground (আড়কাঠির আড্ডা) রূপে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে না।

শিক্ষকের ব্রহ্মচর্য্য কেন আবশ্যক

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষক যিনি হবেন, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় তাঁকে সিদ্ধ হ'তে হবে। নতুবা তাঁর উপদেশ ছাত্রের জীবনের উপরে কোনও ক্রিয়া কর্বে না। বলহীন ধনুর্ব্বিদের তীর যেমন কারো চর্ম্মভেদ করে না, ঠিক্ তেমনি অব্রহ্মচারী আচার্য্যের উপদেশও শিষ্যের মর্ম্মভেদ কত্তে অক্ষম হয়।

জীবন-সাধনার দুইটী দিক্

শ্রীশ্রীবাবামণি তৎপরে বলিলেন,—জীবন-সাধনার দুইটী দিক আছে। একটী তার গভীরতার দিক, অপরটী তার ব্যাপকতার দিক্। মানুষ যখন ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিরলস ভাবে শ্রম স্বীকার কত্তে থাকে, তখন তার জীবন গভীরতা লাভ করে। আবার যখন সে দেশের, দশের ও সমাজের হিতসাধনের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তখন তার জীবন ব্যাপকতা লাভ করে। আত্ম সমাহিত যোগীদের অধিকাংশের

জীবন গভীর, পরার্থসেবীদের অধিকাংশের জীবন ব্যাপক। কিন্তু তাঁরই জীবন যথার্থ পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হ'য়েছে বলব, যাঁর জীবন গভীরতার ও চরমে পৌঁছেছে, ব্যাপকতারও পরাকাষ্ঠাকে লাভ ক'রেছে।

শিক্ষার লক্ষ্য

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষার লক্ষ্য যে কি হবে, তাই-নিয়ে মতভেদ হ'তে পারে। কেউ হয়ত বলবেন—ছাত্রের ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণকে প্রবুদ্ধ ক'রে দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য, এ'তে সমাজ বাঁচুক কি মরুক। কেউ হয়ত বলবেন, —ছাত্রের জীবনটা দ্বারা সমাজের হিত-সম্পাদনই শিক্ষার লক্ষ্য, এ'তে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিচার হয় ত' হোক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য এরকম একদেশদর্শী হ'তে পারে না। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজের বিরোধ না ঘটিয়ে যে শিক্ষা, সেইটাই হচ্ছে যথার্থ শিক্ষা। সমগ্র ভারত জুড়ে আজ সেই শিক্ষারই সম্প্রসারণ চাই। অথবা শুধু ভারতবর্ষের কথাই বা বলব কেন ? সমগ্র জগৎ জুড়েই চাই।

পপনকী আশ্রম,
২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৫

গৃহীর আশ্রম-বাস

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক জীবন-গঠন-কামী বিবাহিত যুবকের আশ্রম-বাসের প্রার্থনার উত্তরে পত্র লিখিলেন,—

"এখানে এক বৎসর থাকিবার পরে দেহ ও মনের পূর্ণ বল ও স্বস্থতা লাভের পরে তুমি পুনরায় গৃহে যাইবে এবং পিতা-

মাতা ও কন্যা-পত্নী প্রভৃতির প্রতি নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবশ্যই ব্রতী হইবে, এই প্রতিশ্রুতি যদি আমাকে দিতে পার, তবেই তোমার এখানে আসিবার অনুমতি রইল।"

স্বাস্থ্য-নিবাসের পরিকল্পনা

একজন কর্ম্মী পত্রখানার নকল রাখিতেছিলেন। সেই সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্রমের এক পার্শ্বে একটা স্বাস্থ্য-নিবাস খোলা প্রয়োজন। এখানকার জল হাওয়া কোনও কোনও রোগের পক্ষে যেমন চমৎকার, তাতে একটী স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠা কত্তে পার্লে সহস্র সহস্র লোকের বড় উপকার হবে। দরিদ্র অবস্থার লোকেরা সাধ্যের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা খরচ ক'রেও দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে উপযুক্ত সময় থাক্‌বার সুবিধা কত্তে পারেন না। তাঁদের বড়ই কষ্ট হয়।—এমনভাবে স্বাস্থ্য-নিবাসের বাড়ী-ঘর কত্তে হবে, যেন প্রত্যেকটী পরিবার অপর পরিবার থেকে একেবারে পৃথক্ থাকতে পারে। যার যার আহারীয় ব্যয়ের ব্যবস্থা আগন্তুকেরা নিজেরাই ক'রে নেবেন। সম্ভব হ'লে কারো কাছে বাড়ী-ভাড়া নেওয়া হবে না, নিলেও তা' অতি সামান্য হবে এবং যে কোনও ব্যক্তি সপরিবারে তিন মাস কাল স্বাস্থ্যাবাসে থাকতে পার্ব্বেন। আশ্রমের চিকিৎসক তাঁদের স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়তা কর্ব্বেন।

স্বাস্থ্যাবাসের মধ্য দিয়া শিক্ষার প্রসার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দৃষ্টি রাখতে হবে, সহরে লোক এসে এই স্বাস্থ্যাবাসে তরল-আমোদ-প্রিয়তা সৃষ্টি না কত্তে পারে। সাধারণতঃ সহুরে লোক হুজুগপ্রিয়, কপটতা-প্রবণ ও বাহ্য

চাক্‌চিক্যের প্রশ্রয়দাতা হয়। গ্রামদেশের সরলচিত্ত, অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের জন্যই এই স্বাস্থ্যাবাসটী হবে। তাঁরা এখানে যে তিন মাস থাক্‌বেন, সেই তিনটি মাস যাতে তাঁদের স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের, জ্ঞানার্জ্জনের ও নূতন নূতন কল্যাণময়ী চিন্তার পরিপুষ্টির মধ্য দিয়ে সানন্দে কেটে যায়, তার ব্যবস্থা আশ্রমবাসী ত্যাগী ও কর্ম্মীদের কত্তে হবে। যার জীবনে সমাজ-সেবার বুদ্ধি ছিল না, সে যেন সেই বুদ্ধিটীকে এখান থেকে উদ্দীপিত ক'রে নিয়ে ঘরে ফিরে। যার ভিতরে জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, সে যেন সেই আকাঙ্ক্ষার আগুনকে এখান থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে দেশে যায়। যার ভিতরে ভগবদ্‌ভক্তি ছিল না, জীবে প্রেম ছিল না, নামে রুচি ছিল না, সে যেন এইসব পরম সম্পদ এখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্য-নিবাসে বাস যেন তার দেহের স্বাস্থ্যেরই উন্নতি ক'রে ক্ষান্ত না হয়, তার মনকেও যেন উন্নত করে, স্বচ্ছ করে, সবল, অনাবিল ও সুন্দর করে। কলা বেচ্‌তে এসে সে যেন দেহ-রথে ব্রহ্মরূপী বামনকে দর্শন ক'রে যেতে পারে। এক ঢিলে যেন দুই পাখী মরে, কবুতর মারতে এসে সে যেন শ্যেনপক্ষীকেও শিকার কত্তে পারে।

কলিযুগে মুক্তির পথ

চান্দলা (ত্রিপুরা) নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীবাবামণিকে অনেক পূর্ব্বে পত্র-যোগে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। আশ্রমের কৃষি-কর্ম্মাদিতে ব্যস্ততাবশতঃ শ্রীশ্রীবাবামণি এতদিন সেই পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই। অদ্য সেই প্রশ্ন-সমূহের যে উত্তর তিনি প্রদান করিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

প্রশ্ন।—কলিকালে মানবের মুক্তি লাভের উপায় কি ?

উত্তর।—সর্ব্বকালেই মানব যে উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া আসিতেছেন, কলির মানবেরও মুক্তির তাহাই পথ। কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া যে মানবের মানবত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নহে। সর্ব্বকালেই মানব মুক্তিলাভ করিয়াছেন ভগবানকে ভালবাসিয়া, ভগবানের সত্তায় নিজ সত্তা বিসর্জ্জন দিয়া, ভগবানের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়া। কলির জীবকেও এই পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে।

গৃহীর সনাতন ধর্ম্ম

প্রশ্ন।—গৃহীর সনাতন-ধর্ম্ম কি ?

উত্তর।—সকল মানবের যাহা সনাতন ধর্ম্ম, গৃহীর সনাতন-ধর্ম্ম তাহা হইতে পৃথক্ কিছু নহে। মানব-মাত্রেরই সনাতন ধর্ম্ম আত্ম-সাক্ষাৎকার, অতএব গৃহীরও তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। গৃহী ও সন্ন্যাসীর পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পার্থক্য আছে বলিয়া উভয়ের সাধন-রীতিরও কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছে। অন্যথায় উভয়েরই সাধ্য এবং সিদ্ধি একই পরব্রহ্ম। তাঁহার শরণাগত হওয়া, তাঁহার সহিত নিজের অভেদসত্তা উপলব্ধি করা এবং ভগবৎ-প্রেরিত হইয়াই সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করা উভয়ের সনাতন ধর্ম্ম।

কুলধর্ম্ম

প্রশ্ন।—কুলধর্ম্ম কি ?

উত্তর।—(১) যে সকল ধর্ম্মাচারের অনুশীলনে কৌলিক বিশেষত্ব-সমূহ বংশানুক্রমে পরিপুষ্ট, পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইতে থাকে, তাঁহাদের সমষ্টিগত নাম কুলধর্ম্ম। বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী

জীবনে সর্ব্বদা বীর্য্য-ধারণ না করিলে, বিবাহিত জীবনে সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ ও সাধন-ভজন না করিলে, উভয়ে মিলিয়া একযোগে দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য দৃঢ়ব্রত না হইলে কৌলিক উৎকর্ষ-সমূহ পরিবর্দ্ধিত ও অপকর্ষ-সমূহ বিদূরিত করা যায় না। এইজন্য ইহারা কুল-ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায়। কুল-ধর্ম্ম বলিলে সাধারণ লোক নির্দ্দিষ্ট কুলের নির্দ্দিষ্ট প্রকারের দেবোপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতিই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু কুল-ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কৌলিক বিশেষত্ব-সংরক্ষক ধর্ম্মাচারের অনুশীলন।

(২) যে ধর্ম্মাচারের অনুশীলনে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হয়, তাহাই কুল-ধর্ম্ম। কি গৃহী, কি গৃহত্যাগী, এই কুলধর্ম্মই তাঁহাদের সকলের সনাতন ধর্ম্ম এবং সর্ব্ববিধ অবস্থায় একমাত্র আশ্রয়।

বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম

প্রশ্ন।—বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক এই তিনটি ধর্ম্ম-বিধানের মধ্যে কোনটি বর্ত্তমান যুগানুসারে প্রশস্ত ?

উত্তর।—কি বৈদিক, কি পৌরাণিক, কি তান্ত্রিক, কোনও প্রকারের ধর্ম্মবিধানেরই এমন একটা সীমা-রেখা নাই যে, একটুকু বৈদিক, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক, ইহার পরবর্ত্তীটুকু অবৈদিক, অপৌরাণিক বা অতান্ত্রিক। আবার, কি বৈদিক, কি পৌরাণিক, কি তান্ত্রিক, সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-বিধির মধ্যেই কতকগুলি বিধি সামান্য অর্থাৎ একই অবস্থায় অবিকৃত ভাবে আছে। ফলে ঐ সকল বিধির কোনটাকেই শুদ্ধ বৈদিক, শুদ্ধ পৌরাণিক বা শুদ্ধ

তান্ত্রিক বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মবিধিরই মূল তত্ত্ব ও মূলসূত্র এক, যত কিছু বিভেদ শুধু শাখায় আর প্রশাখায়। এই সকল বিভেদের দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মবিধির বৈশিষ্ট্য মাত্র প্রকটিত হইতেছে। রাম, শ্যাম ও যদু তিনজনে তিনটি পৃথক মূর্ত্তি হইলেও যেমন তিনজনেই মানুষ, ঠিক তেমনি বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক এই ত্রিবিধ ধর্ম্মবিধির বিশিষ্ট রূপ পৃথক্ পৃথক্ হইলেও তিনটিই সনাতন ধর্ম্ম। অর্থাৎ একই সনাতন ধর্ম্ম কোথাও বৈদিক পোষাক, কোথাও পৌরাণিক পরিচ্ছদ, কোথাও তান্ত্রিক বেশ পরিয়া রহিয়াছেন। পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন-হেতু ধর্ম্মের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যে কোনও ধর্ম্মের বিধিই বর্ত্তমান যুগে প্রশস্ত। তবে যাহার গায়ে বৈদিক যুগের যজ্ঞধূমদিগ্ধ হোমগন্ধি আল্‌খাল্লা লাগে না, তাহার পক্ষে উহা না পরিয়া, যাহা সহজে গায়ে লাগে, তাহাই পরা উচিত। যাহার গায়ে পৌরাণিক যুগের মণিরত্ন-খচিত কল্পনা-বিলসিত রাজচ্ছদ শোভে না, তাহার পক্ষে উহা পরিহার করাই সঙ্গত। যাহার গায়ে পশ্বাচার-সঙ্কুল বামাচার-ব্যাকুল স্ত্রী-সঙ্গ-সমাকুল তান্ত্রিক বেশভূষা সাজে না, তাহার পক্ষে উহা সযত্নে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। এই স্থানে বর্জ্জন হইতেছে বাহিরের আচারের, ধর্ম্মের নিগূঢ় সাধন সর্ব্বাবস্থাতেই এক রহিয়াছে।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বন্দ্বের কারণ

যিনি এই প্রশ্নোত্তরের নকল রাখিতেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত দ্বন্দ্ব কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দ্বন্দ্বের কারণ অজ্ঞানতা।

অজ্ঞানতা নাশের উপায়

প্রশ্ন।—অজ্ঞানতা-নাশের উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তীব্র, একাগ্র, একান্ত সাধন। পাপ বল, অধর্ম্ম বল, অজ্ঞানতা বল, আর অহঙ্কার বল, সব-কিছু অকল্যাণকে ধ্বংস করার নির্ভুল ও অমোঘ উপায় সাধন। সাধন নীচকে উচ্চে তোলে, মূর্খকে জ্ঞানী করে, স্বার্থান্ধকে পরার্থপর করে, অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করে। সাধন শুষ্ক হৃদয় দ্রবীভূত করে, দগ্ধ হৃদয় জুড়ায়, আসক্তি প্রশমিত করে। সাধন সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি, সর্ব্বধর্ম্মে সমবুদ্ধি, সর্ব্বকর্ম্মে সমোদ্যম, সর্ব্বচেষ্টায় সমসাফল্য দান করে। সাধনের মাহাত্ম্য এক যুগ ব'সে কীর্ত্তন কর্ল্লেও ফুরায় না।

ভারতের ভাগ্য-নির্ণয়ে সাধন-শক্তি

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি নিজেই বলিতে লাগিলেন,—ভারতের ভবিষ্যৎ-ভাগ্যের নির্ণয়ে সাধন-শক্তির স্থান কোথায়, তা আজ চ'খে দেখা যাবে না। কিন্তু তোরা সাধন ক'রে জীবন গঠন কর, দেখ্‌বি, সে জীবনের বিকাশ কত মুখে হয়, কত দিকে হয়। সাধনের বলে তোরা সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার আকর হ'য়ে নে। পাঁচতলা দালানেরও ভিত্তিটা মাটির নীচেই থাকে। সাধন-শক্তি এই জাতীয়-জীবন-রূপী বিরাট প্রাসাদের ভিত্তি। ভিত্তি যত শক্ত হবে, প্রাসাদ তত উঁচু হবে, তত শক্ত হবে। ভিত্তিতে যদি ফাঁকি থাকে, প্রাসাদ গড়া কঠিন হবে।

মনের কুচিন্তা ও দেহের ক্ষতি

রাত্রিতে আশ্রমের একজন কর্ম্মী-ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, —মনের মধ্যে কুচিন্তা করিলে দেহের ক্ষতি হয় কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজন নরহন্তাকে তোমার গৃহে আশ্রয় দিয়ে অবাধে নরহত্যা কত্তে দিলে তোমার অপরাধ হবে না কি ? নরহত্যার সাহায্য ক'রেছ ব'লে তোমাকেও জেলে যেতে হবে। ঠিক তেম্‌নি দেহের মধ্যে ব'সে যদি মনকে কুচিন্তা কত্তে দেওয়া হয়, তা হ'লে মনের সেই অপকার্য্যের সহায়তাকারী ব'লে দেহকে শাস্তি দেওয়া হবে।

পুপুন্‌কী আশ্রম,

২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৫

ধর্ম্ম ও স্বদেশ

অদ্য জনৈক জিজ্ঞাসুর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধর্ম্ম-সাধনা জীবকে মুক্তির পানে টানিয়া নেয়, বন্ধন-বৃদ্ধি উহার ফল নহে। ধর্ম্ম-সাধনায় যখন বন্ধন-বৃদ্ধি ঘটিবে, তখন বুঝিতে হইবে, সম্ভবতঃ ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মেরই অনুশীলন চলিতেছে। স্বাধীনতার সাধন স্বদেশ-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। সাধন-ধর্ম্ম এই স্বদেশ-ধর্ম্মের বিরোধী নহে। যেখানে সাধন-ধর্ম্ম স্বদেশ-ধর্ম্মের বিরোধিতা করিবে, স্বদেশ-সেবায় বাধা দিবে, অকপট পরহিত-বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত এবং ম্লান করিবে, বুঝিতে হইবে, সাধন-ধর্ম্ম সেখানে মিথ্যার অনুসরণ করিতেছে। আমি যে সাধন-ধর্ম্মের সেবা করি, তাহার কোথাও এক কণা দেশ-দ্রোহিতার স্থান নেই। ইহা রাজদ্রোহেরও প্ররোচক নহে।"

বিবাহ ও ভগবৎ-সাধনা

কুমিল্লা-নিবাসী জনৈক কলেজের ছাত্রের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিবাহ করিলেই মানুষ বদ্ধ হইয়া যায় না, যদি ধর্ম্ম-পত্নী যথার্থই সহকারিণী হন। যেখানে স্বামি-পত্নীর ধর্ম্মার্থে পূর্ণ মিলন সাধিত হয়, সেখানে বিবাহ বন্ধন নহে,—মোক্ষের দ্বার; সেখানে সন্তান-জনন ভোগ-লালসার পরিতৃপ্তি নহে,—যৌগিক সাধন; সেখানে পুত্র-কন্যার আবির্ভাব দারিদ্র্যের বৃদ্ধি নহে,—দারিদ্র্যের দলন। নিজের বাহুতে যদি সাধন-শক্তির সঞ্চার ঘটাইতে পার, তাহা হইলে সহধর্ম্মিণীর বাহুতেও সহজেই তাহা সঞ্চারিত করিতে পারিবে। তখন তোমরা দুর্ব্বলতার দাস না হইয়া, প্রবৃত্তির দাস না হইয়া, আত্মজিৎ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংসারী জীবনের যথার্থ মধু আহরণে সমর্থ হইবে। বিবাহিত জীবনের প্রতি আমি তোমাকে কোনও প্রেরণা দিতেছি না, সন্ন্যাসের প্রতিও নহে। প্রেরণা দিতে চাহিতেছি সাধনের প্রতি। প্রচ্ছন্ন ভোগ-সংস্কার যাহাদিগকে অন্য একটা সাধু উপলক্ষ্য দেখাইয়া বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিতে গিয়াছে, তাহারা অনেকে শুধু সাধনের বলে সহসা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বিবাহ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সঙ্কল্পিত দাম্পত্য জীবনের পথ নিমেষের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহাদের পক্ষে বিবাহিত হইয়া পবিত্র জীবন যাপন করা একান্তই অসম্ভব ছিল, এমন অনেকে সাধনের বলে অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিয়াছে এবং প্রতিক্ষণ রমণীসংস্পর্শে অবস্থান করিয়াও বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক রহিয়াছে। এইগুলি সবই সত্য ঘটনার সাক্ষ্যে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত। তাই, তোমার নিকটে আমার প্রেরণা শুধু সাধনের,—সংসারীর বা সন্ন্যাসের নহে। একপাল সন্ন্যাসী সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারিলেই জগৎ উদ্ধার করিয়া গেলাম, এমন সঙ্কীর্ণ ও অসত্য মতবাদ আমি কখনো কল্পনায়ও পোষণ করি না। চাই—দেশের সেবক, জগতের সেবক,—এক্ষণে সে সংসারীই হৌক আর সন্ন্যাসীই হৌক, তোমাকে জগতের সেবক হইতে হইবে এবং তজ্জন্যই সর্ব্বতোভাবে আত্ম-গঠন করিতে হইবে। এই আত্ম-গঠনের মূল ভিত্তি হইতেছে সাধন। বিবাহ যদি কর, তবে এই চেষ্টা যুগপৎ স্বামী ও পত্নী উভয়ের দিক হইতেই হওয়া চাই। যাহারা জগতের সেবা করিবার কামনা করে, তাহারা যদি দার-পরিগ্রহ করে, তবে, নিজ পত্নীকে আত্ম-গঠনের পথে, আত্মোৎসর্গের পথে টানিয়া আনিতে দায়ী, পরার্থ ও পরমার্থের প্রতি তাহাকে আকৃষ্ট করিতে বাধ্য। বিবাহিত জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মীর শুধু এইটুকুই বিশেষত্ব।"

গর্ভপাতে কর্ত্তব্য

জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীর গর্ভপাতের সংবাদে শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাকে নিম্নোক্তরূপ এক পত্র লিখিলেন। যথা,—

"একবার গর্ভপাত হইলে এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত স্বামী ও স্ত্রীর একত্র বাস করা নিষিদ্ধ বলিয়া জানিবে। এই এক বৎসরকাল উভয়েরই কর্ত্তব্য পৃথক্ স্থানে থাকিয়া নিজ নিজ শরীরের উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা যাবতীয় রোগ হইতে নিরাময় হওয়া, ব্যায়াম অনুশীলনের দ্বারা দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, বিশেষভাবে জননাঙ্গ-সমূহের, সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-সাধন করা এবং নিবিড় ভগবৎ-সাধনার দ্বারা মন, বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির উপর পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই সময়ে জগৎ-কল্যাণ-সঙ্কল্প লইয়া উপযুক্ত আশ্রমাদিতে বাস করার চেষ্টাই সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। মহিলাদের পক্ষে সুখ-বাস্তব্য আশ্রমাদি এখনও

দেশমধ্যে পরিদৃষ্ট হইতেছে না, কিন্তু তোমাদের ন্যায় অবস্থায় যাহারা প্রতিনিয়ত পড়িতেছে, তাহারা যদি অন্তরে অন্তরে ইহার প্রয়োজনীয়তাটুকু মাত্র অনুভব করে, তাহা হইলে তোমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষাই শক্তিমান জগদ্ধিতৈষীদিগকে বিচলিত করিয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কারণ-স্বরূপ হইবে।''

বিবাহের পূর্ব্বের কর্ত্তব্য

এই পত্রখানা লেখা হইয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শরীর-পরীক্ষা ও চিকিৎসা হওয়া উচিত। এই বিষয়ে বিবাহার্থীদেরও বিশেষ আগ্রহ থাকা কর্ত্তব্য। তাদের অভিভাবকদের কথা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রদায়-বিস্তার ও তামসিকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি ঢাকা-নিবাসী জনৈক ভক্ত-যুবকের নিকটে লিখিলেন,—

''জগতের কল্যাণ-মুখিনী উন্নতিচিন্তাসমূহ যদি তোমার ভিতরে আসিয়া সত্য সত্যই পুঞ্জীভূত হয়, তাহা হইলে জানিও, শ্রেষ্ঠ উপাদানে গঠিত প্রত্যেকটী মানব-সন্তান চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত তোমার বুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে। সম্প্রদায়-বিস্তার কখনও ধর্ম্ম-সাধনার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। পরন্তু অকপট সাধনার ইহা এক স্বাভাবিক ফল যে, আপনা-আপনি আসিয়া উৎকৃষ্ট-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মানব-তনয়েরা তোমার সহিত সম্মিলিত হইবে, তোমার ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে, তোমার পথের পথিক হইবে, তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য মৃত্যু-সঙ্কল্প

করিবে। যে ধর্ম্মের প্রচার দালালের বাক্‌চাতুর্য্যের উপরে নির্ভর করে, তাহা মরণশীল, ক্ষণস্থায়ী, একান্ত ভঙ্গুর ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম অকপট সাধকের জীবনব্যাপী প্রাণপাত শ্রমের দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা কখনও কোনও প্রকার প্রচার-চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না, আচার্য্যের জীবনের প্রত্যেকটী আচরণ দেখিয়াই এবং তাঁহার সাত্ত্বিক মনের পবিত্র চিন্তার অব্যর্থ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই সহস্র সহস্র নর-নারী নিজেদের ইচ্ছার অজ্ঞাতসারে আসিয়া সিদ্ধ-সাধকের চরণতলে মাথা বিকায়। মনে রাখিও, সাম্প্রদায়িকতার হলাহল পান না করিবার জন্যই তোমরা গৃহীত-ব্রত রহিয়াছ,—জগতের সকলকে আনিয়া এক গুরুর চেলা বানাইবার জন্য যেন-তেন-প্রকারেণ প্রচেষ্টা পরিচালিত করিবার জন্যই আচার্য্যের পাদস্পর্শ লাভ কর নাই। তোমরা যে গুরুর আশীর্ব্বাদ পাইয়াছ, তাহার একমাত্র প্রয়োজনই এই ছিল যে, সর্ব্বপ্রকার তামসিকতার পরিবন্ধন হইতে তোমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। বাগ্‌বাহুল্যের বিস্তার করিয়া স্বকীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পরিধি-বর্দ্ধন অধিকাংশ স্থলেই এক অতিশয় নিকৃষ্ট প্রয়াস এবং সর্ব্বদা মনে রাখিও, শতকরা নব্বইটী স্থলে এই প্রয়াসের ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে—তামসিকতায়। হে গুরু-কৃপা-লব্ধ জগৎ-সেবক, এই তামসিকতা তোমাকে পরিহার করিতে হইবে।''

দীক্ষা-প্রার্থীর প্রতি

ঢাকা লক্ষ্মীবাজার হইতে জগন্নাথ কলেজের একটী ছাত্র শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট হইতে দীক্ষা পাইবার জন্য আগ্রহ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তদুত্তরে লিখিলেন,—

"দীক্ষা ত' বাবা দিলেই হইল না। দীক্ষা পাইবার জন্য সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা যার জাগ্রত হইয়াছে, দীক্ষা একমাত্র তারই হওয়া উচিত। কাল-প্রতীক্ষায় যার সহিষ্ণুতার প্রমাণ হয়, মানুষ তাহাকে দীক্ষা না দিলেও ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া তাহাকে দীক্ষা দিয়া যান। দীক্ষার জন্য জগদ্গুরু ভগবানের পায়ে ব্যাকুলতা জানাও, মানুষ-গুরু ত' বাবা তাঁর দাসানুদাস।"

পুপুনকী আশ্রম,
২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৫

চরিত্র-পন্থী ও রাজনীতি-পন্থী

সন্ধ্যায় না হইয়া অদ্য প্রাতঃকালেই অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্র-পন্থীরা চান, আগে চরিত্রকে গঠন কর, তারপরে পারো ত' অন্য কাজে হাত দিও ; চরিত্রই প্রধান, এর জন্যেই জীবন-পণ কত্তে হবে। রাজনীতি-পন্থীরা চান,—চরিত্র তোমার যতটুকু গঠিত বা অগঠিত আছে, তা' নিয়েই তুমি দেশের সেবায় লেগে যাও, দেশ-সেবা-কার্য্যে আত্মদান করার ফলে চরিত্রের যা উন্নতি আপনা-আপনিই হ'তে পারে, সেইটুকুই যথেষ্ট, না হয় ত' তাতেও ক্ষতি নেই—কেননা, আগে চাই স্বরাজ। চরিত্র-পন্থীরা চান,—প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনটা গভীরতা প্রাপ্ত হোক্; রাজনীতি-পন্থীরা চান—প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনটা ব্যাপকতা প্রাপ্ত হোক্। চরিত্র-পন্থী প্রথমেই উপদেশ করেন—অরতি জনসংসদি, সঙ্গ-নির্ব্বাচনে সাবধান, যার-তার সংসর্গে বাস কর্ব্বে না, যার-তার সঙ্গে পরিচয়-সৃষ্টি কর্ব্বে না, নিজেকে একটা সুগভীর সংযমের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ ক'রে রেখে চল্‌বে, তোমার আত্ম-গঠন-সঙ্কল্পকে এমন বজ্রদৃঢ় কর্ব্বে, যেন কু-বাসনার তরঙ্গ এসে এই লৌহ-প্রাচীরে ঠেকে শত খণ্ড হ'য়ে চূর্ণিত হ'য়ে ফিরে যায়। রাজনীতি-পন্থী প্রথমেই উপদেশ করেন,—সবার কাছে যাও, সবার সঙ্গে মিশ, সবাইকে কোল দাও, সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ সৃষ্টি কর, জাতীয় স্বাধীনতা-লাভের অগ্নিময়ী বাণী সুস্থানে ছড়াও, কুস্থানে ছড়াও, গৃহে ছড়াও, বাইরে ছড়াও, নিজের আত্মগঠন বা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিও না, সবার প্রাণে স্বাধীনতা-স্পৃহার জ্বলন্ত বহ্নি ছড়িয়ে দেবার জন্যে নিজের বুকের পাঁজরে হাসিমুখে আগুন ধরিয়ে দাও,—নিজেকে অসংযমে পুড়ে মরতে হয়, মর, অব্রহ্মচর্য্যের হলাহলে ডুবে যেতে হয়, ডোব, তবু সর্ব্বাগ্রে জাগাও দেশকে, সর্ব্বাগ্রে উদ্বুদ্ধ কর জাতিকে। এইখানে চরিত্র-পন্থীর সাথে রাজনীতি-পন্থীর কর্ম্ম-প্রণালীর পার্থক্য। চরিত্র-পন্থী চরিত্রকেই একমাত্র বস্তু ব'লে গণ্য করেন, কিন্তু এই চরিত্রের দুর্ভেদ্যতা প্রমাণের জন্য উপযোগী বিরোধিতার মধ্যে ফেলে তাকে সহ্যমত ঘা দিয়ে শক্ত ক'রে নেওয়ার জন্য যে আবার কর্ম্ম-ক্ষেত্র চাই, সে কথা বিস্মৃত হন আবার রাজনীতি-পন্থী জাতীয় স্বাধীনতার কথাকেই একমাত্র গ্রাহ্য ব'লে মনে করেন এবং এর জন্য যে চরিত্র-বল-মণ্ডিত সংযম-শক্তি-সম্পন্ন, অক্ষুণ্ণ-বীর্য্য, অক্লান্ত-ধৈর্য্য কর্ম্মীদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তা' বিস্মৃত হ'য়ে যান। তাই, উভয়ের আন্দোলনই হয় অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতাকে দূর কত্তে হবে উভয় কর্ম্ম-প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে—এবং সামঞ্জস্য স্থাপনকালে এই কথাটুকু মনে রাখ্‌তে হবে যে, যে জীবন গভীরতা অর্জ্জন করে নি, তার ব্যাপকতা নিতান্ত অস্থায়ী। তোমাকে হাজার বিঘা জমি চাষ

কত্তে দেওয়া হ'ল, আর তুমি দশ বিশ ত্রিশ বিঘা জমি ছেড়ে ছেড়ে এক কাঠা দুকাঠা ক'রে জমিতে আলু, কফি, পটোল ও বেগুনের চাষ কর্ল্লে। এর নাম ব্যাপকতা। আর, হাজার বিঘার পানে না তাকিয়ে তুমি দু' এক বিঘা জমিতে এমন কৃষিকার্য্যই কর্ল্লে যে, তুমি তা' থেকে যা ফসল সংগ্রহ কর্ল্লে, পঞ্চাশ বিঘা জমি থেকেও সাধারণ চাষা তা' সংগ্রহ কত্তে পাত্ত না, আর হাজার বৈজ্ঞানিকের মাথা খাটলেও তার চেয়ে বেশী ফসল ঐ জমিটুকু থেকে কেউ কখনো আদায় কত্তে পাত্ত না। এর নাম হচ্ছে গভীরতা। চরিত্রের উন্মেষণ বা আত্মগঠন জীবন-কৃষির গভীরতার দিক্, আর, জন-সমাজের সেবায় আত্মদান করা হচ্ছে জীবন-কৃষির ব্যাপকতার দিক। ব্যাপকতাকে ও গভীরতাকে এক ঠাঁই মিলাতে হবে, তবেই হবে অসাধ্য-সাধন, তবেই হবে অধঃপতিত দেশের অভ্যুদয়।

আচার্য্যের ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব ও শিবত্ব

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষার প্রমাণ তিনটী। প্রথমতঃ শিক্ষার মধ্যে সৃষ্টির ক্ষমতা থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার মধ্যে পুষ্টির সামর্থ্য থাকা চাই, আর তৃতীয়তঃ শিক্ষার মধ্যে ধ্বংসের শক্তি থাকা চাই। অর্থাৎ শিক্ষককে ব্রহ্মা হ'তে হবে, বিষ্ণু হ'তে হবে, শিব হ'তে হবে। গুরু-গীতায় আছে,—গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু ও গুরুরেব মহেশ্বরঃ। মানুষ মাত্রেরই মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়, তার মধ্যে যেগুলি শিষ্যের মধ্যে নেই, আচার্য্যকে সেগুলি নিজের শিক্ষার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে। এখানে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মা। শিষ্যের ভিতরে যে সকল সদ্‌গুণ বিশেষভাবে স্ফুটনোম্মুখ, সেই সকল বিশিষ্ট

গুণগুলিকে শিক্ষার শক্তিতে পরিপুষ্ট এবং পূর্ণ বিকশিত কত্তে হবে, এই সদ্‌গুণগুলি যাতে বিরুদ্ধ চিন্তার অপঘাত পেয়ে অকালমৃত্যুকে না বরণ করে, দিন দিন যাতে অনুকূল চিন্তা, চর্চ্চা ও চেষ্টার সংস্পর্শ পেয়ে ক্রমবিবর্দ্ধমান হ'তে পারে, আচার্য্যকে তার জন্য নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে সুকৌশলে প্রয়োগ কত্তে হবে। এখানে তিনি হচ্ছেন বিষ্ণু। শিষ্যের মধ্যে যে সকল অসদ্‌গুণ আছে, সেগুলির বিকাশ ঘট্‌লে শিষ্যের নিজেরও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি, যেগুলির অস্তিত্ব শিষ্যের পূর্ণতার বিঘ্ন, যেগুলি শিষ্যের মনুষ্যত্বের শত্রু, সেইগুলিকে ধ্বংসও কত্তে হবে আচার্য্যকে। এখানে তিনি হচ্ছেন ত্রিশূল-ডমরুধারী সদাশিব। যিনি একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ আচার্য্য।

সন্ন্যাস-লাভের যোগ্যতা

বিগত ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীবাবামণি কুশমা (বৈদ্যনাথ ধাম) শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্তের প্রস্তাবিত ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ১০ ফাল্গুন তারিখে তিনি ময়মনসিংহ-নিবাসী একটী সন্ন্যাস-প্রার্থী যুবকের নিকট যে পত্র লিখেন, অদ্য তাহার নকল পাওয়া গেল। নিম্নে তাহা অনুলিখিত হইল। যথা,—

"সংসার যদি বাবা ছাড়িতেই হয়, যা' তা' করিয়া ছাড়িবে কেন ? সংসারকে ছাড়িবার সময় সংসারকে যেন বলিতে পার যে, জীবন-সংগ্রামে টিকিতে পারিবে না বলিয়াই তুমি দায়ে ঠেকিয়া বৈরাগী হইতেছ না, পরন্তু সংসারের বুকে বসিয়া নির্ব্বিবাদে তাহার দাড়ী উপ্‌ড়াইবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তুমি আদর্শের প্রেরণায়ই সংসারকে ছাড়িয়া যাইতেছ। প্রতিষ্ঠালাভে

অক্ষমতা যদি সন্ন্যাসের হেতু হয়, তবে সে সন্ন্যাস অলস ও কর্ম্মকুণ্ঠদের জন্য, জগৎ-কর্ম্মে বক্ষরক্তদানকারীদের জন্য নয়।"

নাম-সাধনা ও ইন্দ্রিয়-সংযম

ত্রিপুরা জেলা-নিবাসী জনৈক ভক্ত-যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিয়ত কর্ম্মশীলতা, ভগবৎ সাধনা, দৈহিক-শক্তির চর্চ্চা, দেহের অনিত্যতা-চিন্তা এবং নিঃস্বার্থ পরোপকার-বুদ্ধিই যাবতীয় রিপুর উত্তেজনা-প্রশমনের মহৌষধ। এতন্মধ্যে নাম-সেবাই সর্ব্বপ্রধান। মন চঞ্চল হইতেছে, মনের স্বভাবে। এই জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হইও না। কেন না, মনকে জয় করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে। মন যতই চঞ্চল হউক, ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তুমি নিয়ত নাম-সেবা দ্বারা শুধু শক্তিই আহরণ করিতে থাক। কাম ও নাম একসঙ্গে দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না, পরিশেষে নামেরই জয় হয়। কোনও প্রকার দ্বিধা বা সঙ্কোচকে মনের মধ্যে অনুমাত্রও স্থান না দিয়া নিরলস উদ্যম সহকারে নাম-সাধনে ব্রতী হও। ইহারই ফলে মনের সেই সামর্থ্য উপজাত হইবে, যাহাতে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিলেও চিত্তের বৈরাগ্যভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। অথচ প্রলোভন-সঙ্কুল কোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিলেও চিত্ত-সংযমের তিলমাত্র চ্যুতি ঘটিবে না। বিদ্রোহী দেহকে শাসন করিবার জন্য জড়পদার্থ-নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন, কিন্তু মনকে শাসন করিতে হইলে দিব্যশক্তিশালী চৈতন্যময়ের সর্ব্বশক্তিমান নামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নাম-সাধনাই তোমার সকল দুঃখের বিনাশক, সকল সন্তাপের অপহারক, সকল চিত্ত-তাপের প্রশমক। ভয়,

ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও অনাস্থাকে শত যোজন দূরে নিক্ষেপ কর। অপূর্ব্ব পৌরুষ-সহকারে বজ্রনাদে বল,—'আমি অমৃতের পুত্র, আমি ব্রহ্মময়ের সন্তান, আমি সিদ্ধ-সাধনার অধিকারী, কাম-মোহ আমার চরণের দাস, আমি কখনও তাহাদের দাসত্ব করিব না।' মন, প্রাণ আত্মায় মিলাইয়া এই কথা বল। অনুভব করিতে চেষ্টা কর, সত্যই তুমি অমৃতের পুত্র, সত্যই তুমি ব্রহ্ম-কৃপার অধিকারী, সত্যই তুমি কাম-মোহের অতীত। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তুমি হতাশ হইও না, একবারের জন্যও আত্ম-অবিশ্বাস করিও না। সঙ্কল্প কর, রিপুকে তুমি জয় করিবেই, দুর্দ্দমনীয় রিপুকে তুমি পরাভূত করিবেই, কাম-কুহকের অনর্থমূল জাল-প্রসার তুমি জ্ঞানের অসি দিয়া এবং সাধনের ত্রিশূলাঘাতে বিদীর্ণ ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবেই। জাগ আজ সিংহ-শাবক, কেশরীর বিক্রমে জাগ। জাগ আজ বীরেন্দ্র-তিলক, তোমার ব্রহ্মবীর্য্যের ত্রিলোক-স্তম্ভনকারী স্ফূর্ত্তির অবতারণা কর।"

ভারতের মুক্তির পথ

রাত্রিতে আহারান্তে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—সমগ্র ভারত যে এক, প্রদেশে প্রদেশে বৈচিত্র্য থাকলেও সকলকে নিয়েই যে অখণ্ড-ভারতের অস্তিত্ব, এই অনুভূতিটুকু সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণে যত স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে, ততই দেশ সত্যিকার মুক্তির দিকে অগ্রসর হবে। ভারতের এই অখণ্ডত্ব বা অঙ্গাঙ্গি-ভাবের বোধকে জাগিয়ে তোলাই দেশ-সাধনার সকলের গোড়ার কথা। তোমার গায়ে একটা ব্যথা লাগ্‌লে হাত সেখানে যায় না ? ঠিক তেম্‌নি বাংলায় একটা ব্যথা জাগ্‌লে বোম্বাইকে সেই ব্যথা

নিজের ব'লে অনুভব কত্তে হবে, মাদ্রাজে একটা ব্যথা জাগ্‌লে পাঞ্জাবকে তার জন্য অধীর হ'তে হবে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সহানুভূতির যে ঐক্য, সমবেদনার যে যোগ, তা-ই হবে ভারতের মুক্তির প্রথম আশ্রয়।

অখণ্ড-ভারত-স্থাপনে বাঙ্গালী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই অখণ্ডত্ব স্থাপনে বাঙ্গালীর অনেক কর্ব্বার রয়েছে। প্রদেশে প্রদেশে বিদ্বেষ, ধর্ম্মে ধর্ম্মে কলহ, ভাষায় ভাষায় অনৈক্য সব দূর কর্ব্বার কৌশল বাঙ্গালীকে আয়ত্ত কত্তে হবে। ভারতের একটা প্রদেশে নবজীবনের সঞ্চারণা অনুভব হ'লে নিমেষের মধ্যে যাতে তা' প্রত্যেক প্রদেশ নিজের মধ্যে সন্দীপিত কর্ব্বার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়, তেমন অঙ্গাঙ্গিত্বের সৃষ্টি বাঙ্গালীকেই গিয়ে কত্তে হবে। বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কেউ তা' পারে, ভাল কথা, কিন্তু যদি না পারে, যদি না চায়, তবে বাঙ্গালীকেই এ কঠোর দায় স্কন্ধে বহন কত্তে হবে। প্রাদেশিক বিদ্বেষকে উন্নত আদর্শের মোহন-স্পর্শে স্তম্ভিত ক'রে দিতে হবে। আর যদি অন্য কোনও প্রদেশ এ মহাকার্য্যে ব্রতী হয়, তা' হলে প্রতিযোগিতা-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে বাঙ্গালীকে তার সহযোগিতা কত্তে হবে, তার বাহুতে নিজ বাহুবল দিতে হবে, তার হৃদয়ে নিজ হৃদয়ের প্রেম ঢালতে হবে, তার কঠোর শ্রমের ঘর্ম্মবিন্দুর সাথে নিজ ঘর্ম্মবিন্দু যুক্ত কত্তে হবে।

চরিত্র-বলের আবশ্যকতা

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই অখণ্ডত্ব বা ঐক্য জাগিয়ে তোলবার উপায় চালাকী নয়, উপায় হচ্ছে চরিত্র-বল-

সম্পন্ন, সাধন-শক্তি-দীপ্ত ত্যাগীর আত্মোৎসর্গ। আকবর হিন্দু-মুসলমানকে এক কত্তে চেয়েছিলেন, 'এলাহী' ধর্ম্ম বের করেছিলেন, কিন্তু পথের ফকির কবীর-নানক এক এক জন ফকির হয়েও যা' পার্ল্লেন, নিজে সমগ্র হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হ'য়েও আকবর তা' পার্ল্লেন না। হিন্দু-মুসলমানও এক হ'ল না, এলাহি ধর্ম্মও চল্‌ল না। জাতীয় জীবনের উন্নতির মূলে চাই চরিত্রের কঠোর দৃঢ়তা, সাধনে অসীম নিষ্ঠা, আর চিত্তবিক্ষেপকারক সহস্র প্রকারের অভিনিবেশ থেকে সম্যক্ প্রত্যাহার।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৫

সমাজ-সেবার আন্দোলন-পরিচালনের ধারা

অধ্যাপনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশোন্নতি-মূলক আন্দোলনগুলিকে অত্যধিক উচ্ছ্বাস থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যের মানেই হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী তীব্র অবসাদ। যারা অধিক মেতে উঠে, তারাই অধিক অবসন্ন হয়, পরিণামে তারাই কর্ম্মে অক্ষম হয় সর্ব্বাগ্রে। এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম যে, যখনি মানুষ একটা বিষয় নিয়ে অত্যধিক উত্তেজিত হয়, তখনি সে আর একটা গুরুতর বিষয়ে একেবারে দৃষ্টিহীন হ'য়ে পড়ে। এতে সামঞ্জস্যের হানি ঘটে, জাতীয় উন্নতির পূর্ণতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অধুনা-প্রচলিত কুশিক্ষার স্বরূপ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অশিক্ষিতা মায়েরা যেমন ভাবে ভেবে থাকে যে, ছেলেটার রোগাটে শরীর শুধু বড় বড়

গ্রাসে কতকগুলি ভাত গেলাতে পার্লেই পুষ্টি হ'য়ে যাবে, অনভিজ্ঞ শিক্ষাচার্য্যেরাও তেমন ভাবেন যে, বিজ্ঞানের পর বিজ্ঞান, বিষয়ের পর বিষয় ছেলেদের কণ্ঠস্থ করাতে পার্লেই তারা মহাজ্ঞানী হ'য়ে পড়বে। কিন্তু ফল বরং হয় উল্টো। সাধ্যের অতিরিক্ত খাওয়াতে গেলে ছেলের যকৃতের দোষ হবেই হবে। শিক্ষক মশাইরাও তেমনি বিদ্যার বস্তাগুলির মুখ খুলে খুলে ছাত্রদের গলার ভিতরে পুরতে থাকেন। ছাত্র যদি বলে, "মশাই, আর পেটে আট্‌ছে না," তবু তিনি শাবল দিয়ে গাঁতিয়ে গাঁতিয়ে বিদ্যা ঢুকাতে থাকেন। এতে পেট ফেটেই তার প্রাণ যাবে কিনা, দম্‌কা-দাস্তেই তার ইহলীলার খেলা ছুটবে কিনা, সেইদিকে দৃষ্টি নেই। এই যে শিক্ষা, এর মত নির্ব্বংশকর জিনিষ আর দুনিয়াতে কিছুই নেই। এই মারাত্মক শিক্ষাকে নির্ব্বাসন দিতে হবে।

বর্ত্তমান শিক্ষার নির্ব্বাসনের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু নির্ব্বাসন দিব বল্লেই ত' শিক্ষার নির্ব্বাসন হচ্ছে না! এর জন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন কত্তে হবে এবং তার সাধ্যমত প্রয়োগও কত্তে হবে। বর্ত্তমান শিক্ষার নকলে "জাতীয় বিদ্যালয়" নামধারী কতকগুলি মূল্যহীন ভূয়ো প্রতিষ্ঠান গড়্‌লেও ঠিক সদুপায় অবলম্বন করা হবে না। একদল ত্যাগব্রতী সুশিক্ষিত চরিত্রবান্ স্বদেশপ্রেমিককে বক্ষভরা প্রেম আর মস্তিষ্কভরা জ্ঞান নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হবে। জ্ঞানানুশীলন-সম্পর্কিত নানাভাবের ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তাদের গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রাণখোলা সরলতা সহকারে মিশতে হবে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে অন্বেষণ কত্তে হবে, বর্ত্তমান

শিক্ষার প্রতি এই যে সর্ব্বজনীন অন্ধ অনুরাগ, এই যে অবারিত আকর্ষণ, তার মূল হেতু কি ? এর কারণ কি বিদেশীদের শাসন? এর কারণ কি মিশনারীদের প্রচার ? এর কারণ কি জাতির চিন্তাশীলতার অভাব ? এর কারণ কি জাতীয় দারিদ্র্য —না, এর কারণ অপর কিছু ? রোগ আরোগ্য কত্তে হলে আগে চাই রোগ-নির্ণয়, ঔষধ-ব্যবস্থা তারপরে।

বংশানুক্রমিক বুদ্ধির চর্চ্চা

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—য়ুরোপে বুদ্ধির উৎকর্ষ-মূলক শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে চিন্তাশীল লোকেরা তীব্র আন্দোলন উপস্থিত কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছেন। তাঁরা বলছেন,—বুদ্ধির জগতে যে যত বেশী উন্নতিলাভ কচ্ছে, তার পরমায়ু তত দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, তার বংশজাত স্ত্রীলোকদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব তত বেশী হচ্ছে, তার বংশজাত পুরুষদের ভিতরে সন্তান-জননে অক্ষমতা তত বর্দ্ধিত হচ্ছে,—মোট কথা, বুদ্ধির উৎকর্ষমূলক শিক্ষা সেই বংশটার নির্ব্বংশেরই কারণ-স্বরূপ হচ্ছে। এর প্রতীকারের উপায় কেউ কেউ ঠাউরিয়েছেন যে, বুদ্ধিগত শিক্ষার চর্চ্চাকে যদি বংশানুক্রমিক না হ'তে দেওয়া যায়, তাহ'লেই এই অকালমৃত্যু বা বংশ-নাশের গতি রুদ্ধ হবে। তাঁরা বলছেন—উকিলের ছেলে যেন উকিলই না হয়, তার ছেলে যেন মিস্ত্রী হয়, মিস্ত্রীর ছেলে যেন আবার চিকিৎসক হয়, চিকিৎসকের ছেলে যেন আবার সৈনিক হয়, সৈনিকের ছেলে যেন আবার শিক্ষক হয়। তাঁরা চান,—যিনি নিজে যা, তিনি যেন তাঁর ছেলেকে তা' না হ'তে দেন। তুলনাটা তাঁরা সংগ্রহ ক'রেছেন চাষের ভূমি থেকে। যে ক্ষেত্রে প্রতিবারই জনারের চাষ হয়, সে ক্ষেত্র একেবারেই

নিঃসার ও উৎপাদিকা-শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে। তাই, চাষারা যে ক্ষেত্রে একবার জনার দেয়, দ্বিতীয়বার হয়ত তাতে চিনাবাদাম করে, তৃতীয়বার হয়ত তাতে অড়হর বোনে, চতুর্থবার হয়ত তাতে মুগ ফলায়। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কৃষি কর্ল্লে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয় না, সে প্রত্যেক বারই প্রচুর ফসল দেয়, সুপুষ্ট ফসল দেয়। এই তুলনাটা তাঁরা মানুষের জীবনেও টান্‌তে চেয়েছেন। কিন্তু এটাও য়ুরোপীয় মনীষীদের একটা বুঝবার ভুল। ভারতবর্ষ কখনও এইভাবে বুঝতে চায়নি, ভারতের চিন্তা বংশানুক্রমিকতার শক্তিতে প্রচণ্ড বিশ্বাসী। ভারতবর্ষে বেদ-পাঠকের ছেলে বেদই শিখেছে, যোদ্ধার ছেলে যুদ্ধই শিখেছে, বণিকের ছেলে বাণিজ্যই শিখেছে কিন্তু তাতে কোনও বংশই নির্ব্বংশ হয়নি। তার এক প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষ জীবনের মূলদেশে ব্রহ্মচর্য্যকে স্থাপন ক'রেছিল। জীবনটাকে যদি একটা কৃষি-ভূমিরূপে কল্পনা কত্তে হয়, তবে বলতে হবে, ভারতবর্ষ পঁচিশ বৎসর কাল জীবনটার চারিদিকে কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখত, কাম-মোহাদি ছাগ-মহিষকে এ জমিতে চরতে দিত না, জীবনের জমি তপস্যা, সংযম ও শিক্ষারূপ সার, গোবর, খৈল পেয়ে নয়ন-মনোহর কচি তৃণে সুশোভিত হ'ত। এই হ'ল ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থা। এর পরে জীবনের জমিটাতে হল-চালনা ক'রে চাষ করা হ'ত, বীজ বোনা হ'ত, ফসল তোলা হ'ত। আজ একটা বীজ বুনে কৃষক কালই আর একটা বীজ বুন্‌ত না, একটা বীজ অঙ্কুরাবস্থায় থাক্‌তেই সে তার উপর দিয়ে আবার হাল চালিয়ে নিত না, বীজ বুনে সে অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য উপযুক্ত কাল সহিষ্ণুতা-সহকারে অপেক্ষা কত্ত, অঙ্কুর গজাবার পরে সে তাকে উপযুক্ত পরিমাণ বড় হ'তে দিত। এই

হ'ল গার্হস্থ্যের অবস্থা। ফসল তোলার পরে জীবনের জমিতে যে সব খড়কুটো পরিত্যক্ত হ'য়ে প'ড়ে থাকত, তাকে বৈরাগ্যের অনলে জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ত। এই হ'ল বানপ্রস্থের অবস্থা। পোড়া খড়কুটোগুলি সাররূপে পরিণত হ'য়ে যখন জমিটাকে নূতন নূতন স্বভাব-জাত শস্যে পূর্ণ ক'রে তুলত, তখন জীবনটাকে ছেড়ে দেওয়া হত—জগদ্‌বাসীর সকল প্রাণীর নির্ভয় সেবার জন্য। এই হ'ল সন্ন্যাসের অবস্থা। একটা জীবনের মধ্যেই এই চারিটি বিচিত্র অবস্থা সৃষ্টির ব্যবস্থা ছিল ব'লেই প্রাচীন ভারতে দার্শনিকের ঘরে দার্শনিক জন্মেছে, কিন্তু বংশটা অল্পায়ু হয়নি, নির্ব্বংশ হয়নি। ব্রহ্মচর্য্য ভারতবর্ষের কৌলিক শক্তিকে বাড়িয়েছে। যে বংশ বীর্য্যধারণ কত্তে চেষ্টা করেছে, ব্রহ্মচর্য্য সে বংশের কৌলিক বৈশিষ্ট্যকে দৃঢ় হস্তে ধারণ কত্তে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ কি পাশ্চাত্যে, কি ভারতে কোথাও শিক্ষাকালীন ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে পারেনি বা কত্তে চায়নি। এই খানেই যুগের দুর্গতি।

গ্রাম্য দুর্নীতির প্রতিকার

অদ্য বৈকাল বেলা চিকশিয়া গ্রাম হইতে একটী উৎসাহী যুবক আশ্রম-দর্শনে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে কৃষিকর্ম্মরত দেখিয়া একটী যন্ত্র লইয়া নিজেও কিছু কিছু কাজ করিতে লাগিলেন। বিশ্রামকালে কথা উঠিল।

—যুবক বলিলেন,—আজ্ঞে, আমাদের অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে যা নৈতিক দুর্নীতি, তার আর সীমা-পরিসীমা নেই। কোনও কোনও গ্রামের এমন অবস্থা যে, চক্ষে দেখলেও তা সত্য ব'লে আপনি বিশ্বাস কত্তে পার্ব্বেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এ দুর্নীতির কারণ কিছু বুঝতে পেরেছ ?

যুবক।—আমার মনে হয়, এই মানভূমের কলিয়ারীগুলিই সকল দুর্নীতির জনক। কলিয়ারী হওয়া অবধিই গ্রামে গ্রামে কুৎসিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এক একটী সুস্থ সবল চরিত্রবান্ যুবক কলিয়ারীতে পয়সার লোভে কাজ কত্তে যায়, আর ফিরে আসে মদের বোতল, কুৎসিত রোগ আর নানা কদর্য্য অভ্যাস নিয়ে। এদের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক একটা গ্রামে এমন হ'য়েছে যে, শতকরা হয়ত একজন পুরুষ বা নারীও চরিত্রবান্ নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এর প্রতিকারের উপায় যে বাবা তোমাদেরি হাতে। পয়সার লোভে লোক কয়লার খনিতে যায় তো! গ্রামে গ্রামে এমন সব শিল্পের সৃষ্টি কর, যাতে পয়সার লোভে আর গ্রাম থেকে বাইরে কাউকে না যেতে হয়। এণ্ডি, রেশম, লাক্ষা এগুলি ত' তোমার দেশের নিজস্ব শিল্প। কর না এইগুলির উদ্বোধন। পয়সা গ্রামবাসীর পায়ে এসে লুটাবে। তোমাদের দেশের জমি ফলের বাগানের পক্ষে খুব উপযোগী, ঘরে ঘরে কূয়া খোঁড় *, ঘরে ঘরে ফলের গাছ রোপণ কর ‡, দশ জনের দশখানা বাগানের ফল একত্র ক'রে সহরে চালান দাও, দেখবে গ্রামেই এত কাজ মিল্‌বে যে, গ্রামের কুলী, গ্রামের কামিন †, গ্রামের ঠিকাদার গ্রামেই অজস্র অর্থ উপার্জ্জন কত্তে পাচ্ছে।

* ইহার কয়েক মাস পরে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রেরণায় কালাপাথর গ্রামবাসীরা তিন-চারটি কূপ খুঁড়িয়েছেন। ‡ প্রতি বৎসর পুপুনকী আশ্রম হইতে সহস্র সহস্র ফলের গাছ নানা গ্রামবাসীগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। † স্ত্রী-মজুর

কয়লার খনি হইতে দুর্নীতি দূরীকরণের উপায়

যুবক।—কয়লার খনিগুলি হইতে দুর্নীতি দূরীকরণের কি কোনও উপায় নেই ?

শ্রীশ্রীবাবামণি। আছে, কিন্তু সেটা তোমাদের গ্রামবাসীদের হাতে নয়। সেটা হচ্ছে শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান আর গভর্ণমেন্টের হাতে। শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানগুলি যদি ধর্ম্মঘট বাধাবার দিকে দৃষ্টি কম দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতিপ্রচারের দিকে দৃষ্টি বেশী দেন, তাহ'লে পনের বিশ বছরের মধ্যে এমন অবস্থা আসতে পারে, যাতে অনৈতিক অবস্থার আনুকূল্যগুলি সহজেই ক'মে আসবে, আর, ধর্ম্মঘট করার যদি প্রকৃত প্রয়োজন কখনো হয়, তবে তাও এখনকার চাইতে সহস্রগুণ শৃঙ্খলা ও সাফল্য সহকারে পরিচালিত হ'তে পার্ব্বে। কিন্তু বাছা, কয়লার খাদগুলি এমনি জিনিষ যে, আইন ক'রে যদি তাতে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ না করা যায়, তাহ'লে যতই নীতিকথা বল আর ধর্ম্মকথা শুনাও, ব্যভিচার, পরদার, বলাৎকার এই সমস্ত কিছু না কিছু হবেই হবে। অন্ধকারই পাপের দোসর, লোকচক্ষু আর সূর্য্যালোক যেখানে পড়ে, সেখানে পাপ নিজের কাছে নিজে সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকে। খুন ক'রে ফেললে যেখানে খোঁজ পাবার জোটী নেই, সেখানেও যদি ইন্দ্রিয়গত দুর্নীতি রাজত্ব না করে, ত' কোথা কর্ব্বে ?

ভাত, না সতীত্ব

যুবক।—এরকম আইন হ'লে অনেক স্ত্রীলোকের ভাত মারা যাবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এর জন্যেই প্রত্যেক স্ত্রীলোকের জন্য নিজ

নিজ গ্রামেই ভাতের সংস্থান কত্তে হবে—কুটীর-শিল্প দিয়ে। এইখানেই মহাত্মা গান্ধীর চরকার সার্থকতা। চরকা বলতে শুধু চরকাই বুঝো না, চরকা বল্‌তে যাবতীয় হস্তসাধ্য কুটীর-শিল্পকে বুঝবে, কিম্বা অল্পব্যয়ে লভ্য যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করাকে বুঝবে।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—সতীত্ব মারা যাওয়ার চাইতে ভাত মারা যাওয়া অনেক ভাল। সতীত্ব বিপন্ন হওয়ার আগে মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। সতীত্বই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ। এর উপরে যদি আঘাত পড়ে, সমগ্র ভারতীয় জাতি ধ্বংস হ'য়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে, অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত থাক্‌বে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা রাক্ষসীর মত বিরাট মুখব্যাদান ক'রে আমাদের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মঙ্গল, সব গ্রাস ক'রে ফেলবার জন্য ছুটে আসছে। আর আমরা তা প্রতিরোধ করবার জন্য মৃত্যু-সঙ্কল্প ক'রে দাঁড়াতে চাইছি না, এইটাই হচ্ছে আমাদের সব চাইতে বড় অপরাধ। আলস্য, অবসাদ আর নিশ্চেষ্টতা—এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের উন্নতির সব চাইতে বড় শত্রু।

নারীর সতীত্বের সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সতীত্ব যাবার আগে প্রাণ যাবে, এই শিক্ষা যে জাতির রমণী-সমাজ গ্রহণ কত্তে পার্ব্বে, তাদেরই জন্য পৃথিবীর বুকে দিগ্বিজয়। কারণ, পুত্ত বাদল এমন মেয়েদেরই গর্ভে জন্মে। রাজপুত জাতিটা জগতে দিগ্বিজয় কত্তে পার্ল্লনা শুধু সংহতির অভাবে। নইলে পিতৃবীর্য্যে আর মাতৃরজে এদের চেয়ে ভাগ্যবান্ জাতি এ জগতে আর কোথাও জন্মেনি।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৩১শে আষাঢ়, ১৩৩৫

সন্ন্যাস-গ্রহণে শিষ্য ও গুরু

এখানকার জলে ও মাটীতে চূণের অংশ অধিক থাকায় সর্ব্বপ্রকার উদররোগীর পক্ষে এবং বায়ু আর্দ্রতাহীন ও বিশুদ্ধ থাকার দরুণ সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া ও কফ-রোগীর পক্ষে এস্থান বড়ই স্বাস্থ্যপ্রদ। আশ্রমটী জামসেদপুর, পুরুলিয়া, রাঁচি, ধানবাদ, হাজারীবাগ, পরেশনাথ, মধুপুর, বৈদ্যনাথধাম প্রভৃতি বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থানের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই কারণে এবং বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি অধিকাংশ সময়ে পুপুন্‌কীতে অবস্থান করেন বলিয়া নিয়ম হইয়াছে যে, যাহারা স্বগৃহে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা না পাইবার ফলে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সংযমের সাধনায় সিদ্ধকাম হইতে পারিতেছে না, এমন অবিবাহিত যুবকেরা আশ্রমের সকল কষ্ট ও কঠোরতা সহ্য করিয়া অন্ততঃ এক বৎসরকাল শিক্ষানবীশ কর্ম্মী-রূপে অবস্থান করিতে প্রস্তুত হইলে আশ্রমে তাহাদিগকে যৌগিক সাধনা ও সদাচারের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব ও সুদৃঢ় ইন্দ্রিয়-সংযম লাভের জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করা হইবে।

তদনুসারে একটী যুবক আশ্রমে কিছুদিন আসিয়া বাস করিতেছেন। অদ্য যুবকটী শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —আমার পক্ষে কোন্ পন্থা গ্রহণীয়,—সংসার, না সন্ন্যাস?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অপেক্ষা কর, নিজেই নিজের পন্থা বুঝতে পার্ব্বে। অঙ্কুর উদগত হ'লে সেটা কি পূর্ব্বে না পশ্চিমে হেলে দাঁড়াবে, তা' নির্ণয়ের ভার চাষার উপরে নয়। চাষা শুধু

দেখ্‌বে, বীজ বপনের বেলায় জমি উৎকৃষ্টভাবে তৈরী হ'ল কিনা, বীজ অঙ্কুরিত হবার উপরে উপযুক্ত পরিমাণ জল সিঞ্চিত হ'ল কিনা, প্রয়োজন মত সার-গোবর দেওয়া হ'ল কিনা, আগাছা পরিষ্কার করা হ'ল কিনা, ছাগল-গরুর উৎপাত-উপদ্রব থেকে বেড়া দিয়ে তাকে রক্ষা করা হ'ল কিনা। তুমি সংসারী হবে, কি সন্ন্যাসী হবে, সে ভাবনা আমার নয়, সে ভাবনা তোমার নিজের।

সন্তান-জননে পবিত্রতা

অদ্য জনৈক বিবাহিত ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কদর্য্য লালসার ইন্ধন যোগাইতে যোগাইতে মানুষ এমন এক নিকৃষ্ট স্তরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার নিজের দৃষ্টিতেই সন্তান-জনন কার্য্যটীর মত ঘৃণিত ও জঘন্য ব্যাপার জগতে আর দ্বিতীয় নাই। অথচ এই ব্যাপারটী না ঘটিলে বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্য, যীশু-নানক-কবীর, রাণাপ্রতাপ-গুরুগোবিন্দ-শিবাজীর আবির্ভাব অসম্ভব। আজিকার গৃহীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, স্বামী-স্ত্রীর মৈথুন-মিলনকে এই কদর্য্য মনোভাব এবং এই ঘৃণিত সংস্কারের বাহিরে নিয়া প্রতিষ্ঠিত করা। স্বামী-স্ত্রীর মৈথুন-মিলনের স্থানকে, সময়কে, প্রয়োজনকে, প্রণালীকে এক সুনির্দ্দিষ্ট সংযমের গণ্ডীর ভিতরে আনিয়া এতৎ-সম্পর্কিত যাহা-কিছু-সবকে একেবারে ভাগবতী-কৃত করিতে হইবে। যাগ-যজ্ঞ, হোম-জপ ভক্ত যেমন ধীরতা, স্থিরতা, পবিত্রতা ও সঙ্কল্পের গভীরতা লইয়া করে, গৃহীকে সন্তান-জনন ব্যাপারে তেমন মানসিকতায় মণ্ডিত হইতে হইবে। দেব-পূজার পূর্ব্বে ভক্ত যেমন স্নান, চন্দন-লেপন, পুষ্পমাল্য ধারণ ও শুভ্র শুদ্ধ ক্ষৌম

বস্ত্র পরিধান করে, সন্তান-জননে গৃহীকে তাহাই করিতে হইবে। পূজার্চ্চনার স্থান যেমন গোময়-লেপিত, চূয়া-চন্দন-ধূপ-গন্ধে আমোদিত, সৎ প্রবৃত্তির উন্মেষক নানা চিত্রাবলিতে পরিশোভিত থাকে, সন্তান জননস্থানকে তেমন করিতে হইবে। দেবপূজার প্রত্যেকটী উপকরণ যেমন ধৌত, পরিষ্কৃত এবং অন্য কার্য্যে অব্যবহৃত থাকে, সন্তান-জনন-কালীন যাবতীয় আবশ্যকীয় উপকরণ সেইরূপ হইবে। দেবপূজায় যেমন অকাল-বোধন নিষিদ্ধ, সন্তান-জননে তেমন অকাল-সঙ্গম নিষিদ্ধ হইবে। দেবপূজায় যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া পূজারম্ভের সময় নির্ণীত হয়, সন্তান-জননে তেমনি হইবে। দেবপূজায় যেমন প্রত্যেকটী মন্ত্রোচ্চারণ, প্রত্যেকটী অঙ্গ-সঞ্চালন, প্রত্যেকটী সঙ্কল্প, আবাহন ও বিসর্জ্জন ধীর সুশান্ত ভাবে শাস্ত্র-নির্দ্দেশ অনুসারে করিতে হয়, সন্তান-জননে তাহাই করিতে হইবে। সদ্‌গৃহীর পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মহৎ কর্ত্তব্য এবং প্রচণ্ডতম দায়িত্ব।"

পুপুন্‌কী আশ্রম,
২রা শ্রাবণ, ১৩৩৫

লোকসংখ্যা-বর্দ্ধনের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি আজ দ্বিপ্রহরে মহাভারত পাঠ-প্রসঙ্গে বলিলেন,—যে জাতি শক্তিশালী হ'তে চায়, অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় হ'তে চায়, তার সহস্র প্রার্থনার মধ্যে একটা মস্ত বড় প্রার্থনা হচ্ছে, লোকসংখ্যা-বর্দ্ধন। কিন্তু এর শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে কি জানো ? স্ত্রীপুরুষ উভয়ের আযৌবন ইন্দ্রিয়-সংযমই হচ্ছে লোকসংখ্যা-বর্দ্ধনের প্রকৃষ্টতম উপায়। এই মহাভারতেই রয়েছে দেখ না,—"যৌবন উপস্থিত না হইলে কেহ স্ত্রীর সংসর্গ করিল

না, সুতরাং সসাগরা-পৃথিবী প্রাণিবর্গে পরিপূর্ণ হইল।" নর-নারী উভয়কে যদি পূর্ণ যৌবন সমাগত না হওয়া পর্য্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করান যায়, তাহ'লে বলবান ও তেজস্বী, দীর্ঘজীবী সন্তান-সন্ততির দ্বারা পৃথিবী অচিরেই পূর্ণ হ'য়ে যাওয়ার মত সত্য সিদ্ধান্ত আর কিছু হ'তে পারে না। আজকাল অধিকাংশ জননী সন্তান প্রসব কচ্ছেন বারো, চৌদ্দ, ষোলটী ক'রে কিন্তু ম'রে-ত'রে তিন চারটিও টিকছে না। যারা টিকছে, তারাও না থাকারই মধ্যে, যমদূত নিয়ত তাদের পিছন ধ'রেই রয়েছে। দেশহিতৈষীরা বলছেন,—খাদ্যাভাবে শিশুগুলি অকালে মরছে, সুশিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবে ভূমিষ্ঠ হ'তে না হ'তে শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে, আতুর-ঘরের অব্যবস্থায় মা-বাপকে কাঁদিয়ে চলে যাচ্ছে। কথাগুলি সত্য। কিন্তু অকাল-মৃত্যুর সব চাইতে বড় কারণটা খুঁজতে হবে আরও গভীরতর প্রদেশে। যাদের ঔরসে শিশুরা জন্মাচ্ছে, তাদের ঔরসের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি নেই, ব্রহ্মচারীর তেজ নেই। আর যাদের জঠরে সন্তানগুলি জন্মাচ্ছে, তারাও নিতান্ত অসময়ে, বিরুদ্ধ-সময়ে, অপ্রস্তুত অবস্থায় পুরুষ-বীর্য্য গ্রহণ কচ্ছে। সন্তানের এই অকাল-মরণ অধিকাংশ স্থলে তারই জন্যে।

জাতীয় শক্তির মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গোজাতি আর স্ত্রীজাতি, এঁরা হচ্ছেন জাতীয় শক্তির মূল। যে জাতি এ দুইটির আদর করে, যত্ন করে, উন্নতির উপায় করে, সে জাতির উন্নতি ধ্রুব। যে জাতি এঁদের অনাদর করে, তাদের অধোগতি নিশ্চিত।

মাতৃত্বের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মায়ের যোগ-যাগ তপস্যার ফল সন্তান পায়। বিশ্বকর্ম্মা নব নব শিল্পের স্রষ্টা, তিনি শিল্পের গুরু। তিনি জন্মেছিলেন এক অসামান্যা তপস্বিনীর গর্ভে। বিশ্বকর্ম্মার মা বৃহস্পতির ভগ্নী। যৌবনেই ইনি সংসার ত্যাগ ক'রে যোগসাধনায় রত হন এবং তারপরে বিবাহ ক'রে সংসারী হন। সাধনের ফল যায় না, মায়ের সবটুকু সাধনের শক্তি সন্তানের মাঝে একটা না একটা দিব্য প্রতিভাময় অত্যাশ্চর্য্য রূপ ধারণ ক'রে প্রকাশ পায়।

কুমারী-জীবনে তপস্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জন্যই আমি কুমারী-জীবনেই স্ত্রী লোকদের কঠোর তপস্যার পক্ষপাতী এবং এই তপস্যাকে সুকর কর্ব্বার জন্যেই বলেছি যে, ষোল থেকে আঠারোর নীচে কারো বিয়ে হওয়া উচিত নয়। তপশ্চর্য্যার অবস্থায় কুমারী মেয়ের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানানুশীলনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক কিন্তু যে-সব বিদ্যার অনুশীলনে চিত্ত তপোবিমুখ হ'তে পারে, সেইগুলিকে যথাপ্রয়োজন বাদ দিয়ে। কুমারী-জীবনে তপশ্চর্য্যা ও বিদ্যালাভের সুযোগ ক'রে দিতে পার্লেই নারী জাতির স্থায়ী উন্নতির গোড়া-পত্তন করা হবে।

তপস্বিনী কুমারীর গার্হস্থ্য-প্রবেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—তপস্বিনী কুমারী যখন গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করে, তখন সে কণ্টকময় পথে নির্ব্বিঘ্নে নির্ভয়ে পাদচারণা কত্তে পারে। অতাপসীর যেখানে মরণ নিশ্চিত, সেখানে সে বীর-দর্পে সমুদ্র-তরঙ্গ অগ্রাহ্য ক'রে চলে যায়।

অধর্ম্মের নিদান ও তাহার নাশের উপায়

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহাভারত বল্‌ছেন, উদর-পূরণের জন্য যখন প্রজাবর্গ পরস্পরকে ভক্ষণ কত্তে আরম্ভ কল্ল, তখনই অধর্ম্মের জন্ম হ'ল। এ অতিশয় খাঁটি কথা। জঠর-জ্বালাই লোককে অধর্ম্মে প্রেরিত করে, পেটের যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে অসংখ্য নর-নারী চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি কত্তে বাধ্য হয়। অধর্ম্মের নিদান হচ্ছে পেটের ক্ষুধা, তাই পেটের ক্ষুধা দূর করাই হচ্ছে অধর্ম্ম দূর করার প্রধান উপায়। কিন্তু পেটের ক্ষুধা দূর হবে কি ক'রে ? তার জন্যে উপায় হচ্ছে দুটী। প্রথম উপায়—প্রত্যেক নর-নারীকে নিরলস হয়ে অসামান্য উদ্যম সহকারে আত্মশক্তিতে দাঁড়িয়ে অন্নার্জ্জনের চেষ্টা শিখ্‌তে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে,— অবৈধ আকাঙ্ক্ষা ও লোভ বর্জ্জন।

জনৈক আশ্রম-কর্ম্মী ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—লোভদমন কত্তে শিখলে কি পেটের ক্ষুধা যাবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পেটের ক্ষুধা যাবে না, চ'খের ক্ষুধা যাবে। অনেক সময় মানুষ চ'খের ক্ষুধাটাকেই পেটের ক্ষুধা ব'লে মনে করে এবং তারই বশে অধর্ম্ম ক'রে থাকে।

জাতীয় উন্নতি ও সুখের লক্ষণ

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতীয় উন্নতির তিনটী লক্ষণ আছে। প্রথম লক্ষণ হচ্ছে,—এ জাতির ব্যাধি-গ্রস্ততা, অকাল-মৃত্যু, শিশুমৃত্যু, স্ত্রীলোকদিগের গর্ভপাত প্রভৃতি থাকবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে,—এ জাতির অন্নাভাব থাকবে না। তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে,—এ জাতির মধ্যে কেউ পরস্বাপহারী থাক্‌বে

না। এই তিনটী লক্ষণ ফুটে উঠ্‌লেই বুঝতে হবে যে, এ জাতি সুখী ও সভ্য। হিন্দু এবং বৌদ্ধ-রাজত্বে এ অবস্থা ছিল। মেগাস্থিনিস, ইউয়েন্থসাং, ফাহিয়েন প্রভৃতির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তার প্রমাণ। মুসলমান-রাজত্বে দেশের অবস্থা এর চাইতে হীন হ'লেও অন্নাভাব ছিল না, টাকায় আট মণ চাউল মিল্‌ত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে ত্র্যহস্পর্শ-যোগ ঘটেছে। জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় সুখের তিনটী লক্ষণই একযোগে অন্তর্হিত হয়েছে। জাতীয় উন্নতির কথা ভাবতে গেলেই আমাদের অভ্যাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে য়ুরোপ আমেরিকার দিকে তাকান। কিন্তু এ লক্ষণ তিনটী মিলিয়ে তাদের স্বরূপ চিনতে গেলে বল্‌তে হবে যে, তারা উন্নত নয়, সভ্যও নয়, সুখীও নয়। একদিকে কলেরা-বসন্ত-ম্যালেরিয়া ঐসব দেশ থেকে পালিয়েছে বটে, কিন্তু শুক্রগত রোগে, ঔপসর্গিক মেহে, উপদংশের বিষে সবগুলি দেশ একেবারে জর-জর। ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে ওরা এক একজন লক্ষপতি কোটিপতি হচ্ছে বটে কিন্তু একজন যখন সিন্দুক পূরে টাকা রাখছে, হাজার হাজার লোক তখন পেটের জ্বালায় ডিনামাইট দিয়ে তার পঁয়তাল্লিশ-তালা-দালান চূর্ণ কর্ব্বার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। আর, পরস্বাপহরণ-বিদ্যার কথা যদি বল, তবে বল্‌তে পারি, ঐ বিদ্যাটায় ওরা আরো হাজার বছর জগতের গুরুগিরি কত্তে পার্ব্বে।

পুপুনকী আশ্রম,
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৫

বংশানুক্রম ও শিক্ষা

অধ্যাপনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বংশানুক্রমের শক্তি বড়, কি শিক্ষার শক্তি বড়, এই কথা নিয়ে পণ্ডিতে

পণ্ডিতে সিং ভাঙ্গাভাঙ্গি চল্‌ছে। কেউ বল্‌ছেন,—চেষ্টা তুমি যতই কর, শিক্ষা তুমি যতই দাও, গাধার বাচ্চা গাধাই হবে, ঘোড়া হবে না, চোরের ছেলে চোরই হবে, সাধু হবে না, অসতীর মেয়ে অসতীই হবে, সতী সাধ্বী হবে না। বিরুদ্ধ পক্ষ বল্‌ছেন, —বংশানুক্রমের শক্তি হচ্ছে অশ্ব-ডিম্ব, সমভাবে যদি শিক্ষা দাও, এবং সমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যদি রাখ, তাহ'লে তোমার ঐ রবিঠাকুর আর ধনা সাঁওতাল, জগদীশ বসু আর হাড়িয়া কুর্ম্মি দুজনেই সমান হ'ত। কিন্তু উভয় পক্ষের কথাই অসত্যদুষ্ট। বংশানুক্রমেরও একটা শক্তি আছে, শিক্ষারও একটা প্রভাব আছে। এই দুটো নিয়ে মানুষের জীবন পূর্ণতা পায়। যার রক্তের সঙ্গে দস্যুতার প্রবণতা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত, শিক্ষার বলে তার দস্যুসুলভ গুণগুলি যদি বা একেবারে বিলুপ্ত করা নাও যায়, তথাপি সেই অকুতোভয়তা, সেই সাহস, সেই দৃঢ়তা, সেই শৃঙ্খলাপ্রিয়তা, সেই শ্রমক্ষমতা দেশের স্বাধীনতা-সংরক্ষার কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ভাবেই জগতের অনেক বড় বড় দস্যু বড় বড় সেনানায়ক হয়েছেন। শিক্ষার বলে চোরের বংশধরের মস্তিষ্ক থেকে চৌর্য্যের প্রচ্ছন্ন প্রবণতা একেবারে দূরীভূত না-ও হ'তে পারে, কিন্তু সেই চতুরতাকে, সেই প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বকে, সেই পরচক্ষে ধূলি-নিক্ষেপের ক্ষমতাকে, সেই আত্মগোপন ক'রে চলবার সামর্থ্যকে সমাজ-কুশলের যারা শত্রু, তাদের ছিদ্রান্বেষণে, গুপ্ত-মন্ত্রণা-ভেদে এবং অপরাপর বহু হিতকর কার্য্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পৃথিবীর অনেক বড় বড় চোর এই ভাবেই খুব বড় বড় গুপ্তচর হ'তে পেরেছে। শিক্ষা অবশ্য কৌলিক শক্তিকে মুছে দিতে পারে না, কিন্তু যদি

উৎকৃষ্ট-ভাবে পরিচালিত হয়, তাহ'লে কৌলিক দোষগুলিকেও সৎপথে চালিয়ে সমাজের অকল্যাণ নিবারণ কত্তে এবং কল্যাণ বাড়াতে পারে। এইখানেই শিক্ষার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বংশানুক্রমকে বিশুদ্ধ করিবার উপায়

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনও বংশের কৌলিক বৈশিষ্ট্য চৌর্য্য, কোনও বংশের বা ডাকাতি, কারো বা বংশধারার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মদ্যপান। এইগুলিকে বিশুদ্ধ করবার উপায় কি? উপায় হচ্ছে—ইন্দ্রিয়-সংযম ও ভগবৎ-সাধনাকে বংশানুক্রমিক করা এবং কি চোর, কি সাধু, কি সংযমী, কি লম্পট, প্রত্যেককে বৈধ কি অবৈধ প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে ভগবৎ-স্মরণে উৎসাহিত করা। ভগবৎ-সাধনে সর্ব্বদোষের ক্ষয় হয়, ব্রহ্মচর্য্যে সকল দুর্ব্বলতা লয় পায়। এ দুটীর বংশানুক্রমিক সাধনা বংশের মধ্যে নূতন নূতন সামর্থ্য ও নব নব যোগ্যতা সৃষ্টি কত্তে থাকে। অবশ্য, প্রশ্ন কর্ত্তে পার, লম্পট কি কখনো লাম্পট্য-কালে ভগবৎ-স্মরণ কর্ব্বে? আমি বলি, না করে ত' করাতে হবে। প্রকাশ্যে হউক কি অপ্রকাশ্যে হউক, যে যেমনভাবে প্রচারের অধিকারী, তাকেই আজ এই একটী মহাসত্য প্রচারের যথাযোগ্য ভার নিতে হবে যে, নর-নারীর সম্ভোগকে ভগবৎ-স্মরণহীন ক'রে রাখা, লাম্পট্যের চাইতেও বড় পাপ। যে পুরুষ বহু নারী বা বারনারীর সেবা কচ্ছে, তাকে পূর্ণ ইন্দ্রিয়-সংযমের মাহাত্ম্য শুনাবার আগে শুনাতে হবে যে, অবৈধ সঙ্গমেও ভগবৎ-স্মরণ অত্যাবশ্যক। যে নারী পরপুরুষ-সঙ্গ কচ্ছে, তাকেও সতীত্ব-মহিমা শুনাবার আগে শুনান প্রয়োজন যে, সম্ভোগ-মাত্রেই ঈশ্বর-স্মরণ চাই। যে নর-নারী বৈধ বিবাহিত জীবন-যাপন ক'রেও

অপরিমিত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চায় জীবন ভাসিয়ে দিয়েছে, সম্ভোগের আধিক্য সংযত কত্তে বলার আগে তাদের বলা চাই যে, ভালই কর আর মন্দই কর, যাই কর না কেন, প্রতি পদে ভগবৎ-স্মরণ কত্তে হবে, নইলে তোমার উদ্ধার নেই। ভগবৎ-স্মরণকে এইভাবে প্রত্যেক নরনারীর গূঢ় আচরণের মধ্যে একটা অপরিহার্য্য সংস্কাররূপে পুষ্ট ক'রে তুলতে হবে। মানুষের ভিতরে শত শত কুসংস্কার যদি যুগের পর যুগ সৃষ্ট, পুষ্ট ও দৃঢ়মূল হয়ে বাস কত্তে পারে, চেষ্টার মত চেষ্টা চললে কি এই সংস্কারটাকে তেমনিভাবে সৃষ্ট, পুষ্ট ও স্থায়ী করা যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে। অবশ্য এই সংস্কারটীর সৃষ্টির অনুকূলে সুবিশাল সাহিত্য গ'ড়ে তুলতে হবে, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, কথা-সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য, গীতি-সাহিত্য, ধর্ম্ম-সাহিত্য প্রভৃতি এই একটী সৎসংস্কারের পরিপোষকরূপে সৃষ্টি কত্তে হবে এবং তার অবাধ প্রচারের দ্বারা সমগ্র জাতির মানসিক আবহাওয়াতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনতে হবে। এইভাবে সুপ্রচণ্ড চেষ্টার ফলে নর নারীর মৈথুন-মিলন যখন ভাগবত-জীবনের সৌরভে আমোদিত হবে, তখনি ভারতে বংশানুক্রমিক উৎকর্ষের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা সত্য সত্যই আরম্ভ হবে। তখন ব্যভিচার, বলাৎকার, পরদার, অসতীত্ব, গণিকাবৃত্তি প্রভৃতি আপনিই প্রশমিত হয়ে যাবে।

বর্ত্তমান য়ুরোপে বংশানুক্রমিক-বিশুদ্ধির সম্ভাবনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—বর্ত্তমান য়ুরোপ এবং তার শিষ্য ও পুত্র কন্যারা, যথা,—জাপান এবং আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার উপনিবেশ প্রভৃতি দেশ এখনও বংশানুক্রমিক বিশোধক এই মহান্ উপায়কে জান্‌তে পারে নি। অথচ ব্যভিচারই সেই

সব দেশের প্রধানতম সমস্যা। ঝুড়ি ঝুড়ি যৌন-সাহিত্য সে সব দেশে রচিত, প্রচারিত এবং পঠিত হচ্ছে কিন্তু সবই শ্রীরামহীন রামায়ণ আর শ্রীকৃষ্ণহীন ভাগবত। অবিবাহিত যুবক ও যুবতীদের মধ্যে নৈতিক অসংযম যাতে না প্রবেশ কত্তে পারে, তার অনুকূলে এঁরা অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন, অনেক প্রচারক প্রচার-কার্য্যও কচ্ছেন, কিন্তু বিবাহিত জীবনটার ভিতরে ভাগবতী প্রতিষ্ঠা স্থাপনের চিন্তার উন্মেষ-মাত্রও এঁদের বুদ্ধির কাছে ধরা পড়েনি। সুখী দাম্পত্য-জীবনের এঁরা চিন্তা করেন, কিন্তু তার মানে মাত্র দাম্পত্য ইন্দ্রিয়-সুখ আর দাম্পত্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি। দাম্পত্য-ভাগবত জীবন এঁদের কল্পনার বাইরে। ভারতবর্ষের কাছ থেকে তাঁদের এই বিষয়ে শিক্ষা নিতে হবে। অবশ্য, ভারত যখন শিক্ষা দেবার মত উৎকর্ষকে লাভ কর্ব্বে, তার আগে ওরা নতজানু হ'য়ে কখনো বল্‌বে না,—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

কলিকাতা,
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৫

সাধকের স্বরূপ

দিনকতক হয় শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা আসিয়াছেন। অদ্য তিনি কুমিল্লা-নিবাসী জনৈক ভক্তকে লিখিলেন,—

"সর্ব্বদা মনে রাখিও, তুমি সাধক। শুধু সাধক নহ, কর্ম্মী-সাধক। শুধু কর্ম্মী নহ, স্বদেশ-প্রেমিক। তুমি সাধক বলিয়াই জগতের কোনও ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের উপরে তোমার বিদ্বেষ নাই, জগতের কোনও ব্যক্তি, সমাজ বা সম্প্রদায় তোমার শত্রু নহেন। তুমি সাধক বলিয়াই তুমি আত্মদর্শী এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শী,

দ্বিজ-চণ্ডালে তোমার সমান প্রীতি, ধনি-দরিদ্রে তোমার সমান সুবিচার। একজনকে মারিয়া আর একজনকে বাঁচান তোমার নীতি নহে। জগতের সকলকে বাঁচাইয়া, সকলের কুশল করিয়া, সকলের নিঃশ্রেয়সের ভিতর দিয়া নিজের কুশল-প্রতিষ্ঠাই তোমার বিশেষত্ব। নিজের কুশল-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াও জগতের কুশল-প্রতিষ্ঠাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য। মনে রাখিও, তুমি সাধক-কর্ম্মী,—অসাধক-কর্ম্মীর সহিত তোমার পার্থক্য থাকিবেই।''

পুপুনকী আশ্রম,
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩৫

ভাঙ্গা ও গড়া

গতকল্য শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা হইতে পুপুনকী আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে কৃষির কাজকর্ম্ম কোথায় কিরূপ চলিয়াছে, তাহা পরিদর্শন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাঙ্গা এবং গড়া একই বৃক্ষের দুটি ফল। অজ্ঞানী একটীকে পেয়েই আত্মহারা হ'য়ে যায়, জ্ঞানী একে একে দুইটীকেই সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন বিগতস্পৃহ হ'য়ে। আজ আশ্রম গড়ছ না ? কাল হয়ত ভাঙ্গতে হবে। আজ যতখানি দৃঢ়তা নিয়ে গড়ছ, কাল যদি প্রয়োজন পড়ে, ততখানি দৃঢ়তা নিয়েই ভাঙ্গতে হবে। অজ্ঞানীর জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব পৃথক্ পৃথক্। জ্ঞানীর একাধারেই তিন। গড়েন তিনি ব্রহ্মার মত, পালেন তিনি বিষ্ণুর মত, ভাঙ্গেন তিনি রুদ্রের মত। কিন্তু তিনটিতেই তিনি নির্ব্বিকার, উদাসীন, নিষ্কাম। গড়েন ব'লেও মায়া নেই, পালেন ব'লেও মায়া নেই, ভাঙ্গেন ব'লেও মায়া নেই।

গুরু-পূজা

অদ্য ত্রিপুরা-জেলান্তর্গত জনৈক ভক্ত-যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''গুরু-পূজার বিষয় লিখিয়াছ। বাস্তবিকই গুরু-পূজা আত্মোন্নতির মূল স্বরূপ। কিন্তু গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পাদির অঞ্জলি দ্বারা অর্চনা বা ধূপ-ধূনা কর্পূরাদির দ্বারা আরতিই কি একমাত্র গুরু-পূজা ? গুরুদেবের চরণ-বন্দনা, পাদ-সংবাহন, অন্ন-বস্ত্র-অর্থাদি দ্বারা তাঁহার পরিতোষণই কি একমাত্র গুরু-পূজা ? আমি বলি, এই সব অধম শ্রেণীর গুরু-পূজা। গুরুদত্ত সাধন ও জীবনাদর্শকে নিয়ত বুকে ধরিয়া রাখিয়া পরকল্যাণে জীবনোৎসর্গই শ্রেষ্ঠ গুরু-পূজা। গুরুদেবের ধ্যানের দ্বারা তাঁহার শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া থাকার অভ্যাসেও কল্যাণ আছে, কিন্তু গুরুদত্ত সাধনের শক্তিতে বুক বাঁধিয়া নির্ভীক প্রাণে স্বদেশ-সেবা বা জগদ্ধিতে জীবনোৎসর্গ করার মধ্যে বৃহত্তর কল্যাণ বাস করে।''

গুরুপূজার ভণ্ডামি

কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিষ্য যদি বলে যে, গুরুমূর্ত্তি পূজায় আমি আনন্দ পাই, সাধনে জোর পাই, অতএব মারো আর কাটো আমি মূর্ত্তি পূজা কর্ব্বই, বক আর ঝক আমি তোমার ফটো ফুল দিয়ে সাজাবোই, চন্দনে চর্চ্চিত কর্ব্বই, পঞ্চ-প্রদীপে আরতি কর্ব্বই, তাহ'লে কে ঠেকাতে যাচ্ছে বল ? প্রাণ যা চায়, ক'রে নাও বাবা, কোনও বাধা নেই। কিন্তু গুরু-পূজায় যেখানে খুব সোর-গোল আরম্ভ হবে, জানবে, সেখানে তোমার ভিতরে ভণ্ডামি এসেছে। যা কত্তে হয় কর, নিভৃতে

কর, শুধু প্রাণের টানের দিকে চেয়ে কর, বাইরে জাহির করার জন্য কিছু ক'রো না। ভালবাসা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস,—একটু গভীর হ'লেই প্রেমিক তার ভালবাসার বস্তুটীকে নিয়ে একেবারে ভগবানের আসনে বসায়। এই ভাবে স্ত্রী স্বামীকে, কখনো কখনো বা স্বামী স্ত্রীকে, শিষ্য গুরুকে, কখনো বা গুরু শিষ্যকে, বন্ধু বন্ধুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার ব'লে মনে কচ্ছে। ভালবাসার উৎকর্ষপথের এটা একটা স্তর। অতএব একে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। ঊর্দ্ধস্তরে উঠবার পথে এটা নিম্নতর একটা স্তর। কিন্তু ভালবাসা যেখানে সত্য, সেখানে তার গতিপথ বড় প্রচ্ছন্ন, বাইরের উচ্ছ্বাস, বাইরের চাঞ্চল্য, বাইরের আড়ম্বরকে সে স্বভাবতই গোপন ক'রে চলে।

ভণ্ড ও খাঁটি শিষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেখানে দেখবে শিষ্য নিজে সাধন-ভজনে অমনোযোগী, জীবন-কর্ম্মে গুরু-বাক্যকে প্রতিফলিত ক'রে তুলতে অপ্রয়াসী, অথচ নূতন নূতন গুরুভ্রাতা-সংগ্রহে উৎসাহের অভাব নেই, সেইখানেই জানবে, গুরুদেব ভণ্ড শিষ্যের পাল্লায় পড়েছেন। আবার যখন দেখবে, শিষ্য তার গুরুকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসছে, তার চোখে, মুখে, সেবায়, যত্নে সে ভালবাসা উপ্‌চে পড়ছে কিন্তু মুখ ফুটে একবারটী বলছে না, —"আমার নাথই জগন্নাথ, আমার গুরুই জগদ্‌গুরু," যখন দেখবে, দিবানিশি সাধনেই শিষ্য নিমগ্ন, কর্ত্তব্য-কার্য্যের অবসরে একটী নিমেষকেও সে বৃথা যেতে দেয় না, আপ্রাণ গুরু-সেবা-রত হ'য়ে থেকেও সে সাধনের বিন্দুমাত্র সুযোগকে অব্যবহৃত রাখছে না, নিজেকে বা নিজ গুরুকে বাইরে প্রচারের তার আদৌ আকাঙ্ক্ষা নেই অথচ জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মের ব্যপদেশে

যতটুকু প্রচার যখন হ'য়ে যাচ্ছে, তার কোনও বিরোধিতাই কচ্ছে না, তখন জানবে, এই শিষ্যই খাঁটী শিষ্য, এই রকম শিষ্যদের দিয়েই গুরুর ধর্ম্ম, গুরুর আদর্শ, গুরুর জীবন জগদ্‌ব্যাপী হবে।

গুরু-শিষ্যের বিচিত্র সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সদ্‌গুরু আর সৎ-শিষ্যের পরস্পরের সম্বন্ধ বড় বিচিত্র। কখনো এঁরা মাতা-পুত্র, কখনো এঁরা ভ্রাতা-ভগ্নী, কখনো এঁরা সখা-সখী, কখনো এঁরা প্রভু-দাস, কখনো এঁরা প্রণয়ি-প্রণয়িনী, কখনো এঁরা অভেদ সত্তা। ভালবাসার যতগুলি বিকাশ আছে, সবগুলি ক্রমে ক্রমে এঁদের জীবনে ফোটে। এই সম্বন্ধ-বৈচিত্র্য অত্যাশ্চর্য্য ও অফুরন্ত,—ব'লে শেষ করা যায় না। সৎ-শিষ্য পেয়ে সদ্‌গুরু ভাবেন, এমন শিষ্যের আমি যোগ্য নই, শুধু ভাগ্য-গুণে পেয়েছি। সদ্‌গুরু পেয়ে সৎ-শিষ্য ভাবেন, এমন গুরুর কৃপা-লাভের আমি মোটেই যোগ্য নই, শুধু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে লাভ করেছি। সৎশিষ্য মনোময় উপচারে প্রাণের আবেগ দিয়ে নিয়ত গুরুপূজা করেন, সদ্‌গুরু শিষ্যকে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি-বোধে মনে মনে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করেন।

তোমারই কাজে হরি
পেয়েছি যারে,
তোমারি অবতার ভাবিয়া পায়ে তার
প্রণতি করিয়াছি বারে বারে!

সদ্‌গুরুর মনোভাব এই রকমের।

২৬শে শ্রাবণ,
১৩৩৫

কৃষি-প্রচার

পুপুন্‌কীর বনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হইতেই চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে নিত্য নূতন কৃষি ও আবাদের উৎসাহ সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে। গ্রামে গ্রামে গিয়া তরিতরকারীর বীজ বিতরণ করা হইতেছে। আশ্রমে যখন যাহা শাকশব্জী উৎপন্ন হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে তাহা নিঃশেষে বিতরণ চলিতেছে। আশ্রম স্থাপনের দিন হইতেই এই কাজে বিরাম নাই। আর ধারাবাহিক উপদেশ প্রদান ত' চলিতেছেই, ইহার ফলে কয়লার খাদের দিকে যাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, এমন কোনও কোনও মজুর শ্রেণীর লোকের ঘরেও দুই একটি করিয়া গাছ-পালা জন্মিতে শুরু করিয়াছে। বিপিন হালদার নামক একজন দোকানদার বৃথাই দোকানদারী করিয়া করিয়া ক্ষতির পর ক্ষতিই কেবল গণনা করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণির উৎসাহ-বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনিও স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া তরি-তরকারীর আবাদে লাগিয়া যাইবেন। * স্থানীয় ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয়ও চাষ-আবাদের উদ্দেশ্যে জোল্‌হাডি গ্রামে যাইয়া নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, আশ্রম হইতে অকাতরে নানাবিধ বীজ এবং চারা বিতরণের ফলেই চতুর্দ্দিকে কৃষির এই উৎসাহ জাগ্রত

* এক বৎসর পরে সত্য সত্যই এই ব্যক্তি দোকান তুলিয়া দিয়া কৃষিতে নামিয়াছিলেন এবং কৃষির দ্বারা অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

হইয়াছে। আশ্রমে কোনও জলাশয় নাই, অনেক দূর হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দারুণ গ্রীষ্মে যে সকল চারা বাঁচান হইয়াছে, বর্ষার প্রারম্ভে তাহাই গ্রামে গ্রামে স্কন্ধে করিয়া নিয়া আশ্রম-কর্ম্মীরা বিতরণ করিয়াছেন। জল যেখানে পাওয়া যায়, সেই স্থানটীর দূরত্ব সিকি মাইল হইলেও, যাইতে আসিতে অর্দ্ধ মাইল। সোজা সরল রাস্তা নহে, উচ্চ-নীচ পাথর-কাঁকুরে রাস্তা, বন ও গাছের ফাঁকে ফাঁকে আঁকাবাঁকা পথ। জলও অঢেল অথৈ নহে। ক্ষীণ জলধারা বালির মধ্য দিয়া চলিয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া অপেক্ষা করিতে হয় যে, কতক্ষণে চুঁয়া জলে ভরিবে। তারপরে বাল্‌তি ভর, কলসী ভর, তারপরে প্রখর রৌদ্রে তাহা হাতে বা কাঁধে করিয়া আনিয়া আশ্রমে গাছের চারা বাঁচাও। রাত্রিতে একাজ করিবার উপায় নাই, কারণ গাছের ফাঁকে ফাঁকে সাপ। আর, সে সাপ ঢোঁড়া বা হেলে নয়, একেবারে কালসর্প খরিশ অর্থাৎ গোখুরা। এভাবে জল টানিয়া তবে কৃষি-প্রসারের প্রয়াস চলিয়াছে।

সাধু-পুরুষ ও সাম্প্রদায়িকতা

জোল্‌হাডির সাম্প্রতিক নাম হইয়াছে হরিহরপুর। অদ্য হরিবাবুর অনুরোধ শ্রীশ্রীবাবামণি হরিহরপুরের নূতন কৃষি-উদ্যান দেখিতে গেলেন। আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার পথে হরিবাবুর সহিত শ্রীশ্রীবাবামণির অনেক বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল।

হরিবাবু একজন সাধু-পুরুষের নামোল্লেখ করিয়া বলিলেন, —উনিই বর্ত্তমানে বাংলাদেশে সর্ব্ববৃহৎ শিষ্য-সম্প্রদায়ের নেতা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুখের কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধু-পুরুষদিগকে শুধু সম্প্রদায়ের নেতারূপে দেখতে পেলেই

এই চিরপরাধীনতাক্লিষ্টা দুঃখিনী দেশ-জননীর প্রাণের জ্বালা নিভ্‌বে না। তিনি চান, তাঁর সন্তান যদি প্রকৃতই সাধু হয়, তা' হলে সে যেন সম্প্রদায়-বুদ্ধির অতীত হয়।

হরিবাবু।—কিন্তু অনেক বড় বড় সাধুরই ত' নিজস্ব সম্প্রদায় আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' থাকুক কিন্তু সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা সাধু-মহাত্মা যেন নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি স্নেহ-বশতঃ অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন না হন। পাহাড় থেকে উৎপন্ন হ'য়ে যে নদী সমুদ্রে পড়ে, আর, সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হ'য়েই ঘুরে ফিরে যে নদী সমুদ্রে পড়ে, উভয়কেই যেমন সমুদ্র বুকে তুলে নেয়, প্রকৃত সাধু-পুরুষও হবেন তেমনি। তাঁর থাকবে সমদৃষ্টি আর সমবুদ্ধি। তাঁর প্রেম একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাঁর প্রেম সকলের জন্য,—চাই সে নিজ সম্প্রদায়ের হউক, চাই বা সে বাইরেরই হউক। তাঁর প্রাণ সকলের জন্য, তাঁর উৎসর্গ সকলের জন্য, তিনি সর্ব্বজীবহিতপ্রদ,—ক্ষুদ্রতার বা ভেদবুদ্ধির স্থান তাঁর হৃদয়ে নেই।

গুরু হইবার যোগ্যতা

তৎপরে গুরু সম্বন্ধে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিষ্যকে যিনি উপদেশ দিয়ে অসৎ পথ হ'তে ফিরাতে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। উপদেশ যেখানে নিষ্ফল, সেখানে যিনি আদেশের বলে তাকে সৎপথে আনতে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। আদেশও যেখানে ব্যর্থ, সেখানে যিনি ইচ্ছার বলে শিষ্যের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দূর কত্তে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। ইচ্ছার শক্তি যেখানে নিষ্ফল, সেখানে যিনি প্রেম দিয়ে

শিষ্যকে জয় কত্তে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। আর প্রেমও যেখানে নিষ্ফল, সেখানে যিনি উপেক্ষা দিয়ে, ঔদাসীন্য দিয়ে শিষ্যকে সংশোধিত কত্তে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। বিদ্রোহী শিষ্যের পদাঘাত যিনি ভৃগু-পদচিহ্নের মত সাদরে বুকে ধ'রে রাখতে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। মাথায় লাঠি ভাঙ্গলেও যিনি অভিসম্পাত করেন না, তিনি গুরু হবার যোগ্য। এই যোগ্যতা যাঁর নেই, তিনি দীক্ষা দিতে পারেন কিন্তু গুরু হ'তে পারেন না।

শিষ্য হইবার যোগ্যতা

তৎপরে আবার শিষ্যের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুর উপদেশকেই যিনি আদেশের মত মনে করেন, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর আদেশ-পালনে মৃত্যুকেও যিনি গ্রাহ্য করেন না, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর ইচ্ছাকে অলঙ্ঘনীয় জেনে যিনি তার সাথে নিজ ইচ্ছার অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত কত্তে পারেন, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর নিকট যিনি অকপট, গুরুর শক্তিতে যিনি বিশ্বাসী, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় যিনি গুরুর মর্য্যাদা-রক্ষাকারী, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর অভিপ্রায় যিনি ইঙ্গিতে বোঝেন, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর প্রেম, স্নেহ, আদর ও ভালবাসা যাঁকে অহঙ্কারে, স্ফীত বা কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ করে না, গুরুর সহজ বিশ্বাসকে যিনি কপটতা বা অসততা দিয়ে কখনো আহত করেন না, গুরু-দ্রোহিতাকে যিনি মৃত্যু-যন্ত্রণার চাইতেও ভয়াবহ মনে করেন, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর রুষ্টভাষণে বা ক্রুদ্ধ ব্যবহারে যিনি সর্পের ন্যায় দংশনোদ্যত হন না, গুরুর উপেক্ষাকে

যিনি সহিষ্ণুতা-সহকারে বহন কত্তে পারেন, গুরুর অভিশাপকেও যিনি হাসিমুখে মাথা পেতে নেন আশীর্ব্বাদ-জ্ঞানে, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। এই যোগ্যতা যাঁর নেই, তিনি দীক্ষা গ্রহণ কর্ল্লেও প্রকৃত শিষ্য হ'তে পারেন না।

পুপুনকী আশ্রম,
২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৫

সম্প্রদায়-সম্প্রসারণের নির্দ্দোষ উপায়

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি একজন রোগীর জন্য ঔষধ তৈয়ার করিতেছেন। এই সময়ে সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথা উঠিল। একজন কর্ম্মি-ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—সম্প্রদায়-বৃদ্ধিরও প্রয়োজন আছে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্থলবিশেষে সম্প্রদায়-বৃদ্ধির প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু সম্প্রদায়-বুদ্ধির কোনও প্রয়োজন নেই। সম্প্রদায়-বৃদ্ধি যদি নির্ভর করে সম্প্রদায়-বুদ্ধির উপর, অর্থাৎ চালাকীর উপর, ক্যান্‌ভাসের উপর, বাক্‌চাতুর্য্যের উপর, কূটনীতির উপর, তা হ'লে সেটাকে বৃদ্ধি না ব'লে ক্ষয় ব'লে গণনা কত্তে হবে। কারণ, তাতে আয়তনে সম্প্রদায় বাড়তে পারে কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের নৈতিক নিষ্কলুষতা কমতে থাকে। একটা মিথ্যা দশটা মিথ্যাকে সৃষ্টি ক'রে, একটা অন্যায় দশটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। ফলে পাপকে পুণ্য ব'লে চালাতে আর দ্বিধা হয় না। সুকঠোর সাধনাই হচ্ছে সম্প্রদায়-বৃদ্ধির মূল কৌশল। লক্ষ্য-পথে প্রাণপাতের সঙ্কল্প নিয়ে দৃঢ়বিক্রমে সাধনপথে অগ্রসর হ'লে দল-পুষ্টি আপনিই হ'তে থাকে, তার

জন্যে কোনও কৃত্রিম-প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়ে না। মূলধনে যেখানে ঘাটতি, মিথ্যা-প্রচারের প্রয়োজন ত' মাত্র সেইখানে।

মস্ত দলের নিষ্প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—সঙ্ঘ গড়্‌তে হ'লেই একেবারে দশ লাখ লোক এনে জড় কত্তে হবে, কর্ম্মোযোগ-শাস্ত্রে এমন কোনও মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। সহস্র সহস্র নিষ্কর্ম্মা, অলস, বাক্যবিলাসী, আড়ম্বর-প্রিয়, নামকা-ওয়াস্তে সঙ্ঘী বরং সঙ্ঘের সজীবতাকে নষ্ট করে, সঙ্ঘ-কর্ম্মীর চরিত্রের কঠোরতাকে পণ্ড করে। তার চেয়ে বাছা বাছা দুটী চারটী লোকই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়ঃ। কারণ, সঙ্ঘকর্ম্মীর চরিত্রের সজীবতা তাতে প্রতিযোগিতায় বাড়্‌তে থাকে,—তার কর্ম্মশক্তি বাড়ে, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, সৎসাহস বাড়ে, দৃঢ়তা বাড়ে, অধ্যবসায় বাড়ে, নিষ্ঠা বাড়ে। আর জগতের যত অসাধ্য সাধন, তা' ত' মুষ্টিমেয় লোকেই করে, হীরার টুকরার মত দুর্ল্লভ এক একটী কর্ম্মী অর্জ্জুনের মত এক এক অক্ষৌহিণী সংসপ্তক সেনার গতিরোধ ক'রে দাঁড়ায়।

মুষ্টিমেয় কর্ম্মী অসাধ্য-সাধন কখন করে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য আমি বলছি না যে, জনসাধারণ চতুর্দ্দিক হ'তে এসে একটু একটু ক'রে ঘৃতাহুতি না দিলে মুষ্টিমেয় কর্ম্মীরা কখনও জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ ক'রে বৃথাপরানিষ্টকারী বিষধর ভুজঙ্গম-কুলকে ধ্বংস কত্তে পারেন। দিগ্বিজয়ী রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞও শুধু পঞ্চপাণ্ডবের দ্বারাই নির্ব্বাহ হয় নাই, নানা দিগ্‌দেশ হ'তে সহস্র সহস্র রাজা,

সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, সহস্র সহস্র আর্য্য, অনার্য্য কিরাত, যবন, শক, হূণ, ম্লেচ্ছ, পারদ প্রভৃতি এসে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে যথাসাধ্য মুক্তহস্তে দান করেছিলেন। এমন কি, চিরবিরোধী যে দুর্য্যোধন, তাঁকেও এসে কোষাধ্যক্ষের কর্ম্ম কত্তে হয়েছিল। অথচ পাণ্ডবগণ ত' ছিলেন মাত্র পাঁচটী ভাই। পাঁচটী ভাই নিজেদের যোগ্যতার বলে সমগ্র ভারতবর্ষকে জয় করেছিলেন, তবে না সবাই এসে রাজসূয়-যজ্ঞ-প্রাঙ্গণে সহায়তাকারী-রূপে সমবেত হয়েছিলেন। কেউ বিজিত হয়েছিলেন বিক্রমে, কেউ অনুগত হয়েছিলেন সম্মাননায়, কেউ বাঁধা পড়েছিলেন প্রেমে, কেউ অবনমিত হয়েছিলেন শিষ্টাচারে। কিন্তু কোনও না কোনও প্রকারে সকলকে জয় কত্তে হয়েছিল, তাই মুষ্টিমেয় পাঁচটী ভাই, রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটদের পক্ষেও যা অতিশয় দুর্ল্লভ, এমন সুবিশাল মহাযজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হয়েছিলেন। সঙ্ঘ ছোট হউক, তাতে কিছু যায় আসে না, যদি সঙ্ঘমধ্যবর্ত্তী কর্ম্মীরা নিজ নিজ যোগ্যতার বলে দিগ্বিজয় কত্তে পারেন। তাঁদের যদি জ্ঞানের বল থাকে, বুদ্ধির বল থাকে, অধ্যবসায়ের বল থাকে, সহিষ্ণুতার বল থাকে, কর্ম্মঠতার বল থাকে, চরিত্রের বল থাকে আর সর্ব্বোপরি সর্ব্বালিঙ্গনকারী অপরিমেয় প্রেমের বল থাকে, ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁরা জয় কত্তে পার্ব্বেন এবং যেদিন তাঁরা রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন কর্ব্বেন, সেদিনই চীন থেকে, তিব্বত থেকে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর থেকে, নেপাল থেকে, গান্ধার থেকে, পারস্য থেকে, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে, হিমগিরির গহ্বর থেকে, আল্পস, আন্দিজ, পিরানীজের গুহা থেকে যজ্ঞীয় দ্রব্যের অপ্রত্যাশিত উপঢৌকন-সমূহ ঠিক সময় মত এসে পৌছাবে।

মুষ্টিমেয় কর্ম্মী অসাধ্য-সাধনের শক্তি কোথায় পায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মুষ্টিমেয় কর্ম্মী তাদের অসাধ্য-সাধনের শক্তি পায়, পরস্পরের প্রেমের গভীরতা থেকে। যেখানে সহস্র কারণ সত্ত্বেও পরস্পরের বুদ্ধিভেদ জন্মে না, সহস্র কৌশল ক'রেও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা যায় না, সেখানে তিনটি কর্ম্মীই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব কেড়ে নিতে পারে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারে, বাসুকীর ঘাড় থেকে পৃথিবীটাকে এক টানে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের কাঁধে বইতে পারে। যেখানে পরস্পরের মধ্যে সুগভীর বিশ্বাস বর্ত্তমান এবং প্রত্যেকের মধ্যে অটল আত্ম-প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সহস্র-যুগ-সাধ্য ত্রিলোক-বিস্ময়কর কার্য্য সম্পাদিত হয় কটাক্ষের ইঙ্গিতে। যেখানে প্রত্যেকের মধ্যে অপরিসীম কর্ম্ম-ক্ষমতা কিন্তু কর্ত্তৃত্ব-লোভ নেই কারো মধ্যে এক কণা, সেখানে সমুদ্র-শোষণ তুচ্ছ কাজ, হিমাচল-লঙ্ঘন তুচ্ছ কাজ, চন্দ্র-সূর্য্যকে কক্ষচ্যুত করা তুচ্ছ কাজ।

কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সার অপকারিতা

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বাবা, কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সাই শেষটায় সব বড় কাজ পণ্ড ক'রে দেয়। কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সা প্রেমকে বিকৃত করে, ঐক্যকে শিথিল করে, মনকে নীচ করে, বুদ্ধিকে কলুষিত করে, চেষ্টাকে স্বার্থদুষ্ট করে, বিশ্বাসকে টলিয়ে দেয়।

কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সা নিবারণের উপায়

জনৈক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সা দমনের কি কোন উপায় নেই ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আছে। সদাজাগ্রত ধর্ম্মবুদ্ধি আর নিয়ত সতর্ক আত্মপরীক্ষা,—এই দুইটীই হ'ল কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সার মহৌষধ। কিন্তু অকপট ভগবৎ-সাধনা ব্যতীত এ দুটী মহামূল্য বস্তু লাভ করা যায় না।

পুপুনকী আশ্রম,
২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৫

নবযুগের অরুণাচল

রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া মাঠের কাজ করা আজকাল একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। আকাশের অবস্থা নিতান্ত প্রতিকূল না হইলে প্রায় কোনদিনই ইহা বাদ যায় না। আজও রাত্রিতে কাজ চলিতেছে।

জনৈক ব্রহ্মচারী সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, এই সময়ে যদি অন্য কোনও মিশনের কোনও সাধু এখানে হঠাৎ এসে উপস্থিত হন, আর দেখেন যে আমরা বেদান্ত-চর্চ্চা বা ঈশ্বর-ধ্যান না ক'রে কোদালের কাজ কচ্ছি, তা' হ'লে তিনি কি মনে কর্ব্বেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিলেন,—যার মনে আগে থেকে যা আছে, তিনি তাই মনে করবেন। যিনি মায়াবাদী এবং সংসারকে অসার ব'লে মনে করেন, তিনি ভাববেন,—"এ কিরে বাবা বিষয়-লিপ্ততা, এ যে বন্ধন-বৃদ্ধির রাজপথ!" যিনি সংসারের দুঃখ দেখে পালিয়ে বাঁচবার জন্য আর নির্ব্বিঘ্নে ব'সে দুমুঠো খাবার জন্যেই সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, তিনি ভাববেন —"এ কিরে ক্ষ্যাপামি, কেনই বা এই বৃথা শ্রম, ব'সে থাকলেও ত' গৃহীরা দু'বেলা খেতে দেবে গো!" আর যিনি স্বদেশের সেবা-বুদ্ধি নিয়ে সংসারাসক্তি বর্জ্জন ক'রেছেন, নিজের মুক্তির জন্য যতটা নয়, পরের জন্যে তার দশগুণ তপস্যা ক'রেছেন, পরার্থে উপবাস অর্দ্ধাশন সহ্য ক'রেছেন, জাতি, কুল, সমাজ, স্বদেশ ও রাষ্ট্রের উৎপীড়ন মাথা পেতে নিয়েছেন, তিনি এসে ভাববেন,—"নবযুগের অরুণাচলে এসেছি, এইখানেই জাতির দুর্ভাগ্য-মোচনের গোড়া-পত্তন হচ্ছে।"

অভিক্ষা ও জাতীয় জীবন

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন একথা বলছি জানিস্? জাতীয় সাধনায় আজ অভিক্ষার চেয়ে বড় মন্ত্র নেই, বড় সাধন নেই, বড় উপায় নেই। ভিক্ষালুব্ধতাই এ জাতির পরবশতাকে চিরস্থায়ী ক'রে রেখেছে। সেই কায়েমী দুর্ভাগ্য ঘুচাতে যে দেবতার ষোড়শোপচার পূজা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, তার নাম অভিক্ষা। এই দেবতার পাদপীঠ আত্ম-বিশ্বাস-স্ফীত বক্ষ, সিংহাসন বাহুবল, মুখজ্যোতি মৃত্যু-সঙ্কল্প।

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিতে লাগিলেন,—এই যে তোরা আধপেটা খেয়েও কাজ কচ্ছিস্ অসুরের মত, বল্ দেখি এ শক্তি যোগাল কে? অভিক্ষা নয় কি? ভিক্ষা ক'রে আশ্রম চালাবার নিয়ম যদি থাক্ত, তা' হ'লে কি সাত টাকায় চারজন কর্ম্মীর মাসের খোরাকী চালাবার সাহস কত্তে তোরা পার্ত্তিস? এই যে কোন দিন ঢেঁড়শ গাছের পাতা সিদ্ধ ক'রে কোনও দিন পলাশ ফুল সিদ্ধ ক'রে রন্ধন-বিদ্যার রিসার্চ্চ কর্লি, সে সব প্রেরণা নিয়ত কে যোগাচ্ছে রে? অভিক্ষা নয় কি? কাঁচা ঝিঙ্গা, কচি জনারের পাতা, কচি শাল পাতা চিবিয়ে খেয়ে

ক্ষুন্নিবৃত্তি করার দৃষ্টান্ত অভিক্ষার উপাসক ছাড়া আর কে দেখাতে পার্ত্ত?

অভিক্ষায় অবিশ্বাসের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যক্তিগত ভাবে আমার ত' ভক্তের অবধি নেই। কিন্তু ওরা কেউ অভিক্ষায় বিশ্বাস করে না। আমাকে ওরা একটা অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টিছাড়া মানুষ ব'লে মনে ক'রে, কেউ বা আমাকে দৈববলে বলীয়ান্ ব'লে ভ্রম করে, কিন্তু অভিক্ষায় বিশ্বাস করে না। নিজেরা কোনও কাজ আরম্ভ কত্তে প্রথমেই কল্পনা করে চাঁদার ফন্দীর। এর কারণ জানিস? এর কারণ হচ্ছে আত্ম-অবিশ্বাস, নিজের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং তজ্জনিত আস্থাহীনতা।

দলপন্থী ও বলপন্থী

অতঃপর কাজ করিতে করিতে দল ও বলের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি রাজনৈতিক জগতে, কি সমাজ-মধ্যে, কি ধর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই চারি প্রকারের লোক থাকেন। এক প্রকারের লোক থাকেন, যাঁরা শুধু দল বাড়াবার জন্যই ব্যস্ত, এখন এ দলবৃদ্ধির দ্বারা বলবৃদ্ধি হোক আর নাই হোক। হুজুগ পাকাতে এঁরা খুব মজবুত কিন্তু এই হুজুগে আসল উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হবে, তা' বিবেচনার অবসর এঁদের নেই। সদস্যের খাতায় একবার নাম সই করাতে পারলেই এঁরা কৃতার্থম্মন্য হলেন এবং যাদের টানাটানি ক'রে দলে ভর্ত্তি কচ্ছেন, তাদের উপস্থিতির ফলে সম্প্রদায় বা সঙ্ঘ শক্তিহীন বা ভ্রষ্টাদর্শ হবে কিনা, সে বিচার এঁরা অনাবশ্যক ব'লে মনে করেন। দেশ

স্বাধীন করার স্বপ্ন যদি এঁরা একবার দেখেন, তা' হ'লে কাকে দিয়ে এমন সুকঠিন কাজ হ'তে পারে, আর কাকে দিয়ে হ'তে পারে না, কে অবহেলে ফাঁসী কাঠে ঝুলবে, আর কে সরকারী সাক্ষী দেবে, তা' বিচার না ক'রেই এঁরা একধার থেকে আনন্দ-মঠের সন্তান-সেনা সংগ্রহ কত্তে থাকেন। নারী-নির্য্যাতন নিবারণ করার কল্পনা যদি এঁদের মনে জাগে,—তাহ'লে এঁরা যাকে তাকে ধ'রে এনে নারী-রক্ষীর দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার অর্পণ করেন, একবার বিচার করেন না, এই লোকগুলিই সুযোগ পেলে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপরে হাত দেবে কি না। ধর্ম্ম-প্রচারের খেয়াল যদি এঁদের মনে ঢোকে, তবে এঁরা দুনিয়ার সকল লোককে এনে ধর্ম্মের পিঞ্জরাপোলে ভর্ত্তি করেন, ভেবে দেখেন না, এরা বিড়াল-তপস্বী সেজে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম ক'রে, ন্যায়ের নামে অন্যায় ক'রে, তপস্যার নামে ব্যভিচার ক'রে, ব্রহ্মচর্য্যের নামে পর-দার ক'রে, সংযমের নামে মদ্যপান ক'রে, ধর্ম্মের ধ্বজাটাকেই সার কর্ব্বে কি না,—এরা হলেন দলপন্থী। আর এক প্রকারের লোক থাকেন, যাঁরা দলের নাম শুনলে হৃষ্ট হন না, সঙ্ঘ, সম্প্রদায়, সমিতি বা মিশন প্রভৃতির আওতা ছেড়ে নিরিবিলি স্বাধীন ভাবেই আত্মগঠন করেন, নিভৃতে বল সঞ্চয় করেন। স্বদেশের স্বাধীনতার সুযোগ দেখলে এঁরা বিনা বাক্য-ব্যয়ে কামানের সামনে বুক পেতে দেন, সমাজ-সেবা কত্তে হ'লে যশোলিপ্সার ধার না ধরে, দশ জনকে নিয়ে জটলা না পাকিয়ে, বেশী বক্তৃতার বহরে না গিয়ে যা করবার ক'রে ফেলে নিশ্চিন্ত হন ; ধর্ম্মের ব্যাপারেও বাহ্য ভড়ং ত্যাগ ক'রে নিজের সাধন

নিজে ক'রে যান, পরকে উপদেশ দেবার আগ্রহাতিশয্য বর্জ্জন ক'রে, গুরুগিরির বুদ্ধি পরিহার ক'রে দিনের পর দিন নিজেরই উন্নতিটুকুকে বাড়াতে থাকেন। এঁরা বল-পন্থী।

দল-বল-পন্থী ও বল-দল-পন্থী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অপর এক শ্রেণীর লোক থাকেন তাঁরা খুব এক চোট দল গড়তে থাকেন, দিক্-পাশ না তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে শুধু সম্প্রদায়েরই বিস্তার ক'রে যেতে থাকেন, তারপরে হাঁপ ছেড়ে একটু বিশ্রাম ক'রে নিয়ে সম্প্রদায়ের লোকগুলিকে বলশালী কর্ব্বার চেষ্টা করেন। সরু সরু থামের উপরে একখানা ভারী ঘর প্রস্তুত কর্লে শেষে যেমন থামের দুর্ব্বলতা দেখে ঘরকে বাঁচাবার জন্যে আবার কতকগুলি ঠেকনা দিয়ে দিতে হয়, এঁদের অবস্থা কতকটা তেমনি হয়। কারণ, হুজুগে আকৃষ্ট হ'য়ে এসে যারা সম্প্রদায়ের পুষ্টি-সাধন ক'রে, তারা আর সহজে বল-পন্থী হ'তে চায় না। ফলে, বলপন্থী লোক্‌দের আকৃষ্ট ক'রে এনে সম্প্রদায়ের বল-বৃদ্ধির চেষ্টা দেখতে হয়।—এঁরা হ'লেন দল-বল-পন্থী। আর এক শ্রেণীর লোক থাকেন, তাঁরা দল-বিদ্বেষী নন, সম্প্রদায়ের প্রয়োজন তাঁরা অস্বীকার করেন না, কিন্তু যাকে তাকে দিয়ে সম্প্রদায় পুষ্ট করা তাঁরা অমঙ্গলজনক মনে করেন। তাঁদের আর এক বিশেষত্ব এই যে, নিজেদের বলবৃদ্ধির দিকে তাঁদের ষোল আনা নজর থাকে এবং দলবৃদ্ধির চেষ্টাতে তাঁরা ইচ্ছা ক'রে কখনই লিপ্ত হন না, বলবৃদ্ধির ফলে আপনিই তা' ঘটে। এঁরা হ'লেন বল-দল-পন্থী।

কোন্ পন্থা শ্রেষ্ঠ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রশ্ন করিলেন,—বল দেখি, তোমরা এর মধ্যে কোন্ পন্থী হবে ?

একজন ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন,—বল-দল-পন্থী।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্ম-সাধনায় তোমরা হবে বল-দল-পন্থী কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনায় তোমাদের থাক্‌তে হবে একমাত্র বলপন্থী। সাধন-ভজনে দল এলে আধ্যাত্মিক জীবন রসহীন ও বিস্বাদ হ'য়ে যায়।

সমবেত উপাসনা ও বলপন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই ব'লে ভুল ক'রে এই কথা আবার ভেবে ব'সো না যে, সমবেত ভাবে বহু লোক একত্র উপাসনা কর্লে, তা দ্বারা বলপন্থার বিরোধ করা হয়। তুমি নিজের ব্যক্তিগত সাধন প্রত্যহ অবশ্যই অতি নিভৃতে নিয়মিত কর্ব্বে, উপরন্তু সপ্তাহে একদিন ক'রে সমমতী সমপথী সমধর্ম্মী ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিয়ে সমবেত উপাসনাও কর্ব্বে। এই সমবেত উপাসনা আত্মপ্রচারের জন্যও নয়, তোমাদের দলকে বাড়াবার জন্যও নয়, পরন্তু যে কয়জন সমসাধনে দীক্ষিত, তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা-বোধ ও ঐক্যকে ঘনীভূত করারই জন্য। এতে বল বাড়ে। সুতরাং সমবেত উপাসনা তোমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই কর্ত্তব্য।

সমবেত উপাসনা ও সমদীক্ষিত ব্যক্তি

একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—সমবেত উপাসনা সমদীক্ষিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনেই আবির্ভূত। কিন্তু

ভিন্ন-মতে দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও যদি এতে যোগদানের আগ্রহ আসে, তা হ'লে তাঁদের সম্মুখে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁদের আমন্ত্রণ ক'রে আনাও সঙ্গত হবে। কিন্তু সমবেত উপাসনার সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী কারও জন্যই পরিবর্ত্তিত হবে না। অমুকে তোমার সঙ্গে এক মতে এক পথে দীক্ষিত নয় ব'লে সমবেত উপাসনায় যোগদানের অধিকার তাঁর নষ্ট হয় নি। কিন্তু তিনি যদি ভক্তিভাব নিয়ে না আসেন, তিনি যদি শুদ্ধ দেহে না আসেন, তিনি যদি সমবেত উপাসনার নিয়ম-প্রণালী সুষ্ঠুরূপে অনুসরণের বাধাস্বরূপ হন, তবে তাঁকে নিয়ে কি ক'রে সমবেত উপাসনা কর্ব্বে? মূলতঃ সমবেত উপাসন সমদীক্ষিতদের মধ্যে বাধ্যকর, অতিরিক্ত নরনারীদের নিয়েও সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করা প্রশস্য কিন্তু বিরুদ্ধবাদী, বিরুদ্ধকারী, অভক্ত, অশুচি, পানোন্মত্ত বা অসদুদ্দেশ্যে সমাগত ব্যক্তিদের নিয়ে করা সর্ব্বসময়ে হিতকর নাও হ'তে পারে।

পুপুন্কী আশ্রম,
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৫

সৈনিক-জীবনের দুঃখ

অদ্য প্রাতঃকালে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্রম-দর্শনে আসিলেন; ইনি—আর কেহই নহেন,—গান্ধানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিশ্র। ইনি আশ্রমের জীর্ণদশাপন্ন ক্ষুদ্র একমাত্র কুটীরখানি দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং নানা প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঘরের বেড়ার ছিদ্র দিয়া সমগ্র বর্ষাকালই চতুর্দ্দিক হইতে গৃহমধ্যে বৃষ্টি আসিয়াছে, কোনও দিন জলে চুল্লী নিবিয়া গিয়াছে বলিয়া আশ্রমে রান্না হয় নাই, কোনও দিন

শয়ন করিবার চট ও কম্বল ভিজিয়া গিয়াছে, সুতরাং রাত্রিতে নিদ্রার কষ্ট গিয়াছে। কোনও দিন ইহা অপেক্ষাও কষ্টকর অসুবিধা গিয়াছে। বনের গাছের ডাল বাঁধিয়া তাহাতে মাটি লেপিয়া ঘরের বেড়া করা হইয়াছিল, বৃষ্টিতে মাটি ভিজিয়া কাদা হইয়া সব পড়িয়া যাওয়াতে ঘরে হু হু করিয়া বাতাস আসে, আর সাপের উপদ্রবও বাড়িয়াছে। আগন্তুক যোগেন বাবু বারংবার মনের খেদ প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মীরা ত' সব সৈনিক। আমি তাদের এই দুঃখকে দুঃখ ব'লেই মনে করি না। দুঃখ যে কর্ম্মীর জীবনের স্পর্শমণি, দুঃখের পীড়ন ছাড়া যে যোদ্ধার জীবন-কুসুম প্রস্ফুটিতই হয় না।

জীবন-লক্ষ্য নির্ণয়ে সাধন-ভজনের শক্তি

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা-নিবাসী জনৈক যুবককে একখানা পত্র লিখিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ—

"তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তোমার সদবুদ্ধি আমার বক্ষ উল্লাসে স্ফীত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাছা, জীবনের প্রথম প্রভাতেই কেহ নিশ্চিত করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে না যে, সংসার বা সন্ন্যাস ইহাদের মধ্যে কোনটাকে জীবন-কুঞ্জে ডাকিয়া আনিয়া পূজার অঞ্জলি প্রদান করিবে, কাহার পদতলে আত্ম-সমর্পণ করিবে। সাধন-ভজন করিতে করিতেই মানুষ নিজের প্রকৃত যোগ্যতা জানিতে পারে এবং তখনই সে নিজের যোগ্যপথ বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়। তোমাকেও আজ সাধন-নিরত হইতে হইবে এবং সাধনের প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত করিয়া লইতে হইবে। প্রজ্ঞাচক্ষু কখনও ভুল দেখে না, এইজন্য উহাই পথ-নির্দ্দেশের নির্ভর-যোগ্য গুরু।"

গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভর

ত্রিপুরা-নিবাসী এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শিষ্যের যদি না থাকে গুরুর উপরে অসীম নির্ভর, আর গুরুর যদি না থাকে শিষ্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, তাহা হইলে কখনই উভয়ের মধ্যে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না এবং শিষ্যকে দিয়া যেমন একদিকে গুরু জগৎ-কল্যাণ করাইতে অসমর্থ হন, অপরদিকে তেমনি শিষ্য গুরুর জীবন, কর্ম্ম, চিন্তা ও বাক্য হইতে মনুষ্যত্ব-গঠনের, জীবনোৎকর্ষ-বিধানের ও লোক-কল্যাণ-সাধনের উপাদান-সংগ্রহে অসমর্থ হন। কিন্তু গুরু-শিষ্যের মধ্যে যেখানে এই পারস্পরিক নির্ভর ও বিশ্বাস অখণ্ড-সত্তায় বিদ্যমান, সেখানে রামদাস স্বামী শিবাজীকে দিয়া অনায়াসে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাইতে পারেন, শিবাজীও নিজ জীবনে গুরুর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও উদারতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনিন্দনীয় কৃতিত্বের সহিত রাজ্য-সৃষ্টি, রাজ্য-পুষ্টি ও রাজ্য-পরিচালন করিতে পারেন; সেখানে গুরু-নানকের এক একটী সংগুপ্ত ইচ্ছা ইতিহাসের বুকে স্মৃতি-চিহ্ন-অঙ্কন করিবার সামর্থ্য লাভ ক'রে, শিখবীরও গুরুজীর জয় গাহিতে গাহিতে অবহেলে কারাদণ্ড, নির্য্যাতন ও মৃত্যু-বরণ করিতে পারেন; সেখানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে নরেন্দ্রনাথকে দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্ব-শক্তির উপলব্ধি করাইয়া লইতে পারেন, বিবেকানন্দ গুরুবলে বলীয়ান হইয়া নিমেষ মধ্যে চিকাগোর দুর্গম গিরিসঙ্কটে পাশ্চাত্যের উপর ভারতের দিগ্বিজয় ঘোষণা করিতে পারেন।

"কিন্তু তাহার জন্য মনে করিও না, এই বিশ্বাসের এবং এই নির্ভর-সহজাত-সংস্কারের মত সকলের জীবনেই বিনা সাধনায়,

বিনা অধ্যবসায়ে, আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। অযুতবার অবিশ্বাস করিয়া অনেকের অন্তরে বিশ্বাসের জন্য চিরস্থায়ী আসন রচিত হইবে, নিযুত বার নির্ভর হারাইয়া অনেকের জীবনে পূর্ণ নির্ভরের, পূর্ণ আত্মসমর্পণের অমোঘ শক্তি জাগ্রত হইবে।''

এই পত্রখানা লিখিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি কথায় কথায় বলিলেন, —গুরু যদি শিষ্যের ভবিষ্যতে খুব বিশ্বাস রাখেন, তাতে শিষ্যের অসীম কল্যাণ। গুরুর বিশ্বাস শিষ্যকে অসাধ্য-সাধনে inspire (প্রেরণা দান) করে। আর, শিষ্য যদি গুরুতে নির্ভর রাখে, তাতে গুরুর প্রচ্ছন্ন সাত্ত্বিক শক্তিগুলি, সঙ্গোপিত কল্যাণ-প্রভাবগুলি শিষ্যের মঙ্গলের জন্য অদৃশ্য ও অপার্থিব ভাবে কাজ কর্ত্তে আরম্ভ করে।

গুরুদ্রোহ প্রশমনের উপায়

বলিতে বলিতে গুরুদ্রোহের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —গুরুদ্রোহ বড় ভয়ঙ্কর কথা, শুনতে বাস্তবিকই ভয় করে। কিন্তু সংযমী শিষ্যের অসংযমী গুরু, কর্ম্মী শিষ্যের অলস গুরু, কৃতী শিষ্যের অকৃতী গুরু, সবল শিষ্যের দুর্ব্বল গুরু, প্রেমিক শিষ্যের কামুক গুরু, স্বদেশ-ভক্ত শিষ্যের দেশদ্রোহী গুরু, ত্যাগী শিষ্যের ভোগী গুরু, সাধক শিষ্যের অসাধক গুরু এই দ্রোহকে ঠেকিয়ে রাখবেন কি ক'রে? যা স্বভাবের ধর্ম্ম, তা' কৃত্রিম উপায়ে ঠেকান যায় না। একটা জিনিস দিয়েই শুধু সকল প্রকার গুরুদ্রোহকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়া যায়, তার নাম প্রেম। কিন্তু সেই প্রেম সাধন-সমুদ্র মন্থনের দ্বারাই পাওয়া যায় এবং সেই মন্থনের মন্দর পর্ব্বত কত্তে হয় ইন্দ্রিয়-সংযমকে।

শিষ্যের বিদ্রোহে গুরুর উপকার

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিষ্য যদি বিদ্রোহী হয়, —তাতে গুরুর উপকার আছে। গুরু তাঁর নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতা, দোষ-ত্রুটী সব ধরতে পারেন। যার অনুগত বশ্যতা দেখে নয়ন আনন্দে নাচত, সে যখন গুরুর সম্মানকে, মর্য্যাদাকে, গৌরবকে লঙ্ঘন কত্তে সাহসী হয়, তখন গুরুর দৃষ্টি যায় নিজের অন্তরের পানে, তাঁর লক্ষ্য পড়ে যে, নিজের ভিতরে কোথাও কোন্ পাপ এতদিন অজ্ঞাতসারে শুধু বর্দ্ধিতই হচ্ছিল। শিষ্যের তীক্ষ্ণ অবিনয় তাকে দিয়ে অনুসন্ধান করিয়ে নেয়, নিজ চিত্তবৃত্তি কামে, ক্রোধে, স্বার্থপরতায় দূষিত হয়েছে কিনা, বাইরে ত্রিলোকপাবন জগদ্‌গুরুর অভিনয় কর্ত্তে গিয়ে কতবার ভিতরের সত্যকে পদাঘাত করা হয়েছে। এই ভাবে শিষ্যের বিদ্রোহ, দুর্ব্বিনয়, অসন্তোষ, কপটতা, ভক্তিহীনতা দিয়ে প্রকৃত গুরু নিজেকে লাভবান্ ক'রে নেন। এস্থলে ধর্ষণ-নীতি বা বর্জ্জন-পন্থা কোনও কাজের নয়। প্রজার বিদ্রোহ দেখে যেমন রাজার আত্ম-সংশোধন করা উচিত, শিষ্যের বিদ্রোহ দেখেও তেমনি গুরুর চরিত্র-সংশোধনে যত্ন দেওয়া উচিত। প্রজার অসন্তোষ যে রাজা অগ্রাহ্য করে, তার ধ্বংস অনিবার্য্য। যে গুরু শিষ্যের বিদ্রোহ দেখে আত্মশোধন করে না, তারও ধ্বংস অনিবার্য্য।

গুরুদ্রোহের স্বরূপ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি গুরুদ্রোহের স্বরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—গুরুকে ধ'রে দুই ঠেঙ্গা না মারলে গুরুদ্রোহ হ'ল না, তা' মনে ক'রো না। গুরুদর্শনে যখন তোমার

প্রাণে আনন্দ জন্মে না, তখনই বুঝতে হবে, সূক্ষ্মভাবে তুমি গুরুদ্রোহের পথে যাচ্ছ। গুরুবাক্য শ্রবণে যখন তোমার নির্ব্বিচারিত চিত্তে বিশ্বাস কত্তে অনিচ্ছা হবে, তখনই জানবে যে, তুমি বাইরে অশিষ্টতা প্রদর্শন কর আর না কর, ভিতরে ভিতরে গুরুদ্রোহী হ'য়েই আছ। গুরু-পাদস্পর্শে যখন তোমার প্রাণ সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, ব্যাকুলতায় ভগবৎ-প্রেমে বিগলিত হ'তে না চাইবে, তখন জান্‌বে, প্রকাশ্য গুরু-দ্রোহীর সাথে তোমার পার্থক্য শুধু বাহ্য ব্যবহারের। কিসে গুরুর সুখ সম্পাদিত হবে, কি কর্ল্লে তাঁর অন্তরের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন করা হবে, তা' জেনেও যখন তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পার্ব্বে, তখন জান্‌বে, তুমি প্রচ্ছন্ন গুরুদ্রোহী। যখন দেখ্‌বে, গুরুর জীবনের মহনীয় অংশগুলিকে তুচ্ছ ক'রে তোমার দৃষ্টি শুধু তাঁর দোষগুলিকেই অনুসন্ধান কত্তে চাচ্ছে, তাঁর মন্দগুলিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের কত্তে চাচ্ছে, তখন জানবে, তুমি গুরুদ্রোহী। গুরু-নিন্দা শ্রবণে যখন তোমার অন্তরে ক্লেশ জন্মাবে না, গুরু-নিন্দকের সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে যখন তোমার দ্বিধা-বোধ হবেনা, লোক-সমক্ষে গুরুদেবকে হেয় হ'তে দেখ্‌লে যখন প্রাণে বাজবে না, জান্‌বে, তখন তুমি অতি ভয়ঙ্কর একজন গুরুদ্রোহী। গুরুর রোগের সময় যদি শুশ্রূষা না কত্তে পার, ক্ষুধার সময় অন্ন না দিতে পার, ক্লান্তির সময় বিশ্রাম না দিতে পার, তবু তুমি গুরুদ্রোহী নও। কিন্তু মনে যদি তোমার অপ্রসাদ, অসন্তোষ, অবিশ্বাস, অবিনয় বা অমঙ্গল-ইচ্ছা থাকে, তা' হ'লেই তুমি গুরুদ্রোহী।

কর্ম্মী-গুরুর শিষ্যদের বিদ্রোহ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি কিছুক্ষণ ধীর স্থির হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন,—আমার সব ছেলে একবার ক'রে বিদ্রোহী হবে।

জনৈক ব্রহ্মচারী উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সবাই ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দু একটী বাদে।

ব্রহ্মচারী আতঙ্কের সহিত বলিলেন,—হায়রে,—গুরুদ্রোহীর আর রক্ষা নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমার যারা দ্রোহ কর্ব্বে, এজন্য তাদের কখনো কোনও বিপদ ঘটবে না। আমার এই আশীর্ব্বাদ তাদের উপর রয়েছে। আমি যে কর্ম্মী রে। অনেক ছেলের সঙ্গেই যে আমার কর্ম্মপন্থার গরমিল হবে। তারা চাচ্ছে কামান-বন্দুক-গোলা-বারুদের বলে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটাবে। আমার আশঙ্কা, ইংরেজ রাজত্ব চ'লে গেলেও দাসত্বের অবসান না ঘটতে পারে। আমি চাই সমূল প্রতিকার। তারা কচ্ছে উপস্থিত কর্ত্তব্য। কামান-বন্দুকের প্রতি আমার অরুচি তাদের দলবৃদ্ধির বিঘ্ন হচ্ছে। তাদের বিদ্রোহ না ক'রলে চলবে কেন ?

ব্রহ্মচারী।—তবে উপায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ওরা সব আবার আমার বুকেই ফিরে আসবে। কর্ম্মে হয়ত সবাই নয়, সাধনে। কর্ম্মমত বা কর্ম্মপথ ভিন্ন হ'লেই গুরুদ্রোহ হয় না রে, ভিন্ন কর্ম্মে হাত দিয়েছে ব'লে যারা সাধন-দ্রোহী হবে, তারাই গুরুদ্রোহী। নিজ কর্ম্মে লেগে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ এরা প্রত্যেকে এক এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পার্ব্বে যে,

গুরুদত্ত সাধন চেষ্টা ক'রেও পরিত্যাগ করা যায় না, কারাগৃহের অন্ধকারেও সে সাধন দিব্য-জ্যোতির মতন আত্মপ্রকাশ করে।

পুপুনকী আশ্রম,
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৫

সদ্‌গুরুর লক্ষণ

অদ্য কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সদ্‌গুরুর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, তাঁর অফুরন্ত প্রেম, পক্ষপাতহীন অনাবিল ভালবাসা। সদ্‌গুরুর কৃপা পেয়ে প্রত্যেক শিষ্যেরই মনে হ'তে থাকে, গুরুদেব আমাকে যত ভালবাসেন, এত আর কাউকে বাসেন না।

সৎশিষ্যের লক্ষণ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎশিষ্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে গুরুর ভালবাসায় অকপট বিশ্বাস। লাঠি-ঝাঁটা মারলেও শিষ্য ভাবেন, এর মধ্যেও গুরুর অফুরন্ত প্রেমই প্রকাশ পাচ্ছে। মহাত্মা ভোলানন্দ গিরিকে তাঁর গুরুদেব গোলাপ গিরি আজমীঢ়ের সেই অসহ্য শীতের মধ্যে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন, ভোলাগিরি শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ভাবতে লাগলেন, এর মধ্যেও গুরুদেবের কোনও মঙ্গলময় অভিপ্রায় রয়েছে।—এই হচ্ছে খাঁটি শিষ্যের লক্ষণ। খাঁটি শিষ্য ভাবেন,—গুরো, তোমার মত স্নেহ কারো কাছে পাই নি, পাব না, পেতে চাইও না।

কামদমনে কর্ম্মশীলতা ও সাধন-শক্তি

অদ্য শ্রীহট্ট-নিবাসী জনৈক যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কামদমনের উপায় নিয়ত কর্ম্মশীলতা। শুনিয়াছি লাহোরে আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ যখন কলিকাতা আসিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কাম-রিপুর সহিত তাঁহার দেখাশুনা হয় কি না। স্বামী দয়ানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন,—'দিবারাত্রি আমি এমন কর্ম্মব্যস্ত থাকি যে, আমার দুয়ারে হানা দিবার অবসরই কাম পায় না, দেখা হওয়া ত দুরের কথা।' নিয়ত কর্ম্মশীলতার এই মহিমার কথা যথার্থ। কিন্তু কর্ম্মশীলতার দ্বারা সব সময় সকলের অন্তরের প্রচ্ছন্ন পাপ-সংস্কার-সমূহ দূর হয় না, প্রাক্তন-সংস্কারকে ধ্বংস করিবার জন্য চাই সুতীব্র ভগবৎ-সাধন। সাধন-হীন কর্ম্মীর জীবনে কাম এক একটা প্রবল ধাক্কা লইয়া আসে, হঠাৎ তাহাকে দিয়া একটা অপ্রত্যাশিত কদর্য্য কার্য্য করাইয়া লইয়া অনেকখানি আত্মবিশ্বাস ও পুরুষকারকে একেবারে চুরমার করিয়া দিয়া বিপুল আত্মগ্লানির তীব্র হলাহল ঢালিয়া রাখিয়া আবার অন্তরে লুকায়। এই অপ্রত্যাশিত কামকে রুখিবার জন্য, এই প্রাক্তন কাম-সংস্কারকে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার জন্যই সাধন-শক্তি প্রয়োজন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তাঁহার মনে কখনও কাম-ভাব জাগে কিনা। গোস্বামীজী বলিয়াছিলেন, —'দুই তিনদিন ক্রমাগত কামভাব উদ্দীপনের জন্য চেষ্টা করিলে হয়ত জাগিতে পারে।' এই যে নিষ্কাম সাম্যময় চিত্তের অপূর্ব্ব সুস্থির অবস্থা, ইহা সাধন-কল্পতরুরই মৃত্যু-নিবারক ফল।"

গার্হস্থ্য জীবনে পূর্ণতার পথ

নোয়াখালী জেলা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গৃহি-জীবনে স্বামী পত্নী উভয়ের ভিতরে সমান দৃঢ়তা ও বলবত্তা থাকা আবশ্যক। কি বিপদে-আপদে অবিচলতায়, কি সুখে-সম্পদে নিরহঙ্কারতায়, কি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে উৎসাহ-উদ্দীপনায়, কি সন্তান-পালনের সুচতুরতায়, কি স্বাদেশিকতার সুগভীরতায়, কি ইন্দ্রিয়-সংযমের সুসমর্থতায়, সর্ব্ববিষয়ে দুই জনকে সমকক্ষ হইতে হইবে,—অন্ততঃ পক্ষে সমান হইবার জন্য চেষ্টা পাইতেই হইবে। কৃষি করিতে হইলে কোদালের বাট ও ফলা উভয়ই সমান শক্ত হওয়া দরকার, একটী শক্ত হইয়া যদি অপরটী নরম হয়, তাহা হইলে দু-য়ের মিলন কখনও প্রকৃত কার্য্যকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না,—শুধু অনর্থ ও কার্য্যহানিই সৃষ্টি করে, পদে পদে অসুবিধা, অসঙ্গতি, বৃথা কালক্ষেপ সৃষ্টি করিয়া মিলনকে অবাঞ্ছনীয় ও বিরক্তিকর করিয়া তোলে।

"কাঁচা ইট দিয়া কূয়া বাঁধান চলে না, কারণ, এখন উহাকে যত শক্তই দেখিতে, জল পাইলেই উহা গলিয়া যাইবে। কূয়া বাঁধিবার জন্য তপস্যার তীব্র অগ্নি-সন্তাপে কাঁচা ইটকে পাকা এবং পারিলে ততোধিক—একেবারে ঝামা—বানাইতে হইবে। ঝামার ইটা জলে গলিবে না।

"কাদার গাঁথুনী দিয়াও কূয়া বাঁধান চলে না, কারণ, ইট যতই শক্ত হউক, ভাল করিয়া জল লাগিলে কাদা আর ইটাকে বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, অল্পকাল-মধ্যেই স্তূপীকৃত অত্যুৎকৃষ্ট ইট শুধু গাঁথুনীর দোষে ধ্বসিয়া পড়িবে।

"এই জন্য চাই পাকা ইটের সুরকি, ধূলিবর্জ্জিত বালি, আর পাথর-পোড়া তাজা চূণ। ভাল ইটায় আর ভাল মশলায় কূয়া

গাঁথ, হাজার বছরের জলসিক্ততাও গাঁথুনি ভাঙ্গিতে পারিবে না।

"গার্হস্থ্য-জীবনে স্বামী হইতেছেন ইট, আর স্ত্রী হইতেছেন গাঁথিবার মশলা। এই দুইটী জিনিসই যতক্ষণ না বিশুদ্ধতা-প্রাপ্ত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গার্হস্থ্য-জীবনে ধ্বসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা পদে পদে। ততক্ষণ পর্যন্ত শত চাপিয়াও ইটা তার মশলাকে ধারণক্ষম করিতে পারে না, অসংযমের জল-স্পর্শে সে সকল বাঁধন খুলিয়া দেয়। ততক্ষণ পর্যন্ত শত টানিয়াও মশলা ইটাগুলিকে একত্র সংবদ্ধ রাখিতে পারে না, লালসার তরল জল তাহাকে গলাইয়া আকারভ্রষ্ট করিয়া অধঃপাতিত করে।

"গার্হস্থ্য-জীবনের এই যে বিশুদ্ধতা, তাহা লব্ধ হইতে পারে একমাত্র অকপট সাধনের ফলে। কিছু পূর্ব্বে যে বলবত্তা ও দৃঢ়তার সাম্যের কথা বলিয়াছি, তাহাও আসিতে পারে একমাত্র সাধনের পথেই। ভগবানের নামের যোগে যে বিশুদ্ধতা, আর স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের যোগে যে সাম্য, তাহাই সমস্ত জীবনের প্রত্যেকটী রণাঙ্গনে বিশুদ্ধতা আর সামর্থ্য-সাম্যের সঞ্জনন করে। যতদিন এই পথে না দম্পতী পাদ-চারণা করিবে, ততদিন তাহাদের জীবনের পূর্ণতা একটা কথার কথাই থাকিয়া যাইবে।"

ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের আবশ্যকতা

ত্রিপুরা জেলা-নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"লোকের কথা বাবা কেন শুনিতে যাইবে? যদি বিশ্বাস করিয়া থাক, অলোক-সামান্য শক্তি লইয়া লোকাতীত জগৎ

হইতে প্রেরণা পাইয়া তবে এই অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইলে কে কি বলিল, কে কি ভাবিল, তাহার বিচার ও গণনা নিষ্প্রয়োজন। তুমি যাহাকে তোমার দক্ষিণ হস্ত বলিয়া গণনা করিতেছ, হয়ত সেই তোমাকে বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু বিচলিত হইও না। বরং দক্ষিণহস্ত কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তথাপি আজ ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলনকে এক মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল করিবার উপায় নাই। যদি ভারতকে তার পূর্ব্ব গৌরবের সহস্রগুণ মহিমায় মণ্ডিত হইতে হয়, যদি তার প্রসুপ্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধ, বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত এবং আত্মোৎসর্গের শক্তিকে অফুরন্ত করিতে হয়, তবে বাপধন, ব্রহ্মচর্য্যের মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনাকে জাতীয় জীবনের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। ইহাতে যদি তোমার হৃৎপিণ্ডও অসহিষ্ণু হয়, তাহাকে নির্ম্মম বলে উপাড়িয়া ফেলিয়া দাও। আমি দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেছি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরেরা ভারতের বুকে সন্তান হইয়া জন্মিবার সৌভাগ্য-কামনায় ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন, অতীত ভারতের অমর বীরেরা নবযুগের নূতন আলোকে ভারতমাতার চরণ-বন্দনা করিবার জন্য যোগ্য পিতার ঔরস আর যোগ্য মাতার গর্ভ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইন্দ্রিয়-সংযমের আন্দোলনকে প্রবল বেগে চালাও। মনের ঐকান্তিকী ইচ্ছা দ্বারা, কার্য্যের অবিচলিত দৃঢ়তা দ্বারা, বাক্যের অদ্বিচারিণী সত্যতা দ্বারা এই আন্দোলনকে পরিপুষ্ট কর, স্বকীয় জীবনের জিতেন্দ্রিয়তা দ্বারা আন্দোলনকে প্রাণবন্ত কর। সকল সহকর্ম্মীরা তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে? করুক। তুমি নিজেকে পরিত্যাগ করিও না আজ দেশে তৃষ্ণার জলের ন্যায়, ক্ষুধার

অন্নের ন্যায়, প্রাণধারণের বায়ুর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য এক অপরিহার্য্য প্রয়োজন। বন্ধুরা হয়ত এই কথাটা না বুঝিতে পারে। কিন্তু হতাশ হইবে কেন ? এক শতাব্দী পরের ভারতবর্ষ আজিকার এই ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনকে তার যথার্থ মূল্য প্রদান করিবে। ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনেরই ফলে তিনশত বৎসরের পরে ভারত তাহার পূর্ব্ব মূরতি ফিরিয়া পাইবে।''

পুপুনকী আশ্রম,
৩১ শে শ্রাবণ, ১৩৩৫

জাতিভেদের গোঁড়ামি

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে নানা বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজ বর্ণের বিশুদ্ধতার বড়াই না করে, এমন লোক নেই। কিন্তু ইতিহাস তাকিয়ে দেখতে গেলে স্পষ্ট জানা যায়, বর্ণের বিশুদ্ধতা একটা লোকেরও নেই। আগেকার দিনে তলোয়ারের জোরে যে রাজ্য জয় কত্তে পাত্ত, সেই হ'ত ক্ষত্রিয়,—এখন সে বেশ্যার, দাসীর বা অজ্ঞাতকুলশীলার গর্ভজাতই হউক না কেন। কত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি নিম্নতর বর্ণের মেয়ে বিয়ে কর্ল্লেন, আর সন্তানগুলি চ'লে গেল ব্রাহ্মণ ব'লে। মৃগীর গর্ভে, ব্যাঘ্রীর গর্ভে, সর্পীর গর্ভে, নিষাদীর গর্ভে, কৈবর্ত্তকীর গর্ভে, রাক্ষসীর গর্ভে, গণিকার গর্ভে প্রভৃতি কত প্রকারের গর্ভেই মুনি-ঋষিরা সন্তান উৎপাদন কর্ল্লেন, আর তারাই কর্ল্ল বর্ত্তমান ব্রাহ্মণকুল-তিলকদের বংশধারা রক্ষা। তবু ব্রাহ্মণেরা জিদ্ কর্ব্বেন যে, তাঁরা বিশুদ্ধ কাঞ্চন, তাঁদের রক্তে রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতির খাদ মিশাল করা নেই। একুশ বার পরশুরাম

ক্ষত্রিয়-বংশ নির্ব্বংশ কর্ল্লেন, আর, ক্ষত্রিয় কামিনীরা পুত্রার্থিনী হ'য়ে নিয়মস্থ ব্রাহ্মণদের সংসর্গ ক'রে সন্তানবতী হ'লেন, নূতন ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি কর্ল্লেন। এভাবে ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ ক'রে নীচাদপি নীচ শূদ্রের সঙ্গে পর্যন্ত রক্তসম্বন্ধ ক্ষত্রিয়দের শত সহস্র বার হ'য়ে গেছে। তবু ক্ষত্রিয়েরা বল্বেন,—''আমি সূর্য্যবংশী, আমার চেয়ে বড় কেউ নেই, আমি চন্দ্রবংশী, তোমার মেয়ে আমার অস্পৃশ্যা, আমি চৌহান তোমাকে আমি ঘৃণা করি,''......ইত্যাদি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাতিতে জাতিতে রক্ত-সংমিশ্রণের খিচুড়ী পাকান হাজার বার হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু হায় রে, তবু আমাদের জাতিভেদের গোঁড়ামি আর যায় না।

জাতির পরিচয়

'তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—জাতির প্রকৃত পরিচয় জীবনের কর্ম্মে। দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষার জন্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিতে পারে, সে ডোমের ছেলে হ'লেও ক্ষত্রিয়, মুচির ছেলে হ'লেও রাণা প্রতাপের সহোদর ভ্রাতা। অন্তর্জগতের দিব্য সত্য যার কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে, সে বেশ্যার ছেলে হ'লেও ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের ঔরসজাত হ'লেও সে নৈমিষারণ্যের ঋষিদের জাতি। জাতির প্রকৃত পরিচয় জীবনের বিকাশে, জন্ম-বিচারে নয়।

কামের হাতে কর্ত্তৃত্ব

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি হুগলী-নিবাসী জনৈক যুবকের নিকটে এক পত্র লিখিলেন,—যথা,

"অপ্রত্যাশিত-ভাবে অনেক সময়ে পবিত্রচেতা ব্যক্তির মনের মধ্যে কাম-লালসা জাগিয়া উঠে। এই সময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবে, না, অনুতাপের অশ্রুজলে বুক ভাসাইবে? আমি বলি, এই দুইটীর একটীও করিও না। চিত্তের প্রচ্ছন্ন পাপ-সংস্কার উত্তেজক কারণের আশ্রয় পাইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বরং তোমার মঙ্গল করিয়াছে। তুমি সতর্ক হও, তোমার ভিতরের পুঞ্জীকৃত লুক্কায়িত লালসাকে দ্বিগুণিত উৎসাহে সাধনের অনলে দগ্ধ করিয়া মার, "জয় রুদ্র ভৈরব" বলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সাধন-সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হও, আত্মপ্রত্যয়ের সুশাণিত কৃপাণ ঘূর্ণিত করিতে করিতে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের ন্যায় ভোগ-লালসার উদ্ধত মস্তক ছিন্ন কর। দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে একবার পাপ করিয়া ফেলিয়াছ বলিয়া কি পাপের পায়েই জীবন সঁপিয়া দিবে, কামের হাতেরই ক্রীড়নক হইয়া রহিবে? নিজের নিজস্বতা, নিজের স্বাতন্ত্র্য, নিজের আত্মশক্তিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অবসর দিবে না? সাময়িক আত্মবিস্মৃতিহেতু নরকের কূপে একবার চুবানি খাইয়াছ বলিয়া কি চিরকালই বিষ্ঠাপুরীষের উৎকট পূতিগন্ধে কেবল নাকানি আর চুবানিই খাইতে হইবে? তমোনিদ্রার অবসরে অনবধান-ব্যাদিত বদনে কাক-নিষ্ঠীবন একবার পড়িয়াছে বলিয়া কি চিরকালই ঐ কদর্য্য বস্তুটাই গলাধঃকরণ করিতে হইবে? কামের হাতে যদি সারথ্যের বল্গা ছাড়িয়া দাও, সে তোমাকে প্রাণান্তেও রশ্মিমুক্ত করিবে না, মুহুর্মুহুঃ অপমৃত্যুর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে সে তোমাকে চাবুকের জোরে চালাইতে চাহিবে। ভ্রম করিয়াছ ত' করিয়াছ, কিন্তু প্রবৃত্তির হাতে নিজেকে কোনও মতেই তুলিয়া ধরা চলিবে না।

নামের আশ্রয় লও। কাম তোমাকে লইয়া যতই টানাটানি করুক, নাম তুমি ছাড়িও না। এমন কি, প্রবৃত্তির স্রোতে তোমার সকল আত্ম-সংযমের শক্তি যখন পরাহত পরাজিত হইয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তখনও নাম ভুলিও না। কলুষ-কালিমায় যখন জীবনের সমগ্র শুভ্রতা কলঙ্কিত হইয়া যাইতেছে, তখনও তারস্বরে শ্রীভগবানের পরম-মঙ্গল মহানাম স্মরণ করিতে থাক। পুরীষ-সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে কাটিতেও তাঁর সর্ব্বদুঃখহারী পবিত্র নাম স্মরণ করিতে থাক। সমস্ত দেহ, সমস্ত মন যখন পাপ-পঙ্কলিপ্ত, তখনও সেই মহানাম শ্বাসে আর প্রশ্বাসে জপিতে থাক। নাম পরম-বিপদ-ভঞ্জন, ইহা তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, আত্মরক্ষার শক্তি দিবে, শক্তি-স্ফুরণের অনুকূল অবস্থানিচয় সৃষ্টি করিবে। নামের বলে কাম আপনি পরাভূত হইবে। ইহা কবির কল্পনা নহে,—সহস্র সহস্র বিপন্ন জীবনে সুপরীক্ষিত অভ্রান্ত দিব্য সত্য।"

নীরব সাধনের দুই দিক

ত্রিপুরা জেলা-নিবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্রে মন ক্লান্তি বোধ করা মাত্র কর্ম্মীমাত্রেরই কিছু কালের জন্য নীরব সাধনে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্লান্তি-বিদূরণ ও শক্তি-সঞ্চয় করা দরকার। আবার নিরন্তর কর্ম্মনিরতিতে মন অন্তর্মুখতা পরিহার করিয়া বিষয়মুখী হইতে চাহিলেও মাঝে মাঝে নীরব সাধনের দ্বারা অন্তর্মুখীনতাকে পরিপুষ্ট করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

"কিন্তু নির্জ্জন সাধনে বিপদও আছে।
—তিনটী কার্য্য আছে সুকঠিন, অভাবে বদান্যতা,
নির্জ্জনে বৈরাগ্য-রক্ষা, বিপদে সত্যকথা।—

"প্রাক্তন প্রচ্ছন্ন ভোগ-সংস্কার-সমূহ নীরব ও নির্জ্জন সাধনার মধ্য দিয়া অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পড়ে এবং যাহা অন্তরের অন্তরে শুধু ঘোমটা টানিয়া লুকাইয়া রহিয়াছিল, কর্ম্ম-বিরতির অবসর পাইয়া সে তখন অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দেয়, নিজের প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়া সমক্ষে দাঁড়ায়, নানা অকথনীয় প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চাহে, লালসার জালে ঘিরিয়া ধরে।

"এইরূপ অবস্থায় নীরব ও নির্জ্জন সাধন কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া পুনরায় কর্ম্মকোলাহলময় লোক-কল্যাণে ঝাঁপাইয়া পড়া আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ কৌশল। কিন্তু কর্ম্মের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াও একথা মনে রাখিতে হইবে যে, চিত্তশুদ্ধিই কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য,—বন্ধনের পর বন্ধন সৃষ্টি, আর, জালের পর জালে আবদ্ধ হওয়া কর্ম্মযোগীর লক্ষ্য নহে।

"কখনও নীরব সাধন অন্তর্মুখতার পুষ্টিবিধান করে, কখনও বা শুধু নিজের প্রচ্ছন্ন পাপগুলিকে চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া দেখাইয়া দেয় যে, বাহিরে নিজেকে সাধু বলিয়া পরিচিত করিলে কি হয়, অমুক অমুক স্থলে তোমার মন কাঁচা রহিয়াছে, শুদ্ধির সাধনা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রথমোক্ত স্থলে নির্জ্জন ও নীরব সাধনকে একটু জোর করিয়াই কিছুকাল ধরিয়া রাখা উচিত, দ্বিতীয়োক্ত স্থলে নির্জ্জনতা ও নীরবতা বর্জ্জন করিয়া কর্ম্মরত হওয়া উচিত এবং কর্ম্ম-সাধনার সমান্তরালে সমযত্নে অধ্যাত্ম-সাধনার অনুশীলন কর্ত্তব্য।"

পুপুনকী আশ্রম,
১লা ভাদ্র, ১৩৩৫

মুক্তহস্তে বিলাও

আশ্রমের বনভূমি সুপরিষ্কৃত হইয়া সুন্দর কৃষি-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, প্রায় পনের বিঘা জমি ব্যাপিয়া মিষ্টি-কুমড়া, চাল কুমড়া, লাউ, চিনাবাদাম, ঝিঙ্গা, বিলাতি বেগুন, বেগুন, ইক্ষু, ঢেঁড়শ, ধুঁদুল, পেঁপে, বরবটী, ভুট্টা, বর্ষাতি মূলা, পশ্চিমা লঙ্কা, ডাঁটা, লাল শাক, পুঁই শাক, শঙ্খ-আলু, শকরকন্দ প্রভৃতির আবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে কুমড়া, ঝিঙ্গা, ঢেঁড়শ, লঙ্কা প্রভৃতি সুপ্রচুর পরিমাণে ফলিতেছে। পুঁই শাক ও লঙ্কার আশ্চর্য্য বৃদ্ধি ও ফলন দর্শনে লোকে অবাক হইতেছে। অবশ্য এ আবাদ সামান্য পরিশ্রমে বা সামান্য যত্নে সফল হয় নাই। গোবর কম দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া যে মাটীতে মানকচুর গাছ বাঁচিল না, ওলকচুর আবাদ করিতেও যে দেশে ঝুড়িতে ঝুড়িতে সার দিতে হয়, সেই মরুভূমি-তুল্য প্রস্তর-কঙ্করময় বালুকা-বিস্তারে লঙ্কা ও ভুট্টার মত বুভুক্ষু ফসলে সফলতা অর্জ্জন সাধারণ কথা নহে। আশ্রমের এই কৃষির কথা লোক-মুখে বহু দূর পর্য্যন্ত রটিত হইয়াছে এবং প্রত্যহই দুই একজন করিয়া দর্শক আশ্রম দর্শনে আসিয়া এই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে নিজ নিজ গৃহে নূতন নূতন আবাদ করিবার প্রেরণা পাইতেছে। গ্রামে গ্রামে কর্ম্মী পাঠাইয়া নব নব কৃষির প্রতি লোকের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বিগত বৈশাখ মাস হইতেই বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল এবং বর্ষাগমে আশ্রম-মধ্যে নানা প্রকার ফলকর বৃক্ষ ও শাকশব্জীর চারা উৎপাদন করিয়া আশ্রম কর্ম্মীরা গৃহে গৃহে যাইয়া নিজ হস্তে

বিতরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। এখনও বিতরণের জন্য প্রচুর পেঁপে, আম ও কাঁঠালের চারা আশ্রমে উৎপাদিত হইতেছে।

আশ্রমে যে পরিমাণে আবাদ ও ফসল হইয়াছে, হাটে বিক্রয় করিলে তাহাতে আশ্রমের তিন চারি মাসের ব্যয় অনায়াসে সঙ্কুলান হইতে পারে। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব ফসল গ্রামবাসীদের মধ্যে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া দাও।

কিন্তু গ্রামগুলি কোনটাই একান্ত কাছে নহে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার আর উপায় কি, ঘাড়ে করিয়াই নিয়া ঘরে ঘরে পৌছাও।

আদেশ প্রতিপালিত হইল, ব্রহ্মচারীদের স্কন্ধ অনেক বোঝা বহন করিল। তারপর গ্রামবাসীরা নিজেরাই দলে দলে আসিতে লাগিল। তরিতরকারীও দুই হাতে বিতরিত হইতে লাগিল।

লোভ-রিপুর সদ্ব্যবহার

পুপুনকী গ্রামবাসী একজন মাতব্বর ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণিকে উপদেশ দিলেন,—মহারাজ, পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্। যাহাদিগকে আপনি এমন বেপরোয়া ভাবে দান করিতেছেন, দেখিবেন, তাহারাই আপনার প্রতি শত্রুর মত ব্যবহার করিবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে কথা জানিয়াই দান করিতে বসিয়াছি। আপনি কি মনে করেন যে, চিরকালই বাঁচিয়া থাকিব মনে করিয়া এই মাটিতে গাতি-কোদাল চালাইয়াছি? যে দিন ইচ্ছা হইবে, সে দিনই এই প্রতিষ্ঠান দান করিয়া চলিয়া যাইব। এই প্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ী করিবার জন্যই এই জঙ্গলে আসিয়া

দুঃখকে বরণ করি নাই। আমি একটা ভাবের প্রতিনিধি। সেই ভাবটা হইতেছে—অনালস্য। কি ভীষণ আলস্য এ দেশের লোকের যে, চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাস পর্যন্ত শুধু অড়হরের ডাল দিয়া শতকরা নিরানব্বই জন ভদ্রলোক ভাত খাইবে, দিন পাঁচ মিনিট পরিশ্রম করিয়া দুটা তরকারী উৎপন্ন করিবে না।

প্রশ্ন।—কিন্তু দানে কি আলস্য যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দানে আলস্য যাবে না, কিন্তু জিভটা বেড়ে যাবে। এই লোভটা তাদের কৃষির প্রবর্ত্তনা দেবে। এইখানে লোভ-রিপুর সদ্ব্যবহার।

প্রতিষ্ঠানের অমরত্ব

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রতিষ্ঠানের অমরত্ব সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রতিষ্ঠান অমর হয় তার ভাব দিয়ে, তার সত্য দিয়ে, তার কর্ম্মিদল, তার রসদ বা দালান-কোঠা দিয়ে নয়। একটা সত্যকে মূর্ত্তি দিয়ে যদি কোনও প্রতিষ্ঠান পঞ্চত্বও প্রাপ্ত হয়, জানবেন, ঐ প্রতিষ্ঠান অমরত্বকেই লাভ করেছে। সত্যের যেদিন ডাক আসবে, সেদিন নিজ হাতে যিনি নিজের হাতের গড়া মন্দির চূর্ণ ক'রে দিতে পার্ব্বেন, নিজ হাতে নিজ কর্ম্মীদের বলি দিতে পার্ব্বেন, তিনিই প্রকৃত কর্ম্মযোগী।

চালাও শাবল

চব্বিশ-পরগণার কোনও গ্রাম-নিবাসী জনৈক ভক্ত-যুবকের পত্রের উত্তরে অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''সাধনেই সিদ্ধি, না সাধিয়া কেহ সিদ্ধিলাভ করে না। যত্ন করিয়াই রত্ন লাভ করিতে হয়, বিনা যত্নে কাহারও অভ্যুদয় হয় না। ক্ষুদ্র একখানা শাবল দিয়া সমগ্র পথিবী উৎখাত করিয়া দিতে পার যদি অধ্যবসায় থাকে। ভগবানের নাম এই শাবল। দৃঢ় হস্তে উহা ধরিয়া রাখ আর হৃদয়ের প্রস্তরকঙ্করময় কঠিন ভূমিতে উহা দ্বারা বারংবার আঘাত কর। দেখিবে পাথর ফাটিয়া নির্ঝরিণী বহিবে, সেই নির্ঝরধারার স্নিগ্ধ সলিল পাইয়া মরুভূমিতে কত শ্যামায়মান প্রান্তরের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে কত বৃক্ষ-গুল্ম-লতা, কত মহীরুহ, কত বনস্পতি ঊর্দ্ধশিরে সহাস্য আননে দাঁড়াইবে। চালাও শাবল জোরসে, কাটো মাটি, ভাঙ্গো পাথর, তবে না তুমি বীর, তবে না তুমি পুরুষ, তবে না তুমি মানুষ।''

পুপুনকী আশ্রম,
২রা ভাদ্র, ১৩৩৫

ভবিষ্যতের জন্য আত্মগঠন

এই বৎসরের বর্ষার যাহা কিছু কৃষি, সবই হইয়া গিয়াছে। আশ্রমে একদিকে দুরন্ত জলাভাব বশতঃ এবং অপরদিকে দৈনিক দুই তিন শত করিয়া চতুর্দ্দিকের গ্রাম হইতে আগত গরুর উৎপাত বশতঃ শীতের ত' কোনও ফসলই হইবে না। তথাপি মাটি কাটা, নালা-খোঁড়া প্রভৃতি কার্য্য পূর্ণ উৎসাহে চলিতেছে। গ্রামবাসী কৃষকদের নিজেদের কৃষি-কার্য্য এই বৎসরের মত সমাপ্ত হওয়ায় পুপুনকীর তাম্বুলি-নেতা শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী হালদারের নেতৃত্বে আশ্রম-ভূমির স্থানে স্থানে হলচালনাও হইতেছে।

একজন ভূমিহার ব্রাহ্মণ গ্রামান্তর হইতে আম, কাঁঠাল, আসফল ও পেঁপের চারা নিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি

এবং কর্ম্মিগণ তখন মাঠের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে সকলে আপাদ-মস্তক সিক্ত।

ভূমিহার ব্রাহ্মণটী বলিলেন,—যা চাষ কর্ব্বার, সব ত' এবারের মত হ'ল। তবে আর কেন এত শ্রম ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এটা হচ্ছে আগামী আষাঢ়ের জন্য আত্ম-প্রস্তুতি।

প্রশ্নকর্ত্তা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন,—এই ত' সবে ভাদ্র মাস। আষাঢ়ের এখনও পূরা দশ মাস বাকী।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় দশ মাস দশ দিন পরে হে!

ভূমিহার ব্রাহ্মণটী শ্রীশ্রীবাবামণির কথার মর্ম্ম কিছু বুঝিলেন বলিয়া মনে হইল না। যাহা হউক, প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদির চারা দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—যে কোনও কাজই কর না কেন, তার জন্য অনেক আগে থেকেই অতি সঙ্গোপনে, অতি সন্তর্পণে, নিরতিশয় সতর্কতা সহকারে আয়োজন কত্তে হয়। দ্বাদশবর্ষ বনবাস পাণ্ডবদের আত্মগঠনেরই অধ্যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরই আয়োজন। ওকালতী কর্ত্তে চাও, চৌদ্দ-পনের বছর ধ'রে স্কুল-কলেজে পড়্‌তে হবে, আইনের শত শত কিতাব ঘাটবে হবে, উপযুক্ত মুহুরী, টন্নি, মক্কেল সব জুটাতে হবে, তবে গিয়ে হবে সফল। ডাক্তারী কত্তে চাও ত' মড়া কাট্‌তে হবে, পরীক্ষায় পাশ দিতে হবে, যন্ত্রপাতি, ঔষধ-পত্র এবং অপরাপর তোড়জোড় সব সংগ্রহ কত্তে হবে, তবে গিয়ে হবে ইচ্ছার সার্থকতা। একটা ভাল মত ধর্ম্মঘট বাঁধাতে চাও ত' তার জন্য বহুকাল আগে থেকে সমস্ত

অনুকূল ব্যবস্থা ও আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য ধীরবুদ্ধিতে স্থিরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হ'তে হবে। জাতীয় উন্নতি সাধন কত্তে চাও ত' তার জন্য অচপল চিত্তে অকপট প্রাণে অনলস প্রয়াসে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনা কত্তে হবে, জাতির যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে শক্তিটুকুর বিকাশ-সাধন সম্ভব, অতুল সহিষ্ণুতা সহকারে সেই শক্তির সংগঠন কত্তে হবে। সংগঠন ছাড়া কোনও কাজে কেউ সফলতা অর্জ্জন কত্তে পারে না, আর আমরাই কি সংগঠন ছাড়া আশ্রমের কৃষিতে সফল হব ?

সংগঠনের অর্থ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সংগঠন কথাটার মানে অবশ্য তোমাদের বুঝতে হবে। সংগঠন বল্‌তে শুধু দলবদ্ধতা বুঝলেই হ'ল না। সংগঠন মানে the evolution, systematisation and reorganisation of heterogeneous forces,—অর্থাৎ যেখানে শক্তির বিকাশ নেই, সেখানে তাকে বিকশিত ক'রে তুলতে হবে, বিভিন্ন দিকের বিভিন্নমুখী বা পরস্পর-বিরোধী শক্তিকে একটা common supreme plan-এর অধীন ক'রে নিয়ে, তারপর প্রত্যেকটী শক্তিকে নিজ নিজ স্বাধীন প্রেরণায় স্ফূর্ত্তিলাভ কত্তে দিতে হবে এবং যেখানে বিভিন্ন শক্তি পূর্ব্ব থেকেই একটা সখ্যবন্ধন রচনা ক'রে চলেছে, সেখানে প্রয়োজন-মত নূতন নূতন শক্তির প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে।

নবযুগের পঞ্চাগ্নি-সাধনা

তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি অপর এক প্রসঙ্গে বলিলেন,—প্রাচীন কালের সাধকেরা নানা প্রকার তপশ্চর্য্যা কত্তেন। কেউ শুধু

জলপান ক'রে, কেউ শুধু বায়ু ভক্ষণ ক'রে, কেউ বা উর্দ্ধবাহু হ'য়ে তপস্যা কত্তেন। কেউ কেউ চারিদিকে চারটা অগ্নিকুণ্ড জেলে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর তাপের নীচে ব'সে পঞ্চাগ্নি সাধনা কত্তেন। সেই সব তপস্যার ভগ্নাংশ বা স্মৃতি-চিহ্ন এখনও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কঠোরতপা সাধক মহাপুরুষদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু নবযুগের পঞ্চাগ্নি-সাধনা কেমন হবে জান ? নবযুগের সাধকের মস্তকের উপরে থাক্‌বে প্রতিহিংসু জল্লাদের শাণিত কৃপাণের রোষাগ্নি, দক্ষিণে থাক্‌বে মাতৃজাতির প্রতি লম্পটের অত্যাচার-জনিত নেত্রবাস্পময় বহ্নি, বামে থাক্‌বে দুঃখনিপীড়িত ভ্রাতা-ভগ্নীর ক্ষুধার্ত্ত জঠরের তীব্র হুতাশন, পশ্চাতে থাক্‌বে উন্নত অতীতের বিরাট ভস্মাবশেষের অনুতাপ-রুক্ষ স্মৃতির অনল আর সম্মুখে থাক্‌বে আশার রশ্মি-উৎসাহের তেজ, নূতন ভবিষ্যৎ বাহুবলে গড়ে নেয়ার বিদ্যুন্ময় বজ্র। অসাধক এর যে-কোনও একটী অগ্নিতেই পুড়ে মরবে, অধীর অচেতন হবে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হারাবে, সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হবে। আর যিনি সাধক, শ্বাসে-প্রশ্বাসে যাঁর মধুময় শ্রীভগবানের নাম, তিনি অগ্নির হল্কা গায়ে লাগ্‌লেও কাতর হবেন না, অস্থির ও সংজ্ঞাহীন হবেন না। মৃত্যুকে তিনি প্রেমবশে আলিঙ্গন কর্ব্বেন এবং মৃত্যুর করপুট থেকে অমৃত-রসায়ন অঞ্জলি ভ'রে পান কর্ব্বেন।

কুসন্তানের প্রতি ভারত-মাতা

তৎপর অন্য এক কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা সব কুপুত্র হ'য়ে জন্মাচ্ছি রে, তাই ভারত-মাতা নিজ হাতে আমাদের গলা টিপে মেরে ফেল্‌ছেন। এই যে ঘরে ঘরে অকাল-মৃত্যু, এই যে জেলায় জেলায় মহামারী, এই যে প্রতি

বৎসর দুর্ভিক্ষ, সবই হচ্ছে আমরা কুপুত্র ব'লে। যাঁর নামে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে, সেই দুষ্মন্ত-তনয় মহারাজ ভরত তিনটী বিবাহ করেছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে তাঁর তিনটী ক'রে মোট নয়টি পুত্র জন্মেছিল। কিন্তু একজনও পিতার যোগ্য হ'তে পার্ল্ল না। তখন ভরতের স্ত্রীরা কর্ল্লেন কি জানো? তাঁরা নিজেদের হাতে নিজেদের ছেলেগুলিকে মেরে ফেল্লেন। কেননা, বিষবৃক্ষকে বাড়িয়ে লাভ কি? একপাল কুলাঙ্গারকে লালন-পালন করায় মঙ্গল কোথায়? আমরাও ভরত রাজার পুত্রদের মত নিতান্তই কুলাঙ্গার হ'য়ে জন্মেছি। দেশের দিকে একবার তাকাই না, দশের কথা একবার ভাবি না, শুধু আত্ম-সুখ আর আত্মোদর-পূরণ নিয়ে ব্যস্ত। তাই, জননী আমাদের প্রতি এত নির্দ্দয় ও এমন নির্ম্মম হয়েছেন। আমরা কুলাঙ্গার ব'লেই জননী আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়েছেন। যেদিন আমরা মানুষ হ'ব, পশুর আত্মপরায়ণতা পরিহার কর্ব্ব, সেদিন মা আবার আগেকার মত হাস্যময়ী হবেন, আগেকার মত সোহাগ-যত্ন দেবেন, ছেলে-মেয়েদের পেট পূরে খেতে দেবেন, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আদর ও স্নেহ কর্ব্বেন। কিন্তু যদি মানুষ না হই, বৃথাই আমরা শুধু মা—মা ব'লে চীৎকার ক'রে ক'রে কেঁদে বেড়াব, আর, দুনিয়ার ধিক্কার ও পদাঘাত সংগ্রহ কর্ব্ব।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
২রা ভাদ্র, ১৩৩৫

ব্রহ্মচারীর মাহিনা

অনেক বেলা পর্যন্ত জনৈক ব্রহ্মচারী মাঠের কাজ করিতেছেন। গ্রামান্তর হইতে একটী কলু-বংশীয় কৃষক আশ্রমে আমের চারা

নিতে আসিয়াছে। বেলা হেলিতে চলিল, অথচ ব্রহ্মচারী কোদাল ছাড়িতেছেন না দেখিয়া কৃষকটীর মনে হইল, এই ব্যক্তি কখনও ভদ্রবংশজাত হইতে পারেন না, নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণির মাহিনা করা চাকর। সরলপ্রাণ কলু জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে, স্বামীজী তোমাকে কত ক'রে মাইনে দেয় হে?

প্রশ্ন শুনিয়া ত' ব্রহ্মচারী হাসিয়া অস্থির। কুটীর-মধ্যে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি একখানা পত্র লিখিতেছিলেন। হাসিতে হাসিতে আসিয়া ব্রহ্মচারী সব কথা বলিলেন।

পুপুনকীর শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয় তখন কি প্রয়োজনে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—বলিলেই পারিতেন, মাইনে পাই শুধু স্বামীজীর পায়ের ধূলো।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—ইহাই বলিয়াছি, কিন্তু লোকটা আমাকে বিশ্বাসই করে নাই; বলে কি, "বাবা গো, এত মেহনত শুধু পায়েরই ধূলাতে? তুমি ঝুট বলছ!"

বৈধব্য-প্রশমনের উপায়

আহারাদির পর প্রসঙ্গ-ক্রমে বিধবাদের সম্বন্ধে আলোচনা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈধব্য নাশের তিনটী উপায় আছে। একটী হচ্ছে জবরদস্তি, দ্বিতীয়টী হচ্ছে জোড়াতালি, আর তৃতীয়টী হচ্ছে স্বাভাবিক। জবরদস্তির উপায় হচ্ছে মেয়েদের চিরকুমারী রাখা। জোড়াতালির উপায় হচ্ছে, বিধবার পুনর্বিবাহ দেওয়া। স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে, বিবাহের পূর্ব্ব পর্যন্ত বর ও কন্যাকে কঠোর সংযমে রক্ষা করা এবং বিবাহের পরে দম্পতীকে তীব্র সাধন-ভজনে নিরত করা। চিরকৌমার্য্যকে জবরদস্তি এই জন্য বলছি যে, সকল মেয়ে চিরকৌমার্য্যের যোগ্যতা নিয়ে

জন্মে না বা সকলের মধ্যে সে যোগ্যতাকে বিকশিত ক'রেও তোলা যায় না। তাই নির্ব্বিচারে যে-কোনও মেয়ের জন্য কৌমার্য্যের ব্যবস্থা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা বৈ আর কিছু নয়। বিধবার পুনর্ব্বিবাহকে জোড়াতালি এজন্যে বল্‌ছি যে, এ বিবাহে অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীর পূর্ব্ব-বৈধব্যের স্মৃতিটা স্বামীর এবং স্ত্রীর উভয়ের মনের মধ্যেই সজাগ থাকে, মুখে সেই কথা না বল্লেও মনের ভিতরে সেই স্মৃতির যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া চল্‌তে থাকে এবং তাতে বৈবাহিক মিলনটার ভিতরে অতি সূক্ষ্ম একটা অমিলের চিহ্নকে জাগরূক ক'রে রাখে। স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে কোনও কারণে কখনও মনের বা মতের অমিল হ'লে, একজন কোনও ক্রমে অপরের সুখের বাধা হ'লে উভয়েই মনে মনে ভাবে, বুঝি বিধবা-বিবাহ হ'য়েছিল ব'লেই এই দুর্গতি। আর, বিবাহের পূর্ব্বে যদি কুমার-কুমারী অনাবিল আনন্দের সহিত সংযমের জীবন-যাপন কত্তে পারে, সংযমের সৌন্দর্য্য যদি তাদের অবিবাহিত অবস্থার সকল উচ্চ চিন্তাগুলিকে ঘিরে ধর্‌তে পারে এবং বিবাহের পর পরস্পরের ভালবাসাকে দিব্য প্রেমে পরিণত কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একে যদি অপরের সাহচর্য্যে সাধন-ভজনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের রুচি, প্রকৃতি, ভাব ও শক্তির সাম্যবিধানে যত্নবান হয়, তাহ'লে একের দীর্ঘায়ুষ্কতা অপরের অল্পায়ুষ্কতার পূরণ ক'রে দেবে, একের স্বাস্থ্য অপরের অস্বাস্থ্যকে প্রশমিত কর্ব্বে, একের সংযম অপরের অসংযমের গতিরোধ কর্ব্বে। এইভাবে যে বৈধব্য-প্রতিষেধ, সেইটীই হচ্ছে খাঁটি প্রতিষেধ, এই প্রতিষেধের মধ্য দিয়ে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৫

কাম, ক্রোধ ও হত্যা

অদ্য গোমদিডি গ্রাম হইতে কয়েকজন মাহাতা-উপাধিকারী ভূমিহার ব্রাহ্মণ আশ্রমে আসিয়াছে। ভূমিহারেরা কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ। শিক্ষায়, সভ্যতায়, সদাচারে এতদ্দেশের সাধারণ লোকদেরই মত। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণির চেষ্টায় এতদঞ্চলের ভূমিহারদের মধ্যে ক্রমশঃ উন্নতি লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে। উচ্চশ্রেণীস্থ বলিয়া গণিত অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত বিদ্বেষ সৃষ্টি না করিয়া যাহাতে ভূমিহার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত সৎশিক্ষা ও সদাচার প্রতিষ্ঠিত হয়, শ্রীশ্রীবাবামণি তজ্জন্যই বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিতেছেন।

একজন মাহাতা কথায় কথায় বলিল, কোন গ্রামের কে একজন লোক তার স্ত্রীর সচ্চরিত্রতায় সন্দেহ করিয়া তাহাকে কুঠারাঘাতে হত্যা করিয়া তারপর পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া আজ নয় দশ বৎসর যাবৎ ফেরার আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আর বাবা তোমাদের দেশে ত' নরহত্যা মুড়ি-চিবানোর মতন একটা সাধারণ ব্যাপার।

মাহাতা,—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে বেশীর ভাগ নরহত্যাই হয় স্ত্রীলোক নিয়ে, আর জমি নিয়ে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকল দেশে এবং সর্ব্বকালে এই দুটীই নরহত্যার প্রধানতম কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ স্ত্রীলোকের উপর নির্লিপ্ত আর অর্থের উপর নির্লোভ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যতবড় সাধুই হোক্, তাকে বিশ্বাস ক'রো না,

কারণ, প্রয়োজন হ'লেই সে নরহত্যা কত্তে পারে। কাম আর লোভ, এই দুইটী যতক্ষণ না জগৎ থেকে লোপ পাচ্ছে, ততক্ষণ হত্যার আর বিরাম নেই। অবশ্য, সমগ্র জগৎ থেকে এই দুইটী রিপুকে নির্ব্বাসিত করা সম্ভব হবে না কিন্তু যে-কোনও একটা সমাজ থেকে দূর করা একেবারে অসম্ভব নয়।

পুপুনকী আশ্রম,
৫ই ভাদ্র, ১৩৩৫

স্ত্রী-বর্জ্জনের মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যেরা অনেকেই ব্রহ্মচারীদিগকে স্ত্রীবর্জ্জন কত্তে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু মনুষ্য-জীবন কোনও অবস্থাতেই সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীজাতির সংস্পর্শ ছেড়ে চল্‌তে পারে না, যদি মানুষ চিরকালের জন্য গুহাবাসী হ'য়ে না থাকে। সুতরাং স্ত্রীবর্জ্জন বললে বুঝতে হবে, নারীর প্রতি স্ত্রী-বুদ্ধি নিয়ে না চলা। স্ত্রীজাতিতে মাতৃবুদ্ধি আরোপ কল্লে অথবা স্ত্রীজাতির স্ত্রীত্বের প্রতি উদাসীন হ'তে পার্ল্লেই স্ত্রী-বর্জ্জন হয়।

স্ত্রীজাতির সহিত ইচ্ছাকৃত ঘনিষ্ঠতা ও কাম

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—কিন্তু তাই ব'লে ইচ্ছা ক'রে স্ত্রীলোকদের সংশ্রবে যাওয়ার অধিকার ব্রহ্মচারীর নেই। যে ভাবে চল্‌লে স্ত্রীজাতির সঙ্গে নিষ্প্রয়োজনে ঘনিষ্ঠতা-বর্দ্ধনের সম্ভাবনা, সেভাবে চল্‌বার অধিকার ব্রহ্মচারীর নেই। একজন ব্রহ্মচারী পথ দিয়ে যেতে যেতে দূরে এক বেশ্যাকে দেখে চীৎকার ক'রে ডেকে বল্লে,—"মাগো, মা!" গুরু এই বিষয় জান্‌তে পেরে শিষ্যকে বল্লেন,—"এটা তোর প্রচ্ছন্ন কাম।" শিষ্য জিজ্ঞাসা

কল্ল,—"কেন?" গুরু বল্লেন,—"যেখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইবার তোর প্রয়োজন ছিল না, সেখানে তুই যে তাকে ডাক্‌তে গেলি, তার মূল হচ্ছে ঘনিষ্ঠতা-বর্দ্ধনের লালসা।" শিষ্য বল্লে, —"আমি ত' মন্দ কথা ব'লে ডাকি নি! আমি যে মা ব'লে ডেকেছি।" গুরু বল্লেন,—"যাই ব'লেই ডাক না কেন, তাতে যায় আসে না। ভাষা দিয়ে তুমি ভাবকে গোপন করেছ। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের মূল সূত্র হচ্ছে ভাবের শোধন। মাতৃভাবেই তুমি বিভোর হও, এইটাই হচ্ছে কাম্য। কিন্তু যেখানে কথার কোনও প্রয়োজন নেই, সেখানে রসনাকে স্তব্ধ ক'রেই রাখতে হবে।"

পুপুনকী আশ্রম,
৬ই ভাদ্র, ১৩৩৫

পরমুখাপেক্ষিতার দুঃখ

প্রায় দুই মাস যাবৎ আশ্রমে ভয়ঙ্কর সর্পের উপদ্রব হইতেছে। বিগত এক সপ্তাহের মধ্যেই তিন চারিটী গোখরা সাপ মারিয়া ফেলিতে হইয়াছে। গত রাত্রিতে কুটিরাভ্যন্তরস্থ শ্রীশ্রীবাবামণির কক্ষে খাটিয়ার নীচ দিয়া বহুবার সর্প গতায়াত করিয়াছে। বৃষ্টিতে দিয়াশলাই ভিজিয়া যাওয়ায় রাত্রিতে আর আলো জ্বালান সম্ভব হয় নাই ; বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন সত্ত্বেও সমস্ত রজনী শ্রীশ্রীবাবামণি বিনিদ্র অবস্থায় খাটিয়ায় বসিয়া কাটাইয়াছেন।

অদ্য গান্ধা হইতে আশ্রমের পরমহিতৈষী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয় আশ্রম-দর্শনে আসিলেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে সর্পের উপদ্রবের কথা জানিতে পারিয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সসর্পে গৃহবাস কষ্টকর, কিন্তু তার চেয়ে কষ্টকর পরমুখাপেক্ষিতা।

যোগেনবাবু বলিলেন,—ইহা আপনারই উপযুক্ত কথা।

আমাদের উন্নতি আমাদিগকেই করিতে হইবে

কত কথা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এক কণা আত্মহিতের জন্যও পরমুখপানে চেয়ে থাকব না, এইরূপ মনোবৃত্তি সমগ্র দেশের ভিতরে সৃষ্টি কত্তে হবে। পল্লীতে পল্লীতে নৈশ বিদ্যালয় খোল্‌বার জন্য রাশিয়া থেকে কর্ম্মীরা আস্‌বেন, এরূপ ভরসা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মদ্রোহিতার নামান্তর। আমাদের নৈশবিদ্যালয় আমাদের স্থাপন কত্তে হবে, আমাদেরই চালাতে হবে। গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় আমাদেরই খুলতে হবে, কবে এসে নরহিতব্রত পাদ্রী মেয়েরা আমাদের মেয়েদের জন্য স্কুল খুল্‌বেন, তবে আমাদের মেয়েরা ক-খ-গ-ঘ শিখতে শুরু করবে—এই পরবশ্যতার মনোভাবকে ঝেঁটিয়ে বিদায় কত্তে হবে। বন-জঙ্গল আবাদ ক'রে বিদেশী বণিক্ অমরাবতী প্রতিষ্ঠা করুক, তারপরে আমরা গিয়ে সেখানকার রাস্তায় গুরুর গাড়ীর গাড়োয়ানী ক'রে পেট চালাব, এইরূপ দুর্ব্বলের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে হবে,—আমাদের দেশের বন-জঙ্গল আমরাই উৎখাত করব, সাপ-শকুনির আড্ডা বিশাল বিশাল বন্য-মহীরুহ আমরাই উৎপাটিত কর্ব্ব, রাস্তা-ঘাট আমরাই তৈরী করব, নগর-বাজার আমরাই পত্তন কর্ব্ব, খাল-বিল আমরাই ভরব, পারাপারের সেতু আমরাই নির্ম্মাণ কর্ব্ব। খাল-বিলের মুখে বাঁধ দিয়ে আমরাই কর্ব্ব জলাধার নির্ম্মাণ, হাজার হাজার বৃক্ষ সৃষ্টি করে আমরাই করব অনাবৃষ্টি দূর, সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ

ক'রে আমরাই রচনা করব মরুভূমিতে নন্দন-কানন। অপরের মুখপানে চেয়ে থাক্‌লে যে চল্‌বে না, চল্‌তে পারে না, সেই প্রত্যয় আমাদের সকলের মনে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। দেশে উপযুক্ত পরিমাণ হাসপাতাল নেই, চিকিৎসা-বিদ্যালয় নেই—এ অভাব আমরাই দূর কর্ব্ব। জার্ম্মেণী থেকে বৈজ্ঞানিক আস্‌বেন, তবে এ অভাব দূর হবে, এই জাতীয় পরবশ্যতা আমাদের পরিত্যাগ কত্তে হবে। ম্যালেরিয়ায় দেশ উজাড় হ'য়ে গেল, সহজে নিবার্য্য ব্যাধিতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অকাল অবৈধ মৃত্যুকে সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় পরম ঔদাস্য ভরে উপেক্ষার সহিত না দেখে অথবা কবে জাপান থেকে জুজুৎসুর ওস্তাদ আস্‌বেন, সেই ভরসাতে ব'সে না থেকে জাতির জীবনী-শক্তি, রোগ-প্রতিষেধনী-শক্তি বাড়াবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যায়াম-বিদ্যালয় আমরাই খুল্‌ব। নিজেদের উন্নতির সকল দায়িত্ব-ভার নিজেদের স্কন্ধে নিতে হবে।

কু-ব্যাখ্যা-কারীর সুলভতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য কু-ব্যাখ্যা-কারীর * কখনো অভাব হবে না। আমি যতই সদুদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ করি, তার মাঝেও একটা অসদুদ্দেশ্য আরোপ করার লোক মিল্‌বে। পরের দোষ খুঁজে বের করা যার স্বভাব, সে "হাঁ"র ভিতরে "না" খুঁজে বের করবে। একটা বেলা পেট ভ'রে দু'মুঠো আহার করার মত নিষ্পাপ কাজ আর কিছু হ'তে পারে না,

* কতিপয় বৎসর যাবৎ ইংরেজের গুপ্ত পুলিশ শ্রীশ্রীবাবামণিকে নানা ভাবে হয়রাণ করিতেছে।

কিন্তু সে তার ভিতরেও কত বিপত্তিকর উদ্দেশ্য আবিষ্কার কর্ব্বে। একটা রাত মশারি খাটিয়ে ভাল ক'রে ঘুমানোর মতন নিরপরাধ কাজ কিছু হ'তে পারে না, কিন্তু তার ভিতরেও গুরুতর সব অপরাধের বীজাণু সে আবিষ্কার কর্ব্বে। সপ্তাহান্তে একবার ক'রে জোলাপ নিয়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার মত নির্দ্দোষ কাজ আর কিছু হ'তে পারে না, কিন্তু তার ভিতরেও কত বিপ্লব, কত মহামারী কত মন্বন্তর খুঁজে বের ক'রে তবে সে ছাড়বে।

সমাজ-সেবার পথ ক্লেশ-সঙ্কুল

শেষোক্ত কথাটা শুনিয়া শ্রীযুক্ত যোগেনবাবু উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাসার কিছুই নেই, এসব যথার্থ কথা। ভক্তিভরে এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল পান কর্লে, স্থলবিশেষে, সময়বিশেষে, তার জন্যও কত লোককে বৃথা লাঞ্ছনা ভুগতে হয়। নিঃশ্বাসের বায়ুটা একটু গভীর ভাবে নিয়ে সমস্ত ফুসফুসটায় সামান্য অক্সিজেন দেবার চেষ্টা কর্লেও তার জন্যও কত দুর্ভাগ্য ভুগতে হয়। কিন্তু তাই ব'লে কি মানুষ তার কর্ত্তব্য কাজ বন্ধ ক'রে ঘরের ভিতরে খিল দিয়ে চুপ্ মেরে ব'সে থাক্‌বে? যে যেই দেশে জন্মেছে, সে সেই দেশের সেবা কর্ব্বেই। যে যেই সমাজে আবির্ভূত হয়েছে, সে সেই সমাজের অকুশল দূর কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বেই। তাতে এখন যীশুর মত কাঁটার মালাই শিরে প'রে ক্রুশ-বিদ্ধ হ'তে হোক, আর যবন হরিদাসের মত বাইশ-বাজারে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত-কলেবরই হ'তে হোক্। মানুষ হ'য়ে জন্মেছিই ত' জন-সেবার মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য। লাঞ্ছনা,

গঞ্জনা, অসম্মান, অপবাদ এ সব আসবে ব'লে কি সে মহৎ কর্ত্তব্য থেকে পরাঙ্মুখ হ'য়ে দূরে দূরে স'রে থাকব? নিজের একটা মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়্‌বে ব'লে দেশ, জাতি ও সমাজকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা পাব না? আমারই দক্ষিণ হস্ত হয়ত আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর্ব্বে, আমারই হৃৎপিণ্ড হয়ত আমার ব্রত-বিঘ্ন হবে, কিন্তু তার জন্য কি বিচলিত হব? চতুর্দ্দিকে বজ্র-বিদ্যুৎ-বহ্নি, সম্মুখে প্রসারিত মৃত্যু-পিচ্ছিল ক্লেশসঙ্কুল অনন্ত উন্মুক্ত পথ,—সমাজ সেবীর এইখানেই অভিযান।

ভবিষ্যৎ-জননীদের শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লাঞ্ছনা হোক, গঞ্জনা হোক, অপমান হোক, নিন্দাবাদ হোক, শাস্তি হোক, আর মৃত্যু হোক, আমাদের কাজ আমাদেরই কত্তে হবে। আমাদের পল্লীর সংগঠনে আমাদেরই হাত দিতে হবে, আমাদের কৃষক, শিল্পী ও শ্রমিকের উন্নতির পথ আমাদিগকেই গিয়ে দেখতে হবে, জাতির ভবিষ্যৎ জননীদের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদেরই কত্তে হবে। ভারতের অতীত মহিমার সঙ্গে যোগ রেখে যুগোপযোগী যে সত্যমূলক শিক্ষা, তা' আমরাই আমাদের মেয়েদের দিব। ভারতের অতীত সভ্যতায়, অতীত কীর্ত্তি-নিচয়ে, অতীতের মহনীয়া মহিলাদের সুগভীর চরিত্রে যেখানে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র, যা কিছু উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল, সেগুলি আমরাই আমাদের কন্যাদের ভিতরে ফুটিয়ে তুল্‌ব। তাদের বাহুতে পাষণ্ড-দলনী মহিষ-মর্দ্দিনী শক্তির বিকাশ আমরাই করব, তাদের বুকে সৎসাহস আর অখণ্ড স্বদেশ-প্রেম আমরাই জাগাব, তাদের

চিত্তে একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের, ইন্দ্রিয়-সংযমে অনুরাগের, পবিত্র-জীবনে শ্রদ্ধার সংস্কার আমরাই গড়ে তুলব। ভবিষ্যতে যাদের জঠরে জন্মগ্রহণ ক'রে আমরা ধন্য হব, কৃত-কৃতার্থ হব, তাদের জীবনের উপরে অভারতীয় সংস্কার ও সভ্যতার জয়-জয়কার আমরা কিছুতেই ঘোষিত হ'তে দিব না।

স্ত্রী-শিক্ষায় ধর্ম্ম ও সংযম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রী শিক্ষায় ধর্ম্মের স্থান রাখ্তে হবে সর্ব্বোপরি। অপর সকল শিক্ষার চাইতে ধর্ম্ম-শিক্ষার গভীরতা তাদের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকারী। নারীর ধর্ম্মপ্রাণতা অধার্ম্মিক পুরুষকে পাপ থেকে রক্ষা কর্ব্বে, নারীর সংযম পুরুষকে অসংযমের রাহু-পাশ থেকে মুক্ত কর্ব্বে। অবশ্য, ধর্ম্ম বল্‌তে আমি সাম্প্রদায়িকতার খুঁটিনাটি বুঝাচ্ছি না। সাম্প্রদায়িকতার আতিশয্য সত্যিকার ধর্ম্মজীবনকে ক্ষুণ্ণই করে। ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার আগ্রহ যে শিক্ষায় বর্দ্ধিত হয়, তাকেই বলছি ধর্ম্ম-শিক্ষা। যে শিক্ষা ভগবানের উপর সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সমভাবে নির্ভর কত্তে শেখায়, যে শিক্ষা সহস্র বিঘ্ন-বিপদকে ভগবদ্‌বিশ্বাসের শক্তিতে অগ্রাহ্য কর্ব্বার শক্তি দেয়, যে শিক্ষার গুণে ভগবানের নামে রুচি আসে, ভগবানের জীবে দয়া জাগে, তারই নাম ধর্ম্ম-শিক্ষা। ধর্ম্ম-শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে সংযম-শিক্ষায়। চিত্ত-সংযমের শিক্ষাহীন যে ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রয়াস, তার ফল হচ্ছে কতকগুলি বাক্‌-সর্ব্বস্ব বক-ধার্ম্মিকের সৃষ্টি, সে প্রয়াস কপটতাকে প্রতিষ্ঠিত করে ; শক্তিমত্তা ও সরলতা তাতে বিনষ্ট হয়। তাই, নারী-শিক্ষায় দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে সংযম-শিক্ষার।

স্ত্রী-শিক্ষায় ধর্ম্ম ও সংযমের শিক্ষাদাত্রী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু ধর্ম্ম এবং সংযম মেয়েদের শেখাবে কে ? যারা ইংরেজীয়ানা কলেজে প'ড়ে উচ্চতম উপাধি লাভ ক'রে কৃতবিদ্য হ'য়েছেন, তাঁরাই কি এই ধর্ম্ম ও সংযমের শিক্ষা-দাত্রী হবেন ? আমার উত্তর হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁরা পান আর না পান, কৃতবিদ্য তাঁরা হোন্ আর না হোন্ তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ধর্ম্ম এবং সংযমের শিক্ষা যদি তাঁদের জীবনে মূর্ত্তি লাভ না ক'রে থাকে এবং ধর্ম্ম এবং সংযমের শিক্ষাকে সহস্র সহস্র নারীর জীবনে ফুটিয়ে তোলবার ব্রতকে যদি জীবন-সাধন ব'লে গ্রহণ কত্তে তাঁরা না পারেন, তাহ'লে আমার বিবেচনায় তাঁদের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে লব্ধ বড় বড় কৃতিত্ব-ব্যঞ্জক উপাধিগুলি এক্ষেত্রে বিনামূল্যেও বিক্‌বার যোগ্য হবে না।

নারীর শারীর শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তৃতীয় স্থান হচ্ছে শারীর শিক্ষার। একদিকে অসংযম, অপর দিকে শরীর-চর্চ্চার অভাব, এই দুইটীতে মিলে রমণী মাত্রকেই কুড়িতে বুড়ী সাজাচ্ছে। শরীরের চর্চ্চা স্ত্রীলোক-মাত্রকেই বিপদে আত্মরক্ষার ক্ষমতা দেবে, সর্ব্বকার্য্যে উৎসাহবতী কর্ব্বে, অকুতোভয় ও আনন্দময়ী কর্‌বে, স্থির যৌবনের অধিকারিণী কর্‌বে, সন্তান-পালনে অধিকতর পটুত্ব দেবে, সন্তানের জন্য তার বুকে বিশুদ্ধতর এবং অধিকতর দুগ্ধ দেবে এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের শক্তিকেও সাহায্য কর্ব্বে। সুসন্তান প্রসবের ক্ষমতাকে ব্যাহত না ক'রে যত প্রকার ব্যায়ামের অনুশীলন

সম্ভব, আমার মতে, শিক্ষাকালে কুমারীদের তার সর্ব্ববিধ সুযোগ দিতে হবে।

স্ত্রী-শিক্ষার সাহিত্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার পরেই স্থান হচ্ছে সাহিত্যিক শিক্ষার। নারীর মনোধর্ম্মের বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব, পুরুষ-জাতির উপর নারী মাতা, ভগ্নী, পত্নী ও কন্যারূপে যে বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, সেই প্রভাবের বিশেষত্ব বিচার ক'রে মেয়েদের জন্য পৃথক্ সাহিত্য রচনা কর্ব্বারও প্রয়োজন হবে। কখনো নারী সন্তানের প্রসবিত্রী, ধাত্রী এবং পালয়িত্রী। কখনো নারী পুরুষের প্রেম-পাত্রী, সোহাগ-বিধাত্রী, দুঃখ-সুখ-সংহর্ত্রী। কখনও বা সে সকল সুমহৎ কর্ম্মে প্রেরণাদাত্রী মহাশক্তি। কখনো সে সংসারের সহস্র কর্ত্তব্যে অবিচলিতা একনিষ্ঠা গৃহিণী, কখনো বা সে রুদ্র-রণাঙ্গনে ত্রিশূল-খর্পরধারিণী কপালিনী রণচামুণ্ডা। তার জীবনের প্রত্যেকটী দিক্ এই নারী-সাহিত্যে পূর্ণরূপে বিকশিত হবে।

স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনকে সফল করিবার উপায়

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এই স্ত্রী শিক্ষার কল্পনাকে সফল করার উপায় হচ্ছে, স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন উপস্থিত করা। পুরুষ বা কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এই আন্দোলন উপস্থিত কর্ল্লেই যথেষ্ট হবে না। বরং পুরুষদের বাদ দিয়েও এ আন্দোলন চলতে পারে এবং তাতে এর সাফল্য বিন্দুমাত্র ব্যাহত হবে না। আন্দোলন উপস্থিত কত্তে হবে পল্লীতে পল্লীতে, অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে। শিক্ষিতা, অর্দ্ধ-শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা সকল

নারীকে কন্যা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং আদর্শ সম্বন্ধে জাগ্রত ক'রে তুলতে হবে, প্রত্যেক নারীর কল্পনা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌তে হবে, প্রত্যেকের মনে অতীত ভারতের জন্য গৌরব-বোধ এবং ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য ত্যাগ-স্বীকারেচ্ছাকে প্রবুদ্ধ কত্তে হবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এইভাবে প্রবোধন-চেষ্টা চালাতে চালাতে জাতির নারীশক্তি এমন ভাবেই তৈরী হ'য়ে যাবে যে, একদিন একটা কল্পনাতীত ও অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে যখন জাতির সমক্ষে উপস্থিত হবে, নারী-জাতি কটাক্ষের মধ্যে সে সুযোগকে পূর্ণরূপে গ্রহণ কর্ব্বে এবং অতিশয় স্বাভাবিক ভাবে সমগ্র দেশব্যাপী স্ত্রী-শিক্ষার সুব্যবস্থা হ'য়ে যাবে।

বাঙ্গালী-ইজম্

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখুন যোগেনবাবু এইখানেই আমার বাঙ্গালী-ism, অনেকের অনেক রকম ব্যাধি থাকে, কারো Imperialism, কারো Bolshevism কারো Socialism, আমার বাঙ্গালী-ism, বাঙ্গালী-ইজমের স্বরূপ হ'ল কল্পনার শক্তিতে বিশ্বাস করা। কল্পনার চরম আতিশয্য আপনি কর্ম্মক্ষেত্রে রূপ নেবে। ভারতের নারীশক্তিকে কোন্ মূর্ত্তি পেতে হবে, সেইটির ধ্যান জমাবার চেষ্টা হ'ল বাঙ্গালী-ইজম্। পৃথিবীতে কর্ম্মেরই দাম সকলে দেয়, কল্পনার দাম কে দেয় ? কল্পনাই যে কর্ম্মের জননী, সুগভীর কল্পনা নিরবচ্ছিন্ন হ'লেই যে তার নাম হয় ধ্যান, তাই বা কে বোঝে ? ধ্যান যখন জম্‌ল তখনি সিদ্ধিরূপে দেবীর আবির্ভাব—বরাভয়-করে।

বৃহত্তর বাঙ্গালার অর্থ

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি চাই ভাবুক বাঙ্গালী কর্ম্মীদের সমগ্র ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ছড়িয়ে দিতে। তারা আর কিছু কর্ব্বে না, শুধু ভাব ছড়াবে। অতীতের ভারতবর্ষ কি ছিল, আর ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ কি হবে,—এই কল্পনার ছবি শুধু তারা মনের পটে এঁকে দেবে, প্রাণের পরতে গেঁথে দেবে। ভাবের যোগে তারা সমগ্র ভারতকে এক কর্ব্বে, খণ্ড ভারতে অখণ্ড-প্রেমের উদ্বোধন কর্ব্বে।

দাতা ও গ্রহীতা

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয় নিজালয়ে রওনা হইবার পূর্ব্বে সমস্ত কৃষিভূমিসমূহ পরিদর্শন করিলেন। সর্ষপ-শাক এবং পুঁইশাক দর্শনে তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন,—এমন সুদৃশ্য আবাদ আমি আর কখনও দেখি নাই।

শতমুখে প্রশংসা করিতে করিতে যোগেনবাবু বলিতে লাগিলেন,—স্বামীজী, যেদিন আশ্রম-ভূমির দানপত্র রেজেষ্ট্রি হয়, সেদিন আপনার ঘাড়ের উপর একপাল ট্রাষ্টি বসিয়ে আপনাকে শাসনে রাখ্‌বার কতই না বন্দোবস্ত হচ্ছিল কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ। আমি সেদিন সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা ক'রে ট্রাষ্টি-নিয়োগে বাধা দিয়েছিলাম। ট্রাষ্টি যদি হ'ত, তাহ'লে কি এই অরণ্যের এই পরিবর্ত্তন পাঁচ বছরেও সম্ভব হ'ত ? আপনি ত' ন-দশ মাসের মধ্যে ন-দশ বছরের কাজ করেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ট্রাষ্টি হ'তে গেলে ভাগের মা গঙ্গা খুঁজে বেড়াতেন।

যোগেনবাবু।—ট্রাষ্টি-নিয়োগের যখন কথা উঠ্‌ল তখন আপনি একবারও কেন অসম্মতি প্রকাশ কর্ল্লেন না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এই একশত বিঘা জঙ্গল ত' আমি আর প্রার্থনা ক'রে পাই নি! অপ্রত্যাশিতভাবে ভগবান্ এঁদের দিয়ে দান করাচ্ছেন। ভগবান্ যখন স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন, তখন আমি এর মাঝখানে কথা কইবার কে ? তাই আমি চুপ ক'রে রইলুম, ভগবানের উপরই ভার দিলুম।

যোগেনবাবু।—এই জন্যই ভগবান্ আমাকে তখন এত বড় উত্তেজনা দিয়েছিলেন। আমার মনে হ'ল, যে লোকটাকে পুপুন্‌কীতে টেনে আন্‌তে মাসের পর মাস চিঠিবাজি কত্তে হয়, যে লোকটাকে ভূমি-গ্রহণে সম্মত কত্তে পায়ে ধ'রে মিনতি কত্তে হয়, চ'খের জল ফেল্‌তে হয়, সেই লোকটা যাই স্বীকার কর্ল্লে—'এখানে আশ্রম হবে,' আর দুনিয়ার যত অবিশ্বাস তখনি এসে দাতার ঘাড় চেপে ধরবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দাতার এতে কোন দোষ নেই। তাঁর প্রকৃতি অতীব সাত্ত্বিক। প্রভাবশালী পরামর্শ-দাতার অনুরোধই তাঁকে চঞ্চল করেছিল।

যোগেনবাবু।—কিন্তু এতে দানের মর্য্যাদা কমেছে, মহিমা কমেছে। এদেশে এখনো দুটাকা সেলামীতে দুআনা খাজনায় জমি বিলি হয়। আর আশ্রমের এই জমি পাথর-কাঁকরে ভরা অতি নীরস বনভূমি। এবং আরও পরিতাপের কথা এই যে, প্রভাবশালী ব্যক্তিটী নিজে একজন সন্ন্যাসী। কিন্তু তখন মাতা সরস্বতীর এমন কৃপাই আমার উপরে হ'ল যে, আমার অকাট্য যুক্তি-নিচয়ের কাছে সব আপত্তি ভেসে গেল। দেখুন স্বামীজী,

সর্ব্বত্যাগীকে যে বাঁধতে চায়, সে নিজেকেই ফাঁকী দেয়। ত্যাগীকে বাঁধবার রজ্জু ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম,—দলিলের বয়ান নয়। স্বাবলম্বন যাঁর ব্রত, তাঁকে যদি ট্রাষ্টি-মাষ্টি দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করা হ'ত, তাহ'লে তিনি সাত দিনের মধ্যে গণেশ উল্টে দিয়ে কোথায় চ'লে যেতেন। ত্যাগীরা গড়্‌বেন আশ্রম, আর ট্রাষ্টি হবেন এসে স্বার্থের দাস গৃহীরা ! এটা আমার একেবারে অসহ্য হয়েছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দাতা দান-বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন শুদ্ধ মনে। আমাকে বিনয়, ভক্তি, আর্ত্তি দিয়ে দান-গ্রহণে স্বীকৃত করিয়েছিলেন নিষ্পাপ প্রাণে। কিন্তু সকল সময়েই দান-গ্রহণ বিধেয় নয়। দান-গ্রহণে স্বীকৃতি জানিয়ে আমি ভুল কর্ল্লুম। আমার ভুল দাতার অন্তরের সাত্ত্বিকতা নষ্ট কর্ল্ল। দান-গ্রহণ না করাই আমার উচিত ছিল।

স্বাবলম্বনের শক্তি

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেনবাবু গান্ধাভিমুখে রওনা হইলেন। অদ্যকার দিনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুক্তি'তে আশ্বিন মাসে যে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করা হইল। যথা—

"স্বাবলম্বন যে কত বড় শক্তি, একথা আমাদের অঞ্চলে পরিজ্ঞাত ছিল না। ১৩৩৪ এর আশ্বিন মাসে যখন প্রথম শ্রীমৎ স্বামীজী স্বরূপানন্দ পরমহংস মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য পুপুন্‌কী রওনা হই, তখনও জানিতাম না যে, চাঁদা সংগ্রহের বিরক্তির অন্তরালে কোন্ প্রসুপ্ত মহাতেজ লুক্কায়িত রহিয়াছে।

সাত্ত্বিক দাতার সাশ্রু-নয়নের আকুলতা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া যখন স্বামীজী শ্রদ্ধাভিষিক্ত দান নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করিলেন, তখনই বা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে, এই বনভূমি, এই সর্প-শ্বাপদের আবাসস্থল, এক পুণ্যময়ী মহাতীর্থ-ভূমিতে পরিণত হইবে ? কে জানিত, মানভূমের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট কৃষক এখানে স্বাবলম্বনের অমোঘ-শক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ঘরের কড়ি খরচ না করিয়া নূতন নূতন কৃষি-প্রণালী শিক্ষার সুযোগ পাইবে ?

"সন ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন পুপুনকী আশ্রম দেখিতে গেলাম। আশ্রম গৃহের জীর্ণদশা, আহারীয়ের অপ্রাচুর্য্য, কর্ম্মীদের ভীষণ জলকষ্ট সবই অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে দর্শন করিলাম। স্বামীজী যত্ন করিয়া সেবা করাইলেন কিন্তু আহারের উপকরণ যাহা পাইলাম, তাহা একমাত্র চিরদুর্ভাগ্য-দগ্ধ মানভূমেরই দীন-দরিদ্রের ঘরে সুলভ। মহুয়া ফুল সিদ্ধ খাইয়া বিষাদ-ভারাক্রান্ত চিত্তে গৃহে ফিরিলাম।

"পুনরায় ভাদ্র মাসে আশ্রমে গিয়া দেখিলাম, প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে স্বামীজী এবং তাঁহার দুইটী কর্ম্মী অনাবৃত দেহে মাঠের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। রৌদ্র-তাপে তাঁহাদের শরীরের উপরে যেন কালীর ছাপ পড়িয়াছে। প্রাতে তাঁহাদের জল-যোগ হয় নাই ; ক্ষুধায় ক্ষীণ তনু এবং অতিশ্রমে শীর্ণকায় এই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের পানে তাকাইয়া থাকিতে যেন দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ ও লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। আশ্রমের একমাত্র পর্ণকুটীরখানা বর্ষা ও সূর্য্যের তাপ নিবারণে একান্ত অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া কায়ক্লেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং মানভূমবাসী আমাদিগকে

বিদ্রূপ করিতেছে। কুটীরের ছাদনের খড়ে টাক ধরিয়াছে, বেড়ার সহস্র ছিদ্র-মধ্য দিয়া অসহনীয় দারিদ্র্যের মর্ম্মান্তিক যাতনা-প্রদমূর্ত্তি যেন দশনপংক্তি বিস্তার করিয়া অট্টহাস্য হাসিতেছেন।

"মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়া স্তম্ভিত হইলাম। অন্নের চারিপাশে শালের পত্রীতে থরে থরে ব্যঞ্জন সজ্জিত রহিয়াছে,—গণিয়া দেখিলাম, সংখ্যায় দ্বাদশটী। স্বামীজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —আজ অতিথি নারায়ণের কৃপায় আশ্রমের কর্ম্মীরা দ্বাদশ-ব্যঞ্জনের স্বাদ একদিনে পাইবে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, মরুভূমির মত এই অনুর্ব্বর মাটীতে যাবতীয় তরিতরকারী এই ত্যাগীদের নিজেদের শ্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। চাঁদার খাতার অপেক্ষা তাঁহারা রাখেন নাই বা কুলীর শ্রমের ভরসা তাঁহারা করেন নাই, ভরা-বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারায় ভিজিয়া হালের অভাবে তাহারা অফুরন্ত উৎসাহে কোদালই চালাইয়াছেন। একবার মনে হইল,—আরও ত' কত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করা কাহার পক্ষে সম্ভব হইত ? উপবাস-ক্লেশ-সহিষ্ণুতাই ইঁহাদের একমাত্র মূলধন, কিন্তু জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা কার্য্য-পরিচালনা করিয়া থাকেন, বড় বড় দাতার মোটা মোটা টাকার থলির উপর বসিয়া যাঁহারা জনসেবায় প্রয়াস পান, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এমন একটী ব্যাপার ঘটাইতে পারিতেন ? আরও মনে হইল,—এই মানভূমে এমন কোন্ রাজা বা জমিদার আছেন যে, এই ভাদ্র মাসের দারুণ দুর্দ্দিনে দ্বাদশটী থাকুক, গৃহ-জাত অন্ততঃ পাঁচটী ব্যঞ্জনের দ্বারাও, অতিথি-সেবা করিতে পারিতেন ?

"রৌদ্র কমিলে বৈকাল বেলায় আশ্রমের সমস্ত ভূমি পরিদর্শন করিতে বাহির হইলাম। শ্মশানের মত চির-পরিত্যক্ত ভূমিখণ্ডের এই অভাবনীয় শ্যাম-শোভা দর্শনে নয়ন-নাচিয়া উঠিল। বুঝিলাম, পূর্ব্ব-জন্মের পূণ্যফলে আমরা মানভূমবাসীরা একশত বিঘা তুচ্ছ অরণ্য-বহুল পার্ব্বত্য ভূমির বিনিময়ে কি মহার্ঘ্য রত্নই লাভ করিয়াছি—কাচ দিয়া কি অমূল্য কাঞ্চনই আমরা আহরণ করিয়াছি।"

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৭ই ভাদ্র, ১৩৩৫

সংসাররূপ জতুগৃহ হইতে উদ্ধারের উপায়

অদ্য আশ্রমের জীর্ণ পর্ণ-কুটীরের কিঞ্চিৎ সংস্কার হইতেছে। পাতার বেড়া ও তৎসংলগ্ন মাটীর চাপ বৃষ্টির জলে ধ্বসিয়া গৃহখানাকে অধিকাংশ স্থলে দন্তহীন প্রৌঢ়ের হাস্যবিস্ফারিত মুখের ন্যায় দেখাইতেছে।

কাজ করিতে করিতে একজন কর্ম্মী ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, —সংসারটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারটা জতুগৃহ। দেখতে দিব্যি চমৎকার; বসা, ঘৃত, ধূনা, বাঁশ, শন, কাঠ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দিয়ে মনোরম ক'রে প্রস্তুত। কিন্তু কখন যে আগুন লাগে, তার ঠিক নেই।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসিলেন,—তাহ'লে উপায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপায় সুড়ঙ্গ খনন করা, আর, চারিদিকের বনপথগুলি চিনে রাখা। বনপথ চিন্‌তে হ'লে সাধুসঙ্গ

কত্তে হয়, তাঁদের পদচিহ্ন ধ'রে ধ'রে প্রতিদিন একটু একটু ক'রে ঘুরে ফিরে দেখতে হয়। এভাবে ক্রমশঃ সব পথঘাট চেনা যায়। আর, ভগবানের নামের শাবল নিয়ে সুড়ঙ্গ খনন কত্তে হয়। কিন্তু এ কাজটীতে চাই গোপনতা, নইলে পুরোচনের ভয় আছে।

পুরুলিয়া,

৮ই ভাদ্র, ১৩৩৫

গেরুয়ার মূল্য

শ্রীশ্রীবাবামণি পুরুলিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে জনৈক ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—গৃহস্থদের গৈরিক পরিধান করা উচিত কি না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, কোনও গৃহী যদি সন্ন্যাসীর এই ইউনিফর্ম্ম পরিধানই করেন, তুমি তার কি কর্ব্বে ? সংসারী হোন, আর সন্ন্যাসীই হোন, তার সত্যিকার মূল্য নির্ণীত হবে ভিতরের শুদ্ধতা দিয়ে। এক টুক'রা গেরুয়ার জন্য কখনো মানুষ বড় বা ছোট হয় না।

ব্রহ্মচারী।—গেরুয়ার কি কোনও মূল্যই নেই ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আছে, কিন্তু সেই মূল্যটা শুধু পরিধানকারীরই নিকটে। গৈরিক পরিধানে তোমার অন্তরে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যাদি জগতের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ সন্ন্যাসীদের পরমমঙ্গলময়ী স্মৃতি জাগরিত হয়, তোমার অন্তর পবিত্রতার আবেশে ভরপূর হয়, তোমার চিত্তের উচ্চ গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তোমার চিত্তের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হয়, তোমার আত্মবিশ্বাস উপচিত হয়, সৎসঙ্কল্পের

শক্তি বাড়ে। এইখানেই গৈরিক পরিধানের সত্যিকারের সার্থকতা। গৈরিক তোমাকে পতনের পথ থেকে দূরে রাখ্‌বে, তোমাকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আন্‌বে। এ যদি না করে, তাহ'লে জান্‌বে, লোকদৃষ্টিতে গেরুয়ার মূল্য আর গু-মাখা-নেকড়ার মূল্য সমান। গেরুয়া যখন আত্মশুদ্ধির উপায় না হ'য়ে লোকমান পাবার উপায় হয়, তখন গেরুয়াধারী ত' একটা গাঁটকাটা জুচ্চোর। গেরুয়া যখন ব্রতনিষ্ঠার সহায় না হ'য়ে বাণিজ্য-বৃদ্ধির উপায় হয়, তখন গেরুয়াধারী ত' একটা সিঁদেল চোর। সমাজ তাকে সময় এলেই শাস্তি দেয়। আর, গেরুয়া যেখানে তপস্যার বলে, পবিত্রতার বলে, সংযমের বলে নিজের মূল্য রক্ষা কত্তে পেরেছে, সেখানে সমাজ বিনা আহ্বানেই এসে মাথা নত করে।

ত্যাগ ও চরিত্রবল

বৈকালে স্থানীয় হিন্দু-সভার বাড়ীতে জিলা স্কুল ও ভিক্টোরিয়া স্কুলের বিদ্যার্থীরা আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিলেন,—এমন জিদ্ আমি করব না যে, তোমরা প্রত্যেকেই সর্ব্বত্যাগী হও। জীবনে পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার যে যতখানি কত্তে পার করবে, কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই আগে চরিত্রের শুভ্রতা। চরিত্র-বল যার নেই, সে ত্যাগ কত্তে চাইলেও পারে কৈ ? সর্ব্বস্ব ত্যাগ কত্তে ব'সেও সে পরস্বাপহরণ ক'রে ফেলে। চরিত্র-বল না থাকলে মানুষ রক্ষক হ'য়ে ভক্ষক হয়, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শুধু প্রকৃতির দুর্নিবার তাড়নায় মহাপাপের অনুষ্ঠান করে। চরিত্রের

বল না থাক্‌লে মানুষ দীনদুঃখীকে দয়া কত্তে গিয়ে লালসার জালে আটক পড়ে, ভালবাসার জনকে ভালবাসতে গিয়ে নিজের মনুষ্যত্বের মাথা হেঁট করে। চরিত্রহীন হ'লে বুদ্ধি বল, মেধা বল, শক্তি বল, আর সম্পদ বল, সব বৃথা, সব নিরর্থক,—কারণ, চরিত্রহীনের সামর্থ্য শুধু অমঙ্গলই প্রসব করে।

সচ্চরিত্রতার উৎস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সচ্চরিত্রতার উৎস শ্রীভগবানের পাদপদ্ম। ভগবান্ সত্যস্বরূপ। তাঁর পাদপদ্ম-আশ্রয়ে জীবন থেকে অসত্য নির্ব্বাসিত হয়, কপটতার মেঘ অপসারিত হয়, উন্মুক্ত প্রশান্ত বক্ষে বিশ্বজয়ের সাহস সঞ্চারিত হয়। জীবনকে যদি চরিত্রের শক্তিতে সমৃদ্ধ কত্তে চাও, চরিত্রের মাধুর্য্যে সুন্দর কত্তে চাও, তা'হলে শরণাগত চিত্তে শ্রীভগবানের আশ্রয় নাও, তাঁর পবিত্র নামকে পরমাবলম্বন ব'লে ধর।

ভগবানের নামের শক্তি-প্রকাশের অনুকূল সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, ভগবানের নামাশ্রয় ক'রে চল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে সত্য, পবিত্রতা ও পরসেবা এই তিনটীর যথাসাধ্য অনুশীলন কত্তে হবে। নামাশ্রয়ী হ'য়েও যে প্রতিনিয়ত অসত্য-সেবা করে, মিথ্যাচারী হয়, তার জীবনে নামের শক্তির প্রকাশ ঘট্‌তে বিলম্ব ঘটে। নামাশ্রয়ী হ'য়েও যে অপবিত্র কার্যের অনুষ্ঠান করে, অব্রহ্মচারী হয়, নীচ সুখের লোভে নিজের মনুষ্যত্বের মাথায় পদাঘাত কত্তে দ্বিধা-বোধ করে না, তার জীবনেও নামের

শক্তিপ্রকাশে বিলম্ব হয়। নামাশ্রয়ী হওয়ার পরে পরদুঃখ নিবারণে যে কুণ্ঠিত হয়, নিজের সুখকে, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে যে বড় ক'রে দেখ্‌তে থাকে, তার জীবনেও নামের শক্তি-প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু নামাশ্রয় লাভের পরে যে সত্যরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয় এবং পরদুঃখ নিবারণে সাধ্যানুযায়ী যত্নবান্ থাকে, তার ভিতরে নামের শক্তি প্রকাশিত হয় অতি দ্রুত, অতি আশ্চর্য্যভাবে। তার দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়।

নামাশ্রয় ও আলস্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামাশ্রয় ক'রে অনেকে আলস্য-পরায়ণ হয়, কর্ম্মবিমুখ হয়। তা' কিন্তু প্রার্থনীয় নয়। অনন্তবীর্য্য শ্রীভগবানের নাম তোমাদিগকে বীর্য্যবান্ করুক, বিচিত্রকর্ম্মা শ্রীভগবানের নাম তোমাদিগকে কর্ম্মবীর ক'রে গ'ড়ে তুলুক্। এইটীই হচ্ছে সত্যিকার প্রার্থনীয়। নামাশ্রয়ের ফলে মন যখন অন্তর্মুখ হ'তে আরম্ভ করে, তখন শরীরের আলস্য কতকটা অবশ্যম্ভাবী। শুধু মনটা দিয়েই যাঁরা জগতের সেবা করেন, তাঁদের পক্ষে এই দৈহিক কর্ম্মহীনতা দোষের নয়। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা' দোষের হবে, অন্তত মনের সেই সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীলতার উন্নত অবস্থা তোমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লাভ কত্তে পাচ্ছ। নামাশ্রয় আলস্যের কারণ হ'লে তোমরা ভয় পেয়ে নাম ছেড়ে দিও না, বরং নামকে আরও জোরে আঁকড়ে ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত শুদ্ধিজনক, নামে রুচিবর্দ্ধক, ভগবদ্‌বিশ্বাসের উপচায়ক এবং সর্ব্বজীব-হিতকারক কোনও না কোনও বহির্ম্মুখ সৎকর্ম্মে

আত্মনিয়োগ কর্ব্বে। তাতে আলস্য-প্রবণতা কেটে যাবে, অথচ নাম-নিষ্ঠাও নষ্ট হবে না।

চিত্তশুদ্ধিজনক বহির্ম্মুখ কর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের, পরের বা দেশের সেবা বা উন্নতি-মূলক সকল কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধিকর বহির্ম্মুখ কর্ম্ম, যদি এই কর্ম্মের সাধনা বিদ্বেষ-বুদ্ধিহীন কর্ত্তব্যানুরাগের দ্বারা প্রণোদিত হয়। মনে কর, এক স্থানে কতকগুলি অসহায়া মহিলা একদল নরপশুর দ্বারা উৎপীড়িতা হচ্ছেন। যদি উৎপীড়নকারীদিগকে নিবারিত কর্ব্বার জন্য ছুটে যাও, এ কর্ম্ম কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারাই প্রণোদিত হ'তে হবে। কিন্তু উৎপীড়নকারীদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি নিয়ে যদি যাও, তাতে চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত হবে। অবশ্য, 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা করিও না'—এ বড় কঠিন উপদেশ। যখন কোনও ব্যক্তি মনুষ্য-সমাজের অকল্যাণ করে, তখন তাকে নিবারণ কত্তে গিয়ে যেরূপ ব্যবহার প্রয়োজন, তা' রূঢ় হোক্, অশিষ্ট হোক্, তিক্ত-কটু-কষায় যাই হোক্, তোমাকে কত্তেই হবে। তাকে বিদ্বেষ বলা চলে না। একজন যখন তোমার মাতার, ভগ্নীর বা কন্যার সতীত্ব নাশ কচ্ছে, তখন তার সামনে গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়িয়ে স্তোত্রপাঠ করা কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রতি ঘোরতর অবিচার করাই হবে। তখন অর্দ্ধচন্দ্র বা বজ্রমুষ্টি হ'তে আরম্ভ ক'রে যত প্রকার শাসন সম্ভব, প্রয়োজন মত সবই প্রয়োগ কত্তে হ'তে পারে। তাকে বিদ্বেষ বলা চলে না। কিন্তু যেহেতু একজন আজ তোমার শাসনের পাত্র হয়েছে, সেই হেতু, যতকাল তুমি কিম্বা সে বেঁচে আছে, ততকালই তার কথা

স্মরণ করা মাত্র দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কর্ব্বে, একেই বলে বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ চিত্তশুদ্ধির বিঘ্ন।

বিদ্বেষ নিবারণের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য এই বিদ্বেষ জগতের অধিকাংশ মানবের পক্ষেই স্বাভাবিক। একটা লোক, একটা বংশ বা একটা জাতি যখন অপর একটা লোক, অপর একটা বংশ বা অপর একটা জাতির আত্মসম্মানে, উদরান্নে বা উন্নতির মূলে বারংবার আঘাত কত্তে থাকে, তখন বিদ্বেষ একেবারে মজ্জাগত বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়। বিদ্বেষ তখন প্রকৃতিগত হয়। সেই অবস্থায় বিদ্বেষমূলক বাক্য প্রয়োগ বা আচরণ না করাই আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু যাদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর কচ্ছে, জাতির যারা মুক্তিদাতা, তাদের কাছ থেকে এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটুকুই আমি প্রত্যাশা কচ্ছি। কর্ত্তব্যবুদ্ধি যদি তোমাদের দ্বারা ঘোরতর নৃশংস কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করাতে চায়, কর, কিন্তু নির্ব্বিদ্বেষ হ'য়ে। ডাক্তার যখন ফোঁড়ায় ছুরী চালান, তখন তাঁর মনে নিষ্ঠুরতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু রোগীর উপরে তার বিদ্বেষ থাকে কি? শিক্ষক যখন অমনোযোগী ছাত্রকে বেত মারেন, তিনি তখন নির্ম্মম হ'তে পারেন, কিন্তু ছাত্রের উপরে তাঁর বিদ্বেষ থাকা উচিত কি? কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাকে তোমার নিকটে অপরাধী করেছে, তুমি নিজেও যদি সেই অপরাধে অপরাধী না হ'য়ে থাক, তাহ'লে প্রয়োজন-স্থলে তার সম্পর্কে বিবেকের আদেশ নির্ম্মম নিষ্ঠুর হ'য়েই পালন কত্তে হবে—কিন্তু বিদ্বেষবুদ্ধিহীন চিত্তে। বিদ্বেষবুদ্ধি নিবারণের উপায়—নিয়ত

ব্রহ্মস্মরণ, শ্বাসে-প্রশ্বাসে ভগবানের নাম করা, আর নামের সাথে চল্‌তে চল্‌তে প্রিয় ও অপ্রিয়, তিক্ত এবং মধুর সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য অনুদ্বিগ্ন চিত্তে সম্পাদন করা।

তরুণ বিদ্যার্থীর চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা বিদ্যার্থী। এখনও বয়স পরিপক্ক হয়নি। চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মের জন্য তোমাদিগকে ত্রিভুবন আলোড়িত কত্তে হবে না। অতি সহজ সহজ কাজের মধ্য দিয়েই তোমরা চিত্তশুদ্ধি লাভ করার চেষ্টা কত্তে পার। দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। যেমন ধর, নিজের বাড়ীতে নিজের হাতে দুটী চারটী লাউ, কুমড়া, শশা, পেঁপে বা পেয়ারার গাছ তোমরা অনায়াসে জন্মাতে পার। তারপর ফসল যখন হ'ল, তখন নিজের হাতে তুলে শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে দশজনকে বিতরণ কত্তে পার। এই বিতরণের ফলে লোকের সঙ্গে তোমাদের প্রীতির সম্পর্ক বাড়্‌বে। আর কতক লোকের স্থায়ী একটা লাভ এই হবে যে, ভাল জিনিষ খেতে খেতে তার উপরে তাদের একটা লোভ আসবে এবং এর ফলে তারা নিজ গৃহে এই জিনিষটী উৎপাদন কত্তে আগ্রহী হবে। ফলে তাদের আলস্য দূর হবে, হয়ত সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যও কতক কমবে। তোমার পক্ষে এই কাজটী অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই যে তুচ্ছ একটী কাজ, এর মধ্য দিয়ে চিত্তে যে অপরিমেয় আত্মপ্রসাদ জন্মাবে, তাই তোমাকে ঠেলে নিয়ে এর চাইতে অনেক বড় বড় পরার্থমূলক কাজে ফেলবে এবং যোগ্যতার পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ ক'রে

দেবে। আমরা পুপুন্‌কী আশ্রমে ঠিক্ এই কাজটী কচ্ছি। * তাতে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ ও উদার হচ্ছে, স্বার্থপরতা ক'মে যাচ্ছে। এই ক্ষুদ্র কাজ ক্রমে আমাদের বড় কাজের যোগ্যতা দেবে। এই রকম আরো শত শত ছোট কাজ আছে, যা তোমরা চিত্তশুদ্ধির জন্য অনায়াসে হাতে নিতে পার। গ্রামের রাস্তা-নির্ম্মাণ, কূপ-খনন, জলাশয়-খনন প্রভৃতি কাজ অনায়াসে তোমরা কত্তে পার। সাফল্য অসাফল্যের দিকে একদম তাকাবে না। লোকের উপকার হবে অথচ হাতের কাছে পাচ্ছ, এমন কাজ পেলেই চিত্তশুদ্ধির জন্য তা' গ্রহণ কর্ব্বে। হাতের কাছে সহস্র সহস্র কাজ প'ড়ে রয়েছে। চক্ষু খুলে একবার তাকালেই স্পষ্ট দেখতে পাবে।

পুরুলিয়া,
৮ই ভাদ্র, ১৩৩৫

প্রণামের উদ্দেশ্য

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতঃকালে মানভূমের ঋষিকল্প জাতীয় নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে "শিল্পাশ্রমে" শুভাগমন করিলেন। ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত নিবারণবাবু বারংবার শ্রীশ্রীবাবামণির পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

---

* ১৩৩৫ সালের আবাদে পুপুনকী আশ্রমে যে ফসল জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় তিন শত মিষ্টি কুমড়া, দশ মণ শকরকন্দ আলু, ছয় মণ চিনাবাদাম, দুই মণ পুঁই, দুই মণ ঢেঁড়শ, এক মণ ঝিঙ্গা এবং প্রচুর লঙ্কা, চীনা সর্ষপ শাক প্রভৃতি জনসাধারণের মধ্যে কৃষির উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বিতরিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জানেন নিবারণবাবু, আপনি আর আমি এক ও অভেদ। কে কার প্রণম্য, কেই কার প্রণাম নেয় ?

নিবারণবাবু বলিলেন,—দুই ছিলাম, এক হ'লাম। এই জন্যই ত প্রণাম। নইলে প্রণামের যে কোনও মানে হয় না স্বামীজী। এক কর্ম্মযোগী অপর কর্ম্মযোগীকে পাইয়া পরস্পরের সহিত আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন। মহোৎসাহে সৎকথা চলিতে লাগিল।

কর্ম্মযোগের আদর্শ

নিবারণবাবু বলিলেন,—ভগবানের শক্তিকে সত্য ব'লে জেনে তাঁকে সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা জেনে ফলাফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হ'য়ে কর্ম্ম ক'রে যাওয়াই কর্ম্মযোগীর আদর্শ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁকে বক্ষে, বাহুতে, জীবনে, মৃত্যুতে, সুখে, দুঃখে, নিন্দায়, প্রশংসায় নিত্য উপস্থিত জেনে, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে, তাঁর বীর্য্যে বীর্য্যবান্ হ'য়ে, হাতে মালা পড়্‌লে নামজপ করা, অসি পড়্‌লে শত্রু বধ করা, এই হচ্ছে কর্ম্মযোগীর আদর্শ।

নিবারণবাবু হাসিয়া বলিলেন,—একই কথা হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আপনার কথার সঙ্গে আমার কথা কখনো বিরুদ্ধতা কত্তে পারে না। আপনি আর আমি যে এক।

বক্তৃতা বনাম প্রশ্নোত্তর-সভা

বৈকাল বেলা গান্ধার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয়ের পুরুলিয়াস্থিত বাসাবাড়ীতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সমবেত হইল। সকলেই বলিল,—কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কালকের মত একটানা বক্তৃতা কত্তে পারব না বাপধন। তোমরা প্রত্যেকে যার যা জ্ঞাতব্য, তালিকা ক'রে প্রশ্নাকারে লিখে দাও, আমি একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একঘেয়ে বক্তৃতার চাইতে এইরূপ প্রশ্নোত্তর দিয়ে তোমাদের কাজ হবে বেশী। কারণ, তোমাদের যার যে জিনিষটীর জন্য ঔৎসুক্য, সে জিনিষটীই আমার কথা থেকে সংগ্রহ ক'রে নিতে পার্ব্বে। আর, এতে আমারও অনেক সময় বাঁচ্‌বে।

একটী ছাত্র বলিল,—কেন, আমাদের কোন্ বিষয় জানবার প্রয়োজন, তা ত' সবই আপনি জানেন। তবে নিজেই কেন সে সব ব'লে যান্ না ? আমাদের প্রশ্ন করার অপেক্ষা কেন করবেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের কাছে যত কথা বলা দরকার, তার সব যদি বল্‌তে হয় বাপ্, তবে কয় মাস বা কয় বৎসর কথা কইতে কইতে পেরিয়ে যাবে, তাঁর ঠিক নেই। তোমাদের দরকার ত' অফুরন্ত। সব কথাই একদিনে বলা চলে না, আর বল্লেই বা তোমরা এক দিনে সব হজম কত্তে পার্ব্বে কেন ? কতকগুলি নূতন কথা জানাই প্রশ্নোত্তর-সভার উদ্দেশ্য নয়। বক্তৃতা শুন্‌লে লোকে অনেক নূতন কথা জান্‌তে পারে, নূতন নূতন চিন্তার উন্মেষ হয়। কিন্তু প্রশ্নোত্তর-সভার উদ্দেশ্য তা' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রশ্নোত্তর-সভার উদ্দেশ্য হ'ল সংশয়-নিরসন। বিভিন্ন বিরোধী মতের সংস্পর্শে এসে যখন মনে সংশয় জাগে, তখন সেই সংশয় দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন নূতন কথা জান্‌লেও তা' দিয়ে জ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন করা যায় না।

ব্যায়ামে মনঃসংযোগ

একজনের প্রশ্ন ছিল, ব্যায়ামকালে মনঃসংযম করার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি তদুত্তরে বলিলেন,—ব্যায়াম আরম্ভ কর্ব্বার অব্যবহিত পূর্ব্বে মন যদি কোনও কারণে চঞ্চল থাকে, তাহ'লে ব্যায়াম-রত অবস্থাতেও সে চঞ্চলতা বজায় থাকে। এজন্য ব্যায়াম আরম্ভ করার পূর্ব্বেই মনকে একটু স্থির সংযত ক'রে নিয়ে তার পরে ব্যায়াম আরম্ভ করা উচিত। ভীত, ক্রুদ্ধ, বিব্রত অবস্থায় এজন্যই ব্যায়াম করা নিষেধ। কোনও গুরুতর কার্য্য অর্দ্ধ-অসমাপ্ত রেখে তাড়াহুড়া ক'রে ব্যায়াম আরম্ভ কর্লে ব্যায়াম-কালে মন বারংবার সেই অসমাপ্ত কার্য্যের দিকেই ধাবিত হবে, শরীরের শ্রমরত পেশীগুলির উপরে বস্‌তে চাইবে না। কোনও গুরুতর কার্য্য ব্যায়ামের অব্যবহিত পরেই কর্ব্ব ব'লে তীব্র সঙ্কল্প ক'রে নিয়ে ব্যায়াম আরম্ভ কর্লেও ঠিক এই অবস্থাই হয়। এজন্য ব্যায়াম আরম্ভ করার পূর্ব্বে মনকে একেবারে সর্ব্বসঙ্কল্পবিহীন ক'রে নিতে হবে। এই বিষয়ে একটু সফলতা এলেই নিজের দেহটার উন্নতির ধ্যান কত্তে থাক্‌বে। তারপর ব্যায়াম আরম্ভ কর্লেই সহজে মন ব্যায়ামরত পেশীগুলির উপরে স্থির হ'তে পার্ব্বে।

সঙ্কল্পবিহীন হওয়ার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বসঙ্কল্পবিহীন হওয়ার অনেক উপায় আছে। তার মধ্যে একটী অতি সহজ উপায় হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিরুদ্ধ অবস্থায় গুচ্ছে গুচ্ছে প্রণব-জপ করা।

সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণে ও ত্যাগে মিনিট খানিক প্রণব-জপ ক'রে হঠাৎ বায়ুকে অল্পকালের জন্য গতাগতিহীন ক'রে নাও এবং সেই অবস্থায় গুচ্ছে গুচ্ছে নামজপ কর। যাই দেখ্‌লে বায়ুকে নিশ্চল রাখতে গেলে সামান্য কষ্টবোধ হচ্ছে, অমনি বায়ুকে আবার স্বাভাবিক ভাবে চল্‌তে দাও। এই ভাবে কিছুক্ষণ পরে পরে একবার শ্বাসের পর বায়ু নিরোধ কর্ব্বে এবং একবার প্রশ্বাসের পর বায়ুনিরোধ কর্ব্বে। অর্থাৎ একবার বায়ু নিরুদ্ধ হবে বক্ষের ভিতরে, আর একবার নিরুদ্ধ হবে শরীরের বাইরে। এই ভাবে নিয়মিত ভাবে কয়েক দিন অভ্যাস কর্লেই বায়ুর নিরুদ্ধ অবস্থাতে মন সর্ব্বসঙ্কল্পরহিত হ'তে থাক্‌বে।

ব্যায়ামের কুফল ও তৎপ্রতীকার

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকল জিনিষেরই ভাল-মন্দ দুইদিক আছে, ব্যায়ামেরও আছে। ব্যায়ামকারীরা অনেকে অত্যাচারী হয়, পরের প্রতি নিষ্ঠুর হয়, গোঁয়ারগোবিন্দ হয়। অনেকে কর্ম্মজীবনে একান্ত অলস হয়, দুইবেলা পাঁচ হাজার ডন আর দশ হাজার বৈঠক দিতে যার আলস্য নেই, সমাজ-সেবায় তাকে নিতান্ত পরাঙ্মুখ দেখা যায়। এর প্রতিকারের উপায় হ'ল, প্রতিদিন ব্যায়াম আরম্ভ করার আগে এই সকল অনর্থের বিরুদ্ধ কতকগুলি সৎসঙ্কল্প পরিপুষ্ট করা। ব্যায়ামের পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যায়ামাগারে একটী ক'রে সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে গীত হওয়ার নিয়ম করা উচিত। সেই সঙ্গীতের বিষয় হবে,—'বজ্রের চাইতেও কঠিন আমার দেহ হবে, কিন্তু এ দেহ বিপন্নকে রক্ষা কর্ব্বে, দুর্ব্বলকে ক্ষমা কর্ব্বে, এ দেহ সর্ব্বজীবসেবায় আত্ম-নিয়োগ ক'রে নিজের অস্তিত্বকে সার্থক

করবে। দেহ আমার ইস্পাতের মত কঠিন হবে, কিন্তু মন আমার কোমল হবে, পরদুঃখে কাতর হবে, আত্মসুখে অনাদরকারী হবে।' এ সঙ্গীতে রাজসিক ভাবের উদ্দীপনার চাইতে সাত্ত্বিক ভাবের প্রাধান্য রক্ষা কত্তে হবে। নইলে ফল হবে বিপরীত। দেশমধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্যায়ামগার আজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, প্রত্যেক পল্লীতে অন্ততঃ একটী ক'রে ডনের আখড়া চাই-ই চাই, কিন্তু তার ফলে উদ্ধত, অবিবেচক, পরোৎপীড়ক একদল গুণ্ডার যদি আবির্ভাব হয়, তাতে দেশের সত্যিকারের মঙ্গল পরাভূত হবে। কল্‌কাতা, কাশী, মির্জ্জাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য ডন্‌গীর আছে, কিন্তু এদের ব্যায়ামাভ্যাস জাতিকে লাভবান কর্ল্ল কই ? নিরীহ পথিকদের বুকে ছুরী মেরে তাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেওয়া আর গোহত্যা বা মস্‌জিদের-সমক্ষে গীতবাদ্যের অছিলায় শহরব্যাপী গৃহদাহ, নরহত্যা, স্ত্রীলোকের অবমাননা ও দোকানপাট লুণ্ঠন করা ছাড়া আর কোনও মহৎ কার্য্য এই সব কুস্তিগীরেরা কচ্ছে কি না, খুঁজে দেখা প্রয়োজন। দেশে যদি আজ কোনও মহৎ কর্ত্তব্যে প্রাণদানের আহ্বান আসে, এদের একজনকেও হয়ত কর্ম্মক্ষেত্রে দেখতে পাবে না।

গুণ্ডার শ্রেণীভেদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক শ্রেণীর ডন্‌গীর আছে, যারা সকল সমাজে গুণ্ডা ব'লেই পরিচিত, ভদ্রলোক ব'লে খ্যাতি চায়ও না। কিন্তু ব্যায়ামাভ্যাস আরও এক শ্রেণীর গুণ্ডা উৎপাদন করে। তারা ভদ্রলোকের মান চায়, প্রতিপত্তি চায়, ভদ্রসমাজের অঙ্গীভূত হ'য়ে বাস করে, স্বদেশ-সেবায় প্রাণ-উৎসর্গের কামনা

করে এবং স্বাধীনতালাভকে জীবনের পরমসাধনা ব'লে গ্রহণ করে। এরা নিজেরা চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা চায়, তার জন্য আশ্চর্য্য ত্যাগ-স্বীকারও করে, কিন্তু অপর কেউ যখন নিজের চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতাকে অনুসরণ কত্তে গিয়ে এদের অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করে বা এদের অমনোনীত চিন্তা প্রচার করে, তখন যুক্তি ছেড়ে এরা ঘুষির আশ্রয় লয়, লাঠি ধরে, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির টিকি ধ'রে টানে বা দাড়ি ছিড়ে নেয়, অকথ্য অপমান করে। ব্যায়ামাভ্যাস মানুষকে আত্মপ্রত্যয় দেয়, সহস্র বিপদের সম্মুখীন হবার সাহস দেয়, কিন্তু তার ফলে যদি একদল ভদ্রবেশী বর্ব্বরের সৃষ্টি হয়, তা' হ'লে দেশের প্রভূত মঙ্গল তাতে পরাভূত হবে।

ব্যায়াম ও ভগবৎ-সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,----এইজন্যই আমি ব্যায়াম-আন্দোলনের সঙ্গে ভগবৎ-সাধনার আন্দোলনকে একসাথে জুড়ে দিতে চাই। ভগবৎ-সাধনা ব্যায়ামের সুফলটুকুকে পরিবর্দ্ধিত কর্ব্বে, কুফলটুকুকে নিবারিত কর্ব্বে। ভগবৎ-সাধনা ব্যায়ামাভ্যাসকারীর আত্মপ্রত্যয় ও চিত্ত-সংযমের ক্ষমতা বর্দ্ধিত কর্ব্বে, তার নিষ্প্রয়োজনীয় ঔদ্ধত্য ও অশিষ্টতা দূরীভূত কর্ব্বে। আমার চিকিৎসা-শাস্ত্রে একটী সর্ব্বরোগহর মহৌষধের উল্লেখ আছে। সেটি হচ্ছে শ্রীভগবানের নাম।

অতঃপর আরও বহু বিষয় আলোচিত হইবার পরে সন্ধ্যার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।

কলিকাতা,
১৩ই ভাদ্র, ১৩৩৫

মহিলা-প্রতিষ্ঠান

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আসিয়াই বহু মুলতুবি চিঠির জবাব দিতে বসিলেন। মেদিনীপুর-নিবাসী একজন স্ত্রীজাতির-উন্নতিকামী ব্যক্তির পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"যে মহিলা-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া জাতির অর্দ্ধাঙ্গব্যাপী পক্ষাঘাত-গ্রস্ততার বিনাশ ঘটিবে, আমি মনে করি না যে, তাহার প্রতিষ্ঠার সময় খুবই সুদূরে। কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুকূল অবস্থাসমূহের অভ্যুদয় সম্পূর্ণরূপে সমাজ-কর্ম্মীদের চিত্তশুদ্ধির ফলেই ঘটিবে। মহিলা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দেশের এবং জাতির পক্ষে আশু প্রয়োজনীয় জানিয়াও আমি এইজন্যই বিন্দুমাত্রও চিন্তিত বা বিব্রত হই নাই। আমি নিশ্চিত জানি, যখন যতটুকু আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে পারিব, তখন ততটুকু কাজের সুযোগ আমার প্রাণের ঠাকুর নিজের গরজে আসিয়া সৃষ্টি করিয়া দিয়া যাইবেন। সুযোগ-সৃষ্টির দায়িত্ব আমার নহে, চিত্তশুদ্ধির জন্য অনাসক্ত আগ্রহে অনলস যত্নে কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই আমার দায়িত্ব, স্বভাবতঃ প্রাপ্ত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া লওয়াই আমার দায়িত্ব।

"মহিলা-প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে প্রতিষ্ঠানের ভূমি চাই, অর্থ চাই, কর্ম্মিণী চাই। এই তিনটীর একটিও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আমার নিকটে আসিয়া পৌঁছে নাই। অতএব এই তিনটীর একটীকেও সংগ্রহ করিবার জন্য কণামাত্র চেষ্টা করিতে আমি অসম্মত।

"ভূমি এবং অর্থ হইতে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইতেছেন কর্ম্মিণী। কারণ, পরস্বাপহরণে যে বিশ্বাসী হইবে, দস্যুবৃত্তি দ্বারা সে অর্থ সংগ্রহ হয়ত করিতে পারে এবং সেই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ভূমিও পাইতে পারে। কিন্তু দস্যুতা দ্বারা কর্ম্মিণী মিলে না।

"আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, আমাকে দিয়া যদি মহিলা-প্রতিষ্ঠানের কার্য্য শ্রীপ্রভু করাইয়া লইতে চাহেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তিনি কর্ম্মিত্বের যোগ্যতা-সম্পন্না বা যোগ্যতার সম্ভাবনাবিশিষ্টা বহু মহিলাকে ত্যাগেচ্ছা-প্রেরিতা করিয়া আমার প্রতি সন্তান-বুদ্ধিতে আকৃষ্টা করিবেন। আমার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের যোগ না থাকিলেও অভাবনীয় উপায়ে এই সকল মায়েরা আমাকে একান্ত আপন জানিয়া অকপট ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উৎপীড়ন সহ্য করিবার ক্ষমতা লইয়া স্বভাবতঃ আমার চিন্তাকে পরিবেষ্টন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন এবং আত্মোৎসর্গের সাধনায় ব্রতিনী হইবেন। আমি ইহাদিগকে না চাহিলেও ইঁহারা আমাকে চাহিবেন এবং আমি কাজ করিতে না চাহিলেও ইঁহারা আমাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইবেন।

"আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, মহিলা-প্রতিষ্ঠান গড়িবার যখন আদেশ আসিবে, তখন আদেশ-পালনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগগুলিও অপ্রত্যাশিত ভাবে সন্নিহিত হইবে। বহু কুমারীর পিতা তখন স্বেচ্ছায় নিজ কন্যাকে দেশ-মাতৃকার পদপ্রান্তে বলি দিবেন, বহু সধবার স্বামী স্বেচ্ছায় নিজ জীবন-সঙ্গিনীকে সমাজ-সেবা-যজ্ঞে আহুতি দিবেন এবং স্বয়ং তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবেন, বহু

বালবিধবার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার বৈধব্য-শুভ্র জিতেন্দ্রিয় জীবনটীকে সংসারের আবর্জ্জনা-স্তূপে ব্যর্থতার হাহাকার সঞ্চয় করিতে না দিয়া নিজেরা সাগ্রহে আনিয়া দেশ, জাতি ও ধর্ম্মের সেবায় মন্দির-প্রাঙ্গণে তাঁহাকে পৌছাইয়া দিবেন। ভূমি এবং অর্থ এইভাবেই আসিবে।''

স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ

উক্ত পত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

''সুযোগ-সংগ্রহের জন্য চেষ্টা প্রয়োজন নহে, প্রয়োজন হইতেছে প্রাপ্ত সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতা-সঞ্চয়। যোগ্যতা সঞ্চিত হইলে ব্রহ্মাণ্ডের সকল সুযোগ আসিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া মরে।

''আদর্শের অনুধ্যান এই যোগ্যতা-সঞ্চয়ের অন্যতম উপায়। মহিলা-প্রতিষ্ঠান যে প্রকৃত প্রস্তাবে কি বস্তুটী হইবে, তাহার অনুচিন্তন সূক্ষ্মভাবে ভিতরে ভিতরে কাজ করিতে থাকিবে এবং উহাই পরিশেষে বহিঃকর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করিবে।

''কেমন প্রতিষ্ঠান আমরা চাই? যে প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন প্রত্যেকটী কর্ম্মের মধ্য দিয়া ত্রুটীহীন কর্ত্তব্য-পালনের শিক্ষা লাভ হয়, ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত হয়, স্বার্থবোধ সঙ্কুচিত হয়, স্নেহ, মায়া, মমতা প্রভৃতি রমণীসুলভ কোমল বৃত্তিনিচয় সাত্ত্বিক-প্রবাহে প্রধাবিত হয়, তাহাই কি আমরা চাই? যে প্রতিষ্ঠান বিদ্যার্থিনীর প্রাণে ভগবৎ-প্রেমের অফুরন্ত ফোয়ারার মুখ খুলিয়া দেয়, সকল নীচ প্রলোভন ও হীন লালসা-বন্ধন শতচ্ছিন্ন করিয়া

অবাধ উন্মুক্ত গতিতে নিত্যপবিত্রতার নিষ্কলঙ্ক পথে পাদচারণা করিবার সামর্থ্য যোগায়, তাহাই কি আমরা চাই ? যে প্রতিষ্ঠান মুমূর্ষু দেশকে বাঁচাইবার জন্য নারীর হস্তে মৃতসঞ্জীবনী-সুধার অক্ষয় ভাণ্ড স্থাপন করে, দুর্ব্বলকে বলদানের জন্য, হতাশকে আশার হিল্লোলে আন্দোলিত করিবার জন্য অমোঘ প্রেরণার বৈদ্যুতিকী শক্তিতে মণ্ডিত করে, সেই প্রতিষ্ঠানই কি আমরা চাই ? শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ত' যেন গড়িলাম, কিন্তু তাহার শিক্ষার আদর্শ হইবে কি ?

''আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি, নারীরই শক্তি অদূর-ভবিষ্যতে নর-নারী উভয়ের মুক্তির কারণ হইবে; নবজাগ্রত মহানারীর আত্মোৎসর্গের নিদারুণ মূল্যে ভারতবর্ষের যুগ-যুগ-সঞ্চিত গ্লানিরাশি বিধাতা-পুরুষ ঘুচাইয়া দিবেন। যেখানে নারীর দূর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিবারও অধিকারটুকু ছিল না, এমন সহস্র সহস্র স্থলে অদূর ভবিষ্যতে নারী সর্ব্বময় নেতৃত্বের দুর্ধার্য্য বল্গা ধারণ করিবেন, যাহা জগদ্বরেণ্য বীরবৃন্দের অকল্পনীয়, এমন কত শত অসাধ্য-সাধন নারী করিবেন। কিন্তু এই নারী কি নিজের জীবন হইতে ভাগবতী সিদ্ধিকে নির্ব্বাসিত করিবেন?

''আমার স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ তাহার বিপরীত। যাহারা স্বকীয় জীবনে সুকঠোর তপস্যার অনুশীলন করিয়া ভাগবতী সিদ্ধিরূপে সাত্ত্বিকী দয়া, সাত্ত্বিকী মায়া, সাত্ত্বিকী মমতা ও সাত্ত্বিক স্নেহ লাভ করিয়াছেন, নিজের ইচ্ছাকে যাঁহারা ভাগবতী ইচ্ছার সহিত অভিন্ন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাঁহারা প্রাণ ধারণ করেন ভগবানের জন্য, জীবন দান করেন ভগবানের জন্য, ভগবান্

যাঁহাদের শ্বাসের বায়ু আর হৃদয়ের স্পন্দন, তেমন তপস্বিনী মাতারাই আদর্শ স্ত্রী-শিক্ষার ধাত্রী হইবেন। যাঁহারা নিজেরা ভগবানকে উপলব্ধি করিবার সঙ্গে নিজ শিক্ষার্থিনীদিগকেও সেই পরম সম্ভোগের অংশ বণ্টন করিতে পারিবেন, স্ত্রী-শিক্ষার তাঁহারাই হইবেন আচার্য্যা। যে ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মানুভূতি জাগ্রত করিবে, যাহা অবসর-মুহূর্ত্তকে ব্রহ্মস্মৃতির দীপ্ত বিভায় জ্বলন্ত ও পবিত্র করিবে, সর্ব্বজীবে মৈত্রীবোধ ও সমবেদনা প্রতিষ্ঠিত করিবে, বহিরাচারের সহস্র নিরর্থক অভিনয় হইতে মুক্ত সেই উপলব্ধি-স্নিগ্ধ সত্যধর্ম্ম হইবে স্ত্রী-শিক্ষার মূল। যে স্বাস্থ্য-নীতি নারীর প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বলবীর্য্য, দৃঢ়তা, শক্তিমত্তা ও লাবণ্য সঞ্চারিত করে, যে দৈহিক চর্চ্চা তাহাকে সৈনিকের মত ঘাত-সহিষ্ণু, শ্রমিকদের মত কষ্ট-সহিষ্ণু এবং সিংহিনীর মত আত্মরক্ষণে পটু করে, তাহা হইবে স্ত্রী-শিক্ষার কাণ্ড। এই মূল ও কাণ্ডের উপরে দাঁড়াইয়া স্ত্রী-শিক্ষার অপরাপর শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হইবে।

"ভারতবর্ষের স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন চলিতেছে আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া কিন্তু সত্য আদর্শকে জাতির সমক্ষে আজও ধরা হয় নাই এবং সত্য আদর্শের ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া আজও কেহ তন্ময় হয় নাই। ভারত দরিদ্র বলিয়াও নহে, পাশ্চাত্য ভোগমূলক সভ্যতার প্রচণ্ড শোষণ ও দৃষ্টান্ত জাতিকে ব্যাপকভাবে স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াও নহে,—স্ত্রী-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ যোগীর ধ্যানগম্য হইতেছে না, ইহাই ভারতব্যাপী আদর্শ মহিলা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার যথার্থ বিঘ্ন।"

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৫

বাঁধ খনন

আগামী ১১ই ফাল্গুন আশ্রমের বার্ষিক সভার দিন স্থির হইয়াছে। আশ্রমের চতুর্দ্দশ জন বিদ্যার্থী এবং কর্ম্মীরা বিগত মাঘ মাসের প্রথম হইতেই প্রাণপণে বাঁধ-খনন কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন।

আশ্রমের আবাসিক (Residential) বিভাগ খোলা হয় নাই, গ্রাম হইতে ছাত্রেরা আসিয়া পাঠাভ্যাসের পরে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যায়। পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দৈনিক দেড় ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাটির কাজ করে।

গোটা মাঘ মাস ভরিয়াই আশ্রম-কর্ম্মীরা প্রাতঃকালে ও বৈকালে দ্বিপ্রহরে গাতি চালাইতেছেন।

অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি এবং কর্ম্মিগণ কোনও কোনও দিন এত ক্লান্ত হইয়া পড়েন যে, একখানা পত্র আসিলে পর্য্যন্ত তাহা অনেক সময় পঠিত হয় না, উপেক্ষায় পড়িয়া থাকে।

স্বাধীনতার পথে

অদ্য এইরূপ কতকগুলি উপেক্ষিত পত্রের জবাব দিতে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে সহকর্ম্মীদের একখানা পত্র দেখাইলেন।

পত্র-লেখক এক সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণোপান্তে বসিয়া অসামান্য লোক-প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের প্রভূত কুশল আহরণ

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন মত, স্বাধীন রুচি ও স্বাধীন বুদ্ধি-বিবেচনার আলোকে তিনি বর্ত্তমানে বুঝিতেছেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণির প্রচারিত মত ও অনুসৃত পথ বহু দোষ, ত্রুটী এবং অসম্পূর্ণতায় ভরা। অতীতের অপরিশোধ্য ঋণ মনের মধ্যে কিছু কুণ্ঠার ভাব সৃষ্টি করিলেও পত্র-লেখক, সুস্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণির বাণী বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নহে বা তাহা অনুসরণ করিয়া চলা পত্র-লেখকের পক্ষে সম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রোত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন,—

"স্নেহাস্পদেষু ঃ—

*　　*　　*　　*

যে দিন তোমার মনোমত সুরে
না বাজিবে মোর বীণা,
জানিও তাহার ছিঁড়িয়াছে তার,
তাই সে নিনাদ-হীনা।

তব হৃদয়ের স্পন্দন-তালে
আমার সুরের রেশ,
নাহি যদি চলে, জানিও তাহারে
গতপ্রাণ, নিঃশেষ।

তোমার চিত্ত নাহি যদি ভরে
আমার বিত্ত দানে,
তোমার কর্ণ নাহি যদি পূরে
আমার রুদ্র তানে।

জানিও আমার যত সম্পদ
শুধুই ফক্কিকার,
জানিও আমার যত গর্জ্জন—
মূষিকের চীৎকার।

যেখানে যখন প্রাণের পূর্ণ
মিলিবে সমর্থন,
সেখানেই মাথা করিও ভূ-নত,
আত্ম-সমর্পণ;

*　　*　　*

"বড় বড় লোক *, বড় বড় নাম,
বড় বড় মহারথী,
থাকুন তাঁহারা নিজ নিজ পথে,
চেয়ো না তাঁদের প্রতি।

কে কোথায় করে নীরব সাধনা,
কেবা করে কোলাহল,—
চাহিও না তুমি সে সবার পানে,
হইও না চঞ্চল।

কোন্‌টী তোমার নিজের পন্থা
করহ আবিষ্কার,
নিজে শতবার দেখিয়া প্রমাণ,
কর পরীক্ষা তার।

---

* অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

নিজে ভাঙ্গ-গড় নিজ ভুজবলে
নিজের ভবিষ্যৎ,
নিজে লহ বুঝে ভাল ও মন্দ,
শুভাশুভ, সদসৎ।

পরের মুখের ঝাল খেতে আর
ক'রো না আকিঞ্চন,
নিজের যুক্তি নিজের অধীন
রাখহ অনুক্ষণ।

"তোমারো ভিতরে বিরাজেন সেই
পরম-ব্রহ্ম হরি,
তাঁহারে জানিয়া অন্তরতম
সজোরে চালাও তরী।

কত তরঙ্গ, বিরুদ্ধ স্রোত
করিবে আস্ফালন,
তুচ্ছ করিয়া দ্বিগুণিত তেজে
করহ নৌ-চালন।

কত নিষ্ফল ক্রোধ গর্জ্জিবে,
কত মায়া-ক্রন্দন,
ফিরাতে চাহিবে, থামাতে চাহিবে
করিবারে বন্ধন।

সকল বিঘ্ন পদতলে দলি'
হও রে অগ্রসর,

বিবেকের সাথে কর বন্ধুতা
বাঁধ তার করে কর।

আমারে মানিতে তোমার আপন
সত্তারে দিবে বলি
হৃদয় নিরোধি'? হৃদয়-বিরোধী
সে কথা কেমনে বলি?

আপনার মতে আপনার পথে
মৃত্যুও মহা সুখ;
যে পথে শান্তি, সে পথেই লভ
অমল হাস্যমুখ।

শুভার্থী—
—স্বরূপানন্দ"

জনৈক ব্রহ্মচারী কবিতায় লেখা পত্রখানা পড়িয়া বলিলেন,—যার কাছে লেখা হ'ল, সে বুঝবে পত্র-লেখক কেমন ব্যক্তি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এর আবার বোঝাবুঝি কিরে? তোদের স্বাধীনতা দিয়েই তোদের সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক। এটা ত' অতি সরল কথা।

অপর এক ব্রহ্মচারী বলিলেন,—পত্র-পাঠক যদি গ্রাম্য নির্ব্বোধ ব্যক্তি হন, তাহ'লে তিনি হয়ত উল্টো বুঝবেন যে, যুদ্ধে তিনিই জিতে গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যিনি যাই বুঝুন বা ভাবুন, কারো পথের আমি বাধা হ'তে পারি না। আমি গুরু, তাই আমি

স্বাধীনতা-দাতা। কারো স্বাধীন-বিকাশের বিঘ্ন হ'য়ে আমি লঘু হ'তে কেন যাব ?

সত্যিকারের মানুষ

এক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু এই স্বাধীনতার ফলে যদি তার সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বনাশ কি আর হবে! স্বাধীনতায় কারো সর্ব্বনাশ হয় না, সর্ব্বনাশ হয় অহমিকায়। অহঙ্কারের ঔদ্ধত্য বর্জ্জন ক'রে যদি কেউ ভিন্ন মতে ভিন্ন পথেও চলে, তবু সে আমার একান্ত প্রিয়। বিনয় মানুষকে সত্যের কাছে নত করে, ঔদ্ধত্য সত্যকে অসম্মান কত্তে প্ররোচনা দেয়। মনে হবে বিনীত, বিচারে হবে স্বাধীন, দৃষ্টিতে হবে অদোষদর্শী, বাক্যে হবে সংযত এবং কর্ম্মে হবে নিরলস।—এই হচ্ছে সত্যিকারের মানুষের লক্ষণ।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৫

স্বেচ্ছাসেবকের শিক্ষা

আর চারিটী দিন পরেই আশ্রমের বার্ষিক সভা। এতদুপলক্ষ্যে বহু সহস্র লোকের সমাবেশ হইবে। অতএব সমবেত জনমণ্ডলীর সম্বর্দ্ধনা ও নানা অসুবিধা নিবারণের জন্য সেবক প্রয়োজন। অথচ খাটাইবার জন্য লোকের অভাব না থাকিলেও খাটিবার লোকের দারুণ অভাব। বলা বাহুল্য, আশ্রমের কর্ম্মীরা সংখ্যায় বর্ত্তমানে মাত্র তিন, তা'ও শারীরিক অত্যন্ত রুগ্ন এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন গুরুতর কার্য্য-ভারে আবদ্ধ।

আশ্রমহিতৈষী শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয় বলিলেন,—বিভিন্ন গ্রামের লোকদের মধ্য হ'তে স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হোক্।

আশ্রমের অন্যতম হিতৈষী ও অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী হালদার বলিলেন,—তা' হ'লেই খুব চমৎকার হবে, একদল নিষ্কর্ম্মা অলস লোক এসে বুকে একটা ফুল (Badge) গুঁজে নিয়ে সকলের উপর হুকুম চালিয়ে বা যথেচ্ছাচার ক'রে বেড়াবে, আসল কাজ পথেই প'ড়ে গড়াবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথাটা বড় মন্দ বল নাই। কাজ কত্তে চাইলেই কেউ প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবক হ'তে পারে না। স্বেচ্ছাসেবকের প্রকৃত যোগ্যতা-সঞ্চয়েও যত্নবান্ হ'তে হয়। সে যোগ্যতা শিক্ষা-সাপেক্ষ।

হরিবাবু বলিলেন,—এখনই আর শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক এই জংলী দেশে পাচ্ছি কোথায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে কথাও সত্য। এক একটা অনুষ্ঠানে দেখ্‌তে পাই, স্বেচ্ছাসেবকদের ঔদ্ধত্যে মানুষের চলা ভার হ'য়ে ওঠে! দেশের লোকের সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিস্ ত' তাদের জয় কর্ ভদ্রতা দিয়ে, শিষ্টতা দিয়ে, সদ্ব্যবহার দিয়ে, প্রেম ও সেবা দিয়ে। হাত জোড় ক'রে যেখানে কাজ চলে, অনেক স্বেচ্ছাসেবক সেখানে লাঠির সদ্ব্যবহার কত্তে প্ররোচিত হয়। একটা 'ব্যাজ' বা 'ইউনিফর্ম্ম' পরা মাত্রই শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় চ'ড়ে যাওয়ার কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বেচ্ছাসেবকের ঔদ্ধত্যের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণের এই সব ঔদ্ধত্যও একেবারে অকারণ নয়। যাদের ভিতরে তারা কাজ কত্তে আসে, সেই জনসাধারণের নেই শৃঙ্খলা-জ্ঞান বা নিয়মানুবর্ত্তিতা। ব্যক্তিগত একটুখানি সুবিধার জন্য দশজনের অসুবিধা কত্তে বা নিয়ম অমান্য কত্তে জনসাধারণের লাজ আসে না। কিন্তু ওদিকে আবার স্বেচ্ছাসেবক-দল গঠন কত্তে গিয়ে আমরা আত্মসংযম, চিত্তসংযম প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ বীরভাবকেই উদ্বুদ্ধ কত্তে চেষ্টা করি। ফলে যোগস্থ অর্জ্জুন এদের আদর্শ না হ'য়ে ক্রোধ চঞ্চল ভীমসেনই এদের আদর্শ হ'য়ে দাঁড়ায়।

স্বেচ্ছাসেবকের সাত্ত্বিক সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহিষ্ণুতার সাধনাই স্বেচ্ছাসেবকের প্রথম সাধনা। তার অপরাপর সকল শক্তির বিকাশের আগে এইটীর বিকাশ চাই। গালি খেয়ে তাকে সইতে হবে, মার খেয়ে তাকে সইতে হবে। অসহিষ্ণু হবার আদেশ যতক্ষণ না সে তার নেতার কাছ থেকে পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপমানিত হ'য়ে, নির্য্যাতিত হ'য়ে অর্দ্ধমৃত হ'য়ে বা বিগতপ্রাণ হ'য়েও তার সহিষ্ণুতা টল্‌বে না,—এই সাধনাই হচ্ছে যথার্থ স্বেচ্ছাসেবকের প্রধান সাধনা। কর্ম্মপটুত্ব বৃদ্ধির জন্যে সৈনিকের মত বা তার চাইতেও অধিকতর শারীরিক শিক্ষা তাকে গ্রহণ কত্তে হবে সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ নিষ্পাপ মন নিয়ে সর্ব্বাগ্রে সে শিখ্‌বে সহ্য করার বিদ্যা। নইলে খাতায় নাম লেখালে বা ব্যাজ পরলে কিম্বা ''দাদার

জয়'' বলে উচ্চরবে চীৎকার কর্ল্লেই কেউ সত্যিকারের স্বেচ্ছাসেবক হ'তে পারে না।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
?............ফাল্গুন, ১৩৩৫

কর্ম্মি-গঠক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশের মধ্যে নানা প্রকার সৎপ্রতিষ্ঠান রয়েছেন এবং প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠান দেশকে প্রচুর সেবাও দিচ্ছেন। কিন্তু কর্ম্মি-গঠনের প্রতিষ্ঠানেরই খুব অভাব। এই জন্য অগঠিত কর্ম্মীরাই পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠান খুলছেন এবং মোটামুটি রকম যেমন তেমন একটা গঠন পেলেও তাঁরা দেশের যতখানি সেবা কত্তে পাত্তেন, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও তাঁরা কেউ তার সিকি, কেউ পাঁচ ভাগের এক ভাগ, কেউ দ্বাদশাংশ কাজও ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছেন না। কর্ম্মি-গঠনের প্রতিষ্ঠান থাক্‌লে এঁদের দ্বারা দেশের কাজ অনেক গুণ বেশী হ'তে পাত্ত।

কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান বনাম কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান আর কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠানকে পরস্পর থেকে পৃথক্ বুঝতে হবে। সুগঠিত, সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ কর্ম্মীরা এসে যে প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা কর্ব্বেন, তাকে বলা যায় কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অগঠিত, অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ কর্ম্মেচ্ছু ছেলে-মেয়েরা যে প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঠন, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে

জীব-সেবার যোগ্য হবে, তাকে বলা হয় কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান। কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, অসাম্প্রদায়িক যা-ইচ্ছা তাই হ'তে পারে। কিন্তু সত্যিকার কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠানকে সহস্র রাজনৈতিক উৎপীড়নের মধ্যেও অরাজনৈতিক এবং সহস্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মধ্যেও অসাম্প্রদায়িক থাক্‌তে হবে। রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করা হয়ত কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের ব্রত হ'লেও বা হ'তে পারে কিন্তু কর্ম্মীগড়া যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, বেয়োনেটের খোঁচাও যদি সইতে হয়, তবু তাকে অহিংস এবং অরাজনৈতিক থাক্‌তে হবে। সম্প্রদায়-বিশেষের তামসিক অত্যাচার রাজসিক উপায়ের দ্বারা নিবারণের চেষ্টা করা হয়ত কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের সুনির্ব্বাচিত পন্থা হ'তে পারে, কিন্তু কর্ম্মী-গড়া যে প্রতিষ্ঠানের ব্রত, তাকে অটল সহিষ্ণুতা সহকারে বাইরের সহস্র উৎপাতকে অগ্রাহ্য কত্তে হবে। লোকে একে কাপুরুষতা ব'লে ধিক্কার দিতে পারে, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতা ব'লে তিরস্কার কত্তে পারে কিন্তু কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জাতির অভ্যুদয়ের সূতিকা-গৃহ, এখানে ছোঁয়াচ মেনে চল্‌তে হবে।

প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে আর কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠানে আরো একটা দিকে বিশেষ পার্থক্য আছে। কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মের দাবী বুঝে নারী-পুরুষ একত্র মিলে দেশ ও সমাজের সেবা কত্তে পারেন, কিন্তু কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান নারী ও পুরুষের পক্ষে

পৃথক্ পৃথক্। নারীর জীবনকে গ'ড়ে তুল্‌বে যে কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান, তাতে পুরুষ সহযোগীর প্রবেশাধিকার থাক্‌বে না, পুরুষকে গ'ড়ে তুল্‌বে যে কর্ম্মি প্রতিষ্ঠান, তাতে নারী সহযোগিনীর স্থান হবে না। কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠান। অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য এখানে প্রতিপালিত হবে।

কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহ গৃহীত কর্ম্মের প্রকৃতি বুঝে প্রয়োজন-স্থলে নির্ব্বিচারে যাকে তাকে কর্ম্মী-রূপে গ্রহণ কর্ল্লেও কত্তে পারে, কিন্তু কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান যাকে তাকে শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনীরূপে কখনও গ্রহণ কত্তে পারে না। কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্ব্বসাধারণের ভিতরে ত্যাগ-বৈরাগ্যের সঞ্চারণা ঘটাবার উদ্দেশ্যে প্রচার-কর্ম্ম চালাতে পারে, তাতে দোষ হয় না, কিন্তু কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান প্রচার-কার্য্যকে (Propaganda) বিষবৎ জ্ঞান কর্ব্বে এবং স্বভাবতই যে সব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ত্যাগবৈরাগ্য উন্মেষ পেয়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষার পরে একমাত্র তাদেরই গ্রহণ কর্ব্বে।

কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর স্বাস্থ্য-সংশোধন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান সর্ব্বপ্রথম দেখ্‌বে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর মনের গতি কোন্ দিকে। মনের গতি যদি দেশ, জাতি ও জগতের সেবার অনুকূল হয়, তাহ'লেই সে

গ্রহণীয় নতুবা উপেক্ষণীয়। কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান তারপরে দেখ্‌বে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর স্বাস্থ্যের দিক্। স্বাস্থ্যে বা শোণিতে যদি কোনও দোষ থাকে, তবে অপর সকল দিক্ ফেলে রেখে সর্ব্বাগ্রে এই দিক্‌টার পূর্ণ সংশোধন ক'রে নিতে হবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও বীজাণু-বিজ্ঞান যতখানি সহায়তা দিতে পারে, অর্থ-ব্যয়ের দিকে না তাকিয়ে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার কত্তে হবে। কিন্তু তাতেও যার স্বাস্থ্য সংশোধিত হবে না, কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান তাকে বর্জ্জন কর্ব্বে।

শারীরিক সহিষ্ণুতার শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মে প্রবল-অনুরাগ-সম্পন্ন এবং সংশোধিত-স্বাস্থ্য কিশোর-কিশোরীরা কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠানে কিসের শিক্ষা গ্রহণ কর্ব্বে? ভগবৎ-প্রেমের, চরিত্র-বলের, আত্মরক্ষার, আততায়ী-শাসনের এবং সর্ব্ববিধ ব্যবহারিক বিদ্যার। আরো একটা শিক্ষা তাদের গ্রহণ কত্তে হবে, যেটা স্পার্টায় প্রচলিত ছিল। সেটা হচ্ছে দুঃখ সহ্য করার শিক্ষা। দশ ঘা লাঠি খেয়েও যে টাল খেয়ে পড়্‌বে না, তেমন মানুষ তৈরী হওয়া চাই। এক সময়ে আমি একটী ছেলেকে পড়াতুম। অতি কোমল-প্রকৃতি ছেলে, শরীরও বড় কোমল, হাল্কা, দুর্ব্বল। বল্লুম,—''তোকে আমি মার্‌তে আরম্ভ কর্ব্ব, যাই বল্‌বি—'আর পারি না'—অমনি মার বন্ধ কর্ব্ব।'' সে বল্লে,—''আচ্ছা''। পিঠের উপরে চট্‌পট্ চড় পড়্‌তে আরম্ভ হ'ল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পিঠের উপর রক্তের চাপ জম্‌তে আরম্ভ কর্ল্ল, আমার ভারী

প্রাণে লাগ্‌ল। বল্লুম,—''বল্, পারি না।'' সে কিন্তু চুপ্ ক'রেই রইল। চড়ও পড়তেই লাগ্‌ল। চ'খ দিয়ে তার টস্ টস্ ক'রে জল পড়্‌ছে, সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে গেছে, যন্ত্রণায় আপাদমস্তক কাঁপ্‌ছে। আমি অনুনয় বিনয় আরম্ভ কর্ল্লুম, ''বল্ বাবা, —'আর পারি না,' অম্‌নি আমি থাম্‌ছি''। কিন্তু সে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার কর্ব্বে না। শেষে অগত্যা আমাকেই হার মান্‌তে হ'ল। অতটুকু একটা রোগা ছেলের এই আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা দেখে মনে মনে তাকে প্রণাম কর্ল্লুম, তাকে গুরু ব'লে স্বীকার কর্ল্লুম এবং সঙ্কল্প কর্ল্লুম, এ রকম সহিষ্ণুতা লাভকে শিক্ষার একটা বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। ছেলেমেয়েদের শরীরের প্রত্যেকটা পেশীকে এমন ভাবে সুনির্ম্মিত ক'রে তুলতে হবে, যেন আঘাতের পর আঘাত এসে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যায়। আর, মনকে এমন ভাবে গঠন দিতে হবে যেন, একটা হাত তলোয়ার দিয়ে কেটে নিলেও অপর হাতের কাজ হাসিমুখে চল্‌তে পারে।

কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠানের আহারীয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠানের আহারীয় হওয়া উচিত শরীরের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির বর্দ্ধনোপযোগী। আহারীয় পুষ্টিকর হবে কিন্তু হবে বিলাস-বাহুল্য-বর্জ্জিত। আহারীয় পরিমিত হবে কিন্তু দেহকে প্রবল-কর্ম্মশক্তি-সম্পন্ন রাখ্‌বার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার চাইতে কম নয়। কিন্তু শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদিগকে দুর্ভিক্ষের দিনে আত্মরক্ষার শিক্ষায়ও অভ্যস্ত কত্তে হবে। কি

ক'রে শুধু জল পান ক'রে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত বেঁচে থাকা যায়, প্রত্যেককে দু-চার বৎসর একবার ক'রে তা' নিজের উপরে পরীক্ষা কত্তে হবে।

আকস্মিক বিপদের জন্য শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যত প্রকার আকস্মিক বিপদ মানুষের হ'তে পারে, তার জন্য পূর্ব্ব থেকেই সহিষ্ণুতার শিক্ষা এদের দিতে হবে। নৌকাডুবি হ'লে চব্বিশ ঘণ্টা বিনা বিশ্রামে সাঁতার কাটা, বিনা বিশ্রামে শতাধিক মাইল পর্য্যটন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কঠোরতার শিক্ষাকে এদের জীবনে মূর্ত্তিমতী ক'রে তুল্‌তে হবে।

মানসিক দুঃখ-সহনের শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানসিক বিপদের জন্যও আত্ম-গঠনের শিক্ষা চাই। এখনি যদি একদল আফ্রিদি ডাকাত এসে আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়, আর, আমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য পাহাড়ের জনমানবহীন অন্ধকার গুহার মধ্যে ছয় মাস কি এক বছর বন্দী ক'রে রেখে দেয়, তাহ'লে আমি যাতে দুশ্চিন্তায় উন্মাদ রোগাক্রান্ত না হ'য়ে যাই, তার জন্য যথেষ্ট মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কত লোক বড় বড় আশায় নিরাশ হ'য়ে ভাবের বেগ সামলাতে পারে না, পাগল হ'য়ে যায়। কোনও হতাশা, কোনো অপ্রত্যাশিত প্রিয়জনবিয়োগ, কোনও চিরবিশ্বাসীর বিশ্বাস-ঘাতকতা আমার চিত্তের সহজ স্থিরতাকে যেন বিপর্য্যস্ত কত্তে না পারে, তার জন্যও যথেষ্ট মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

ভাবুকতার অভাবই সত্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির অন্তরায়

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশে যদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম গড়্‌তে হয়, তাহ'লে ঠিক্ এই রূপ কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠান চাই। কিন্তু গতানুগতিকপন্থী সমাজ-হিতৈষীরা ভাবুকতার অভাবে সত্য বস্তুর ধ্যানে অক্ষম হচ্ছেন। ধ্যানও জম্‌ছে না, সত্য বস্তুর আবির্ভাবও হচ্ছে না।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩৫

দুঃখই মনুষ্যত্বের পরীক্ষক

রাত্রি দুই ঘণ্টা থাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি এবং দুইজন ব্রহ্মচারী গাতি লইয়া কাজ করিতেছেন। মাটি চোটাইতে চোটাইতে মাঝে মাঝে পাথর ঠেকিতেছে এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কোন্‌টা মাটী আর কোন্‌টা পাথর, তা' আঘাত না দিলে বুঝা যায় না। মোটের উপর, দুঃখই মনুষ্যত্বের পরীক্ষক।

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৫

হায় রে জল

শেষ রাত্রিতে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি এবং আশ্রমের কর্ম্মীরা বাঁধ (পুকুর) খুঁড়িতে আরম্ভ করেন, বেলা ছয়টায় ছাত্রেরা নিজ

নিজ গ্রাম হইতে আসিয়া গাতি-কোদাল ধরিলে প্রতিনিবৃত্ত হন। শ্রীশ্রীবাবামণি ছাত্রদের নেতৃত্ব করিতে থাকেন, ইত্যবসরে কর্ম্মি-ব্রহ্মচারীরা জোড়ে (ফল্গু ঝরণায়) যাইয়া বালি সরাইয়া চুয়া খুঁড়িয়া স্নান করেন, সেখানেই ধ্যান জপাদি সারেন এবং প্রায় আটটায় আশ্রম কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পড়ার ঘণ্টা দেন। তখন রৌদ্রও অত্যন্ত চড়িয়া যায় বলিয়া বাঁধের কার্য্য স্থগিত থাকে।

সমগ্র গ্রীষ্মকালেরই জন্য বাঁধ কাটার এই নিয়ম করা হইয়াছে। অবশ্য, সূর্য্যাস্তের পরেও লণ্ঠন জ্বালিয়া প্রায়ই বাঁধের কার্য্য করা হয় বটে কিন্তু সেই সময়ে ছাত্রদিগকে গ্রাম হইতে আর আসিতে হয় না, শ্রীশ্রীবাবামণি এবং সহকর্ম্মী ব্রহ্মচারীরাই রাত্রে কাজ করেন।

অদ্য ছাত্রেরা আসিয়া পৌছিতেই কর্ম্মীরা স্নানার্থ জোড়ে চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি অত্যন্ত পিপাসিত বলিয়া একজন কর্ম্মীর উপর আদেশ দেওয়া হইল, এক বাল্‌তি পানীয় জল দ্রুত পাঠাইতে।

ছাত্রেরা আসিয়া মিনিট পনের কাজ করিয়াই পিপাসায় অধীর হইয়া পড়িল। ছোটনাগপুরের গ্রীষ্ম যে আস্বাদন ক'রে নাই, সে তার তীব্রতা কল্পনাও করিতে পারে না। ছাত্রদের সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইল। দুইটী ছেলেকে পুনরায় জল আনিতে পাঠান হইল।

বাঁধের কাজ চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি সমক্ষে দাঁড়াইয়া থাকিলে কাজ ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, এমন ছেলে

মিলা ভার। কিন্তু পুনরায় ছাত্রেরা পিপাসায় অস্থিরতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। আবার দুইটী ছেলেকে জলের জন্য পাঠান হইল।

কিন্তু জোড় খুব নিকটে নহে। যাইতে আসিতে অনেকটা পথ। সুতরাং জল আসিতে দেরী হইতে লাগিল। এবার ছাত্রেরা হাতের গাতি-কোদাল ফেলিয়া অবসন্ন শরীরে পলাশ-গাছের ছায়ায় বসিল। পুনরায় দুইটী ছেলেকে "জল্‌কে" পাঠান হইল।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত বরদা এক বাল্‌তি জল লইয়া উপস্থিত হইতেই ছাত্রেরা কাড়াকাড়ি করিয়া সকল জল নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। শ্রীযুক্ত বরদা শ্রীশ্রীবাবামণিকে পিপাসিত জানিয়া জল রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেও পারিলেন না। বিশেষতঃ ছাত্রেরা জানিত না যে, শ্রীশ্রীবাবামণি পিপাসিত আছেন।

শ্রীযুক্ত বরদা অপরাধীর মত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—আবার জল নিয়ে আসি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জলের জন্য আরো বাল্‌তি গিয়েছে।

তবু শ্রীযুক্ত বরদা জোড়ের দিকেই চলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঐ দিকে কি'রে ?

শ্রীযুক্ত বরদা বলিলেন,—রান্নার জল আন্‌তে হবে।

কিছুক্ষণ পরে জোড় হইতে দ্বিতীয় বাল্‌তি জল আসিয়া পৌছিল। অনির্ব্বাপিত-তৃষ্ণাগ্নি বালকের দল কটাক্ষের মধ্যে এই বাল্‌তিটীও শেষ করিল। কেহ কেহ পুনরায় গিয়া বাঁধের কার্য্য আরম্ভ করিল।

অল্পকাল পরে জোড় হইতে তৃতীয় বাল্‌তি জল আসিয়া পৌছিল। এই বাল্‌তিও নিমেষে নিঃশেষিত হইল। কিন্তু বাঁধের কাজ এইবার খুব জোরের সহিত চলিতে লাগিল।

শেষ বাল্‌তির জল একটু দেরীতে আসিয়া পৌছিল। ইতিমধ্যে ছেলেরা পুনরায় পিপাসিত হইয়াছে। কিন্তু তবু একটী ছেলে জল আসিবামাত্রই শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কি জল খাবেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি সকলের তৃষ্ণার্ত্ত মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন,—না।

অল্পকাল পরে পড়ার ঘণ্টা পড়িল। ছাত্রদের মাটীর কার্য্য বন্ধ হইল। কোমরে বাঁধা গামছাখানা মাথায় বাঁধিয়া লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি জোড়ের দিকে চলিলেন,—

তৃষ্ণায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি ছুটিতেছেন। পাথরের ঠোক্কর লাগিয়া পায়ের একটা অঙ্গুলি চিরিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

জোড়ে পৌছিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি একটা চুয়াতে টল্‌টলে সুপরিষ্কৃত জল দেখিয়া পান করিবার জন্য অঞ্জলি ভরিয়া লইলেন। কিন্তু মুখে দিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই পার্শ্বে দৃষ্টি পড়িল। এই মাত্র এক গোপ-নন্দন বনে মহিষ চরাইতে চরাইতে মলবেগগ্রস্ততা-হেতু সন্নিকটেই পুরীষোৎসর্গ করিয়া এই চুয়াটীতে শৌচ সমাধাপূর্ব্বক বস্ত্র পরিধান করিতেছে।

জল আর পান করা হইল না। কিছুক্ষণ অবসন্নের ন্যায় আর্দ্র বালুকা-বিস্তারের উপর শুইয়া থাকিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নূতন চুয়া খুঁড়িতে লাগিলেন। হার রে জল ?

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১৭ই চৈত্র, ১৩৩৫

প্রতিষ্ঠানের পরিচয়

বিদেশাগত জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন,—কোনও প্রতিষ্ঠান যে সত্যই সমাজের হিতসাধন কচ্ছে, তার প্রমাণ কোথায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রতিষ্ঠানের সার্থকতার প্রমাণ সব সময়ে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে পাওয়া যায় না। প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে যে মানুষগুলি এসেছে, প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যে মানুষগুলি নিজেদের জীবন-গঠন করেছে, তারা পরবর্ত্তী জীবনে কে কি কচ্ছে, তার বিচারের ফলাফলের উপরে প্রতিষ্ঠানের সার্থকতার প্রমাণ নির্ভর করে। হয়ত খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পৃথিবী-জোড়া যশঃসম্বর্দ্ধনার মধ্য দিয়ে এক প্রতিষ্ঠান গড়েছি, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান থেকে জীবন গ'ড়ে যারা বেরিয়ে গেল, তারা ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসন, আত্মসুখের সেবা নিয়েই প্রমত্ত রইল। বাইরে হয়ত বড় বড় কথা খুবই বল্‌ল, কাব্য, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা-গবেষণাও কর্ল্ল, কিন্তু নিজেদের জ্ঞানের শক্তিকে নিজেদের ভিতরে স্বার্থপরতার অন্ধকার দূর করার কাজেও যেমন প্রয়োগ কর্ল্ল না, তেমন আবার লক্ষ লক্ষ অজ্ঞানীর অজ্ঞান-নাশেও প্রয়োগ কত্তে চেষ্টা কর্ল্ল না। এরূপ ক্ষেত্রে একটা গণ্ডমূর্খও স্বীকার কত্তে ইতস্ততঃ কর্ব্বে যে, এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমাজের উল্লেখযোগ্য কোনও হিতসাধন হয়েছে। যে হয়ত হাংলা বাংলাতে প্রেমপত্র লিখ্‌ত, সে আমার প্রতিষ্ঠানে এসে দান্তে, গেটে, বাইরণের

ভাব-ভাষার মাধুর্য্য দিয়ে প্রেমপত্র লিখ্‌তে শিখে গেল,—এটাকে সমাজের হিতবর্দ্ধন বলা চল্‌বে না। যে হয়ত অতি রুষ্ট রুক্ষ ভাষায় ক্ষুধাতুর পথচারী অনাহার-ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দিত, সে হয়ত সে স্থলে মিষ্টি কথায় তাকে বিদায় দিতে শিখে গেল, কিন্তু গৃহে গিয়ে প্রত্যেকে এক মুষ্টি ক'রে কম খেয়ে পরিবারস্থ সবাইকে নিয়ে নিরন্ন নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের জন্য একটু ত্যাগ-স্বীকারের সামর্থ্য দেখাল না,—এটাকে সমাজের হিতবর্দ্ধন বলা চল্‌বে না। তলোয়ার যখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-পক্ষকে কচু-কাটা করে, তখন অবশ্য পরিচয় হয় যে, কেমন কারখানায় এ ইস্পাত তৈরী হয়েছিল। সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক একটা ইস্পাত-কারখানা বলা চলে। আমার কারখানা থেকে বেরিয়ে গিয়ে যদি সেই ইস্পাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট, পাথর আর কাঠের সঙ্গে সংঘর্ষেই বেঁকে যায়, ভেঙ্গে যায়, তবে আমার কারখানার সুনাম বৃদ্ধি কি ক'রে হবে?

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৩০শে চৈত্র, ১৩৩৫

অভিক্ষা

অদ্য ঝরিয়া হইতে কতিপয় ভদ্রলোক আশ্রম দর্শন করিতে আসিয়াছেন। একজন ঝরিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক। তিনি আশ্রমের জীর্ণ কুটীরখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই ঘরেই কি আপনাদের বর্ষা কেটেছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন।

শিক্ষক মহাশয় বলিলেন,—লোকে তরুতলে বাসের কথা বলে। এই কুটীরে বাসের চেয়ে গাছতলায় বাস অনেক ভাল।

শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় হাসিলেন।

অনেক কথাবার্ত্তাই হইল। শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—অভিক্ষা দ্বারা কি দেশের খুব বেশী সেবা সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হঠপন্থীর পক্ষে অসম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু ধীরপন্থীর পক্ষে সম্ভব।

শিক্ষক।—কিন্তু সব কাজেই টাকার দরকার।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—টাকা আস্‌বে আকাশ দিয়ে উড়ে, শ্রাবণের ধারার মত সে ঝম্‌ঝম্ ক'রে নামবে। শুধু প্রতীক্ষার প্রয়োজন। অর্থের অভাবকে আমি অভাব ব'লেই মনে করি না। সঙ্কল্পটা যদি শুদ্ধ হয়, তা' হ'লে স্বয়ং কুবের এসে টাকার থলি গছিয়ে দিয়ে যাবে। দেশের কর্ম্মীরা এতদিন ধনীর দুয়ারে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাকে জবাই ক'রে এসেছিলেন, অভিক্ষায় আরম্ভ হবে তারই প্রতিবাদ। নবযুগের কর্ম্মসাধকের দৃষ্টি থাকবে ধনীর পকেটে নয়, নিজের বাহুযুগের উপরে। সঙ্কল্পের শুদ্ধতার মহিমায় বাহুবলের মধ্যে দৈববলকে জাগিয়ে তোলাই অভিক্ষুর সাধনা।

সহরে প্রতিষ্ঠিত অভিক্ষু প্রতিষ্ঠান

শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু প্রতিষ্ঠান যদি সহর অঞ্চলে হয়, তাহ'লে তাকে কি ভাবে ভিক্ষা ছাড়া পরিচালনা করা যাবে? সহরে ত' জমি মিল্‌বে না যে, বিস্তীর্ণ কৃষি ক'রে তার উপরে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতদিন না পল্লীগ্রামে প্রতিষ্ঠিত অভিক্ষু আশ্রমগুলি নিজেদের মধ্যে থেকে অংশ তুলে সহরস্থ আশ্রমের ব্যয় সঙ্কুলান কর্ত্তে পার্ব্বে, ততদিন সহরে আশ্রম হবার প্রয়োজন কি? অবশ্য, সহরের আশ্রম যদি পল্লীগ্রামের আশ্রম থেকে অংশ দাবী ক'রে বেঁচে থাক্‌তে চায়, তাহ'লে সেগুলি পরগাছার সামিল হবে, তাতে অভিক্ষার মর্য্যাদা-নাশ ঘট্‌বে। তাই সহরের আশ্রমগুলিকে এমন কর্ম্মপদ্ধতি বেছে নিতে হবে, যেন বেঁচে থাকবার অর্থের বিনিময়ে তারা আবার পল্লী প্রতিষ্ঠানগুলির বাঁচবার উপাদান খুব বেশী পরিমাণে যোগাতে পারে।

দেশব্যাপী অন্ন-সমস্যার সমাধানে সহযোগ

শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই পদ্ধতিটী কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেই পদ্ধতিটী হবে সমগ্র দেশের নিখিল অর্থ-সমস্যার সমাধান-চেষ্টার সাথে সহযোগ স্থাপন। দেশে যেখানে যে ভাবে সমগ্র সমাজব্যাপী দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান-কল্পে যে কোনও চেষ্টা হচ্ছে, সেই চেষ্টাটীর ভিতরেই এ প্রতিষ্ঠান কি ভাবে বল-সঞ্চার কত্তে পারে, তদ্বিষয়ে উপায়-উদ্ভাবন। অর্থকে অনর্থ ভেবে পরিহার করার যে বৈরাগ্যমূলক উপদেশ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা প্রদান ক'রে এসেছেন, তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে মনকে পরমার্থ পথের পথিক রেখেই নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে আর্থিক সমস্যার গহনারণ্যে প্রবেশ করা।

শিক্ষক বলিলেন,—এখানে ত মাত্র জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা সুরু হয়েছে। এত সব কাজ কবে হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কালো হ্যয়ং নিরবধিঃ, বিপুলা চ পৃথ্বী। কোনও কালে হবে, কোনও স্থানে হবে। হতাশ হবার কিছু নেই।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১লা বৈশাখ, ১৩৩৬

আশ্রম কাহাকে কহে?

অদ্য দ্বিপ্রহরে সহকর্ম্মীদের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—যেখানে এসে তাপদগ্ধ জীব প্রাণের প্রণষ্ট-শান্তি ফিরে পায়, যেখানে এসে স্বজন-পরিত্যক্ত মানব আপনার-জনদের স্পর্শ পায়, যেখানে এলে সকল শ্রমের অপনোদন হয়, সকল বিরক্তির অবসান ঘটে, সকল দুঃখ পালিয়ে যায়, তাকেই বলে আশ্রম। নইলে, একদল লোক গেরুয়া প'রে কুটীর বেঁধে বাস কর্ল্লেই সেটা আশ্রম হয় না। গার্হস্থ্য আশ্রমও আশ্রম, কিন্তু গৃহী যতক্ষণ না দীনের দুঃখ নিবারণ কর্ব্বার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাচ্ছে, ব্যথিতের ব্যথা ঘুচাতে চেষ্টা পাচ্ছে, তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা আর ক্ষুধিতের ক্ষুধা দূর কত্তে চেষ্টা পাচ্ছে, ততক্ষণ ওটা অনাশ্রম। গৈরিকধারীদের আশ্রম গড়ার দায়িত্ব আরও বেশী। মানুষের ভিতরের প্রচ্ছন্ন অকল্যাণকে উৎখাত ক'রে দেবার ক্ষমতা যার যত বেশী, আশ্রম-গড়ার চেষ্টা তার পক্ষে তত সার্থক। কিন্তু সব চেয়ে সেরা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতদিন না পল্লীগ্রামে প্রতিষ্ঠিত অভিক্ষু আশ্রমগুলি নিজেদের মধ্যে থেকে অংশ তুলে সহরস্থ আশ্রমের ব্যয় সঙ্কুলান কর্ত্তে পার্ব্বে, ততদিন সহরে আশ্রম হবার প্রয়োজন কি? অবশ্য, সহরের আশ্রম যদি পল্লীগ্রামের আশ্রম থেকে অংশ দাবী ক'রে বেঁচে থাক্‌তে চায়, তাহ'লে সেগুলি পরগাছার সামিল হবে, তাতে অভিক্ষার মর্য্যাদা-নাশ ঘট্‌বে। তাই সহরের আশ্রমগুলিকে এমন কর্ম্মপদ্ধতি বেছে নিতে হবে, যেন বেঁচে থাকবার অর্থের বিনিময়ে তারা আবার পল্লী প্রতিষ্ঠানগুলির বাঁচবার উপাদান খুব বেশী পরিমাণে যোগাতে পারে।

দেশব্যাপী অন্ন-সমস্যার সমাধানে সহযোগ

শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই পদ্ধতিটী কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেই পদ্ধতিটী হবে সমগ্র দেশের নিখিল অর্থ-সমস্যার সমাধান-চেষ্টার সাথে সহযোগ স্থাপন। দেশে যেখানে যে ভাবে সমগ্র সমাজব্যাপী দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান-কল্পে যে কোনও চেষ্টা হচ্ছে, সেই চেষ্টাটীর ভিতরেই এ প্রতিষ্ঠান কি ভাবে বল-সঞ্চার কর্ত্তে পারে, তদ্বিষয়ে উপায়-উদ্ভাবন। অর্থকে অনর্থ ভেবে পরিহার করার যে বৈরাগ্যমূলক উপদেশ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা প্রদান ক'রে এসেছেন, তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে মনকে পরমার্থ পথের পথিক রেখেই নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে আর্থিক সমস্যার গহনারণ্যে প্রবেশ করা।

শিক্ষক বলিলেন,—এখানে ত মাত্র জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা সুরু হয়েছে। এত সব কাজ কবে হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কালো হ্যয়ং নিরবধিঃ, বিপুলা চ পৃথ্বী। কোনও কালে হবে, কোনও স্থানে হবে। হতাশ হবার কিছু নেই।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১লা বৈশাখ, ১৩৩৬

আশ্রম কাহাকে কহে?

অদ্য দ্বিপ্রহরে সহকর্ম্মীদের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—যেখানে এসে তাপদগ্ধ জীব প্রাণের প্রণষ্ট-শান্তি ফিরে পায়, যেখানে এসে স্বজন-পরিত্যক্ত মানব আপনার-জনদের স্পর্শ পায়, যেখানে এলে সকল শ্রমের অপনোদন হয়, সকল বিরক্তির অবসান ঘটে, সকল দুঃখ পালিয়ে যায়, তাকেই বলে আশ্রম। নইলে, একদল লোক গেরুয়া প'রে কুটীর বেঁধে বাস কর্লেই সেটা আশ্রম হয় না। গার্হস্থ্য আশ্রমও আশ্রম, কিন্তু গৃহী যতক্ষণ না দীনের দুঃখ নিবারণ কর্ব্বার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাচ্ছে, ব্যথিতের ব্যথা ঘুচাতে চেষ্টা পাচ্ছে, তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা আর ক্ষুধিতের ক্ষুধা দূর কর্ত্তে চেষ্টা পাচ্ছে, ততক্ষণ ওটা অনাশ্রম। গৈরিকধারীদের আশ্রম গড়ার দায়িত্ব আরও বেশী। মানুষের ভিতরের প্রচ্ছন্ন অকল্যাণকে উৎখাত ক'রে দেবার ক্ষমতা যার যত বেশী, আশ্রম-গড়ার চেষ্টা তার পক্ষে তত সার্থক। কিন্তু সব চেয়ে সেরা

আশ্রম হচ্ছে সাধকের সাধন-প্রশান্ত স্নিগ্ধ মন, যার সংস্পর্শে এলে কঠোর হৃদয়ও গ'লে পড়ে, কঠিন প্রাণেও কোমলতা আসে, সেই মনটা নিয়ে গাছতলায় প'ড়ে থাক, গাছতলাই আশ্রম, হাটে-বাজারে প'ড়ে থাক, হাট-বাজারই আশ্রম, নিভৃত পর্ব্বত-গুহায় প'ড়ে থাক, পর্ব্বত-গুহাই আশ্রম, আর সেই মনটা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই কর, কামান দাগ, বন্দুক ছোড়, তলোয়ার চালাও, যা' প্রয়োজন তাই কর, কিন্তু মনের গুণে সেই স্থানই আশ্রম। ''আশ্রম'' ''আশ্রম'' ক'রে চেঁচালে কি হবে বাপধন, আশ্রয় দেবার ক্ষমতাটা ত' আগে হ'ক্, তার পরে হবে আশ্রম।

গার্হস্থ্যাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমে পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৃহীর আশ্রমের আর সন্ন্যাসীর আশ্রমে তফাৎ সামান্য। উভয় আশ্রমই পবিত্রতার আগার-স্বরূপ হওয়া চাই, উভয়ত্রই শান্তি, তপস্যা, জ্ঞানচর্চ্চা বিরাজমান থাকা চাই, উভয় আশ্রমই জীবের কল্যাণ-উদ্দেশ্যে স্থাপিত হওয়া চাই। নিজ নিজ আশ্রমে গৃহী গৃহীর যোগ্য সদাচার ও সংযম রক্ষা ক'রে চল্‌বে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর যোগ্য সদাচার ও সংযম রক্ষা ক'রে চল্‌বে। একজনের পক্ষে বৈধভাবে যেটা সদাচার ও সংযম, অপরজনের পক্ষে সেটা বৈধভাবেই কদাচার ও অসংযম হ'তে পারে। তাই, নিজ নিজ আশ্রমে গৃহী ও সন্ন্যাসীকে নিজ নিজ আশ্রমের মর্য্যাদানুযায়ী সদাচার ও সংযম পালন কত্তে হবে, দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা সম্বন্ধে নিজ নিজ আশ্রমের বিধি রক্ষা কত্তে হবে। সকলের সঙ্গে নির্ব্বিরোধ

ভাব রক্ষার জন্যে উভয়কেই আশ্রমোচিতভাবে সচেষ্ট থাক্‌তে হবে; নিজ মানসিক শান্তি, নিঃস্পৃহতা, নির্ল্লোভতা, বিষয়-নিবৃত্তি প্রভৃতি নিজ নিজ আশ্রমের অবস্থানুরূপ ভাবে পুষ্ট কত্তে হবে। দৃষ্টান্ত যেমন, বিষয়-নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী আহার-সংগ্রহের চেষ্টায় বিরত হ'য়ে সশিষ্যে উপবাসী থেকে পরোপকার কত্তে পারেন, কিন্তু গৃহীকে অন্ততঃ শিশু, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধদের জন্য আহারীয় সংগ্রহ কত্তেই হবে, না কর্ল্লে তার ধর্ম্মহানি হবে—এইটুকু উপার্জ্জনের জন্য তার যে লোভ, তাকে নির্ল্লোভতা ব'লেই মনে কত্তে হবে। কারণ, সে গৃহী, ভগবান্ তার উপর কতকগুলি জীব-দেহের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন, এ দায়িত্ব উপেক্ষা না ক'রে তাকে সর্ব্বকর্ম্ম কত্তে হবে। শিষ্য না খেয়ে মর্‌লে, সন্ন্যাসীগুরু তার জন্য আহারীয় সংস্থানে বাধ্য নন, কিন্তু সন্তান না খেয়ে মর্ল্লে পিতা তার জন্য বাধ্য। গৃহী তাঁর পুত্র-কন্যাদের প্রাণের ক্ষুধা মিটাতে বাধ্য, তার জন্য যত কৃচ্ছ্র-সাধন প্রয়োজন, সব তাঁকে কত্তে হবে। নিজ ঔরস বা গর্ভজাত সন্তান ব্যতীত অন্য নরনারী এসেও যদি ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা জানায়, গৃহীকে তার অভাব পূরণ কত্তে হবে, চিরদিনের অভাব-পূরণ সম্ভব না হোক্, অন্ততঃ সাময়িক অভাব পূরণ কত্তেই হবে, নইলে ধর্ম্মহানি হবে। মন্ত্র-শিষ্য হোক্ আর না হোক্, যে কোনও নরনারী এসে প্রাণের ক্ষুধা, প্রাণের তৃষ্ণা জানালে, সন্ন্যাসীকে তার অভাব পূরণ ক'রে দিতে হবে, সম্পূর্ণ পূরণ না হোক্, অন্ততঃ আংশিক পূরণ কত্তেই হবে, নইলে সন্ন্যাসীর জীবসেবা হীনাঙ্গ হবে। গৃহী দেখ্‌বেন অভাবীর দেহ, সন্ন্যাসী দেখ্‌বেন অভাবীর মন-প্রাণ। গার্হস্থ্যাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমের পার্থক্য এইখানে।

গৃহী ও সন্ন্যাসীর কর্ম্ম সাধনায় ওলট-পালট

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৃহীদের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন যাঁরা লোকের মন-প্রাণের ক্ষুধা মিটাচ্ছেন। তাঁদের এই সামর্থ্য এসেছে একান্ত, একনিষ্ঠ, সুতীব্র ভগবৎ-সাধনের মধ্য দিয়ে। সাধনের ফলে সংসারে তাঁরা জনক-ঋষির মত নির্লিপ্ত হ'য়ে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় নির্ভয়ে বাস কচ্ছেন। আবার সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁরা জীবের মন-প্রাণের ক্ষুধার কথা উপেক্ষা ক'রে দেহটাকে বাঁচাবার জন্য বন্যায়, সাইক্লোনে, মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে, ''রিলিফ'' কাজ কচ্ছেন, কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, গো-জাতির উন্নতি প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে কঠোর পরিশ্রম কচ্ছেন। এঁদের মধ্যে অনেক সিদ্ধ-তপা এমন যোগি-পুরুষও আছেন, ব্রহ্মজ্ঞান যাঁদের করামলকবৎ অধিকৃত, কিন্তু তমোগুণাচ্ছন্ন গার্হস্থ্যকে আলস্যের গভীর পঙ্ক থেকে টেনে তোল্‌বার জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ-সাধনায় ব্রতী রয়েছেন।

সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতির বৈষয়িক উন্নতিমূলক কার্য্যে আত্মদানের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এর অবশ্য কারণও রয়েছে। গৃহী গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্য আত্মরক্ষায় অক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে তার এই অক্ষমতাকেই ধর্ম্ম ব'লে আত্ম-প্রবঞ্চনা কচ্ছে। এক পাল ছেলে-পিলেতে ঘর বোঝাই হ'য়ে গেছে, এদের পেট ভ'রে খেতে দেবার শক্তি নেই বা শক্তি থাক্‌লেও আলস্য-হেতু তা' প্রয়োগ করার ইচ্ছা নেই, কিম্বা ইচ্ছা থাক্‌লেও

লোক-নিন্দার ভয়ে কাজে লাগ্‌বার সাহস নেই, অথচ ভগবান্‌কে এক বিন্দু বিশ্বাস না ক'রেও মুখে তোতাপাখীর বুলি আওড়ান হচ্ছে,—''জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।'' নিজের দুর্ব্বলতাকে গৃহীরা ধর্ম্মের ভাণ ক'রে এইভাবে লুকুচ্ছে। এই জন্যই দরিদ্রের হাহাকারে ও লাঞ্ছিতা নারীর আর্ত্ত চীৎকারে হিমালয়ের গুহাবাসী ধ্যানমগ্ন যোগীদেরও বারংবার ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে। পূর্ব্বকালে রাক্ষসরা এসে মুনিঋষিদের যজ্ঞভঙ্গ কর্ত্ত। গৃহীর অক্ষমতা দুর্ব্বলের উপরে প্রবলের অত্যাচারের যে দেশব্যাপী সুযোগ ক'রে দিয়েছে, তা'তে নিত্য সহস্র সহস্র অভিসম্পাতের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সকল অভিসম্পাত রাক্ষসের মত বিকট মূর্ত্তি ধারণ ক'রে গুহা-পর্ব্বতচারী উদাসীন যোগীদের কাছে প্রতীকারপ্রার্থী হচ্ছে। তারই ফলে কত জ্ঞান-যোগী, প্রেম-যোগী কর্ম্মযোগ দিয়ে নিজ-রূপ আচ্ছাদিত ক'রে সমাজ-সেবায় অবতীর্ণ হচ্ছেন।

গুরু ও মতবাদের দাসত্ব

অন্যান্য অনেক কথার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুর ভিতরে যদি Propaganda-ism বা নির্দ্দিষ্ট একটা মত প্রচারের বুদ্ধি থাকে, তবে তাতে শিষ্যের মঙ্গল ষোল আনা হ'তে পারে না, কারণ তাতে শিষ্যের ভিতরে সহজাত সংস্কারগুলি তাদের full play (পূর্ণ বিকাশ) পায় না। অনেক গুরুর জেদ থাকে শিষ্য মাত্রকেই সন্ন্যাসী করার। অনেকের আবার জেদ থাকে সন্ন্যাসেচ্ছু শিষ্যকে জোর ক'রে গৃহী করার। অনেকের জেদ থাকে সাকার-ভক্ত শিষ্যকে যুক্তি-বলে নিরাকারবাদী করার।

অনেকের আবার জেদ থাকে নিরাকার-তত্ত্ব উপলব্ধি কত্তে সমর্থ শিষ্যকেও যেন-তেন-প্রকারেণ সাকারবাদী করার। এক একজন এক একটা মতবাদের এমন দাস হ'য়ে পড়েন যে, সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সেই মার্কামারা দাসত্বটাকে প্রসারিত ক'রে না দিতে পার্লে আর প্রাণে শান্তি পান না। এইসব গুরু, গুরু বটেন, কিন্তু সদ্গুরু নন; এঁরা জীবকে কল্যাণ দান কত্তে পারেন, কিন্তু পরম-কল্যাণ দিতে পারেন না। কেন না, পরম-কল্যাণ হয় নিজ নিজ প্রকৃতির পথে, নিগ্রহের পথে নয়।

প্রকৃতি-জয়ের উপায়—সাধন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেখানে অল্প চেষ্টায় মনকে পরিবর্ত্তিত করা যায়, বুঝতে হবে, পরিবর্ত্তন সেখানে প্রকৃতির খুব প্রতিকূল নয়। কিন্তু যেখানে মনকে পরিবর্ত্তিত কত্তে গিয়ে জবরদস্তি চালাতে হবে, বুঝতে হবে, সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে গোঁয়ারতুমির লড়াই হচ্ছে। এই লড়াই যোগ নয়। কারণ, যোগ কর্ম্মের কৌশল। বিনা বাধায় বা অতি অল্প বাধায় গুরুতর বলসাধ্য কাজকে হাসিল করাই হচ্ছে কৌশল। আধ্যাত্মিক পথে সব চাইতে বড় কৌশল হ'ল প্রকৃতির পথে চলা, প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়। যেখানে প্রকৃতি অশুভের সহিত প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ, সেখানে নিজের প্রকৃতিকে তার অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তিত ক'রে নিতে হয়। সেই উপায় হচ্ছে সাধন। সাধনের বলে ক্রমশঃ মানুষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হ'তে থাকে,—যেমন ক'রে সাপের পুরোনো খোলস গিয়ে কাল-সহকারে নূতন খোলস হয়, তেম্‌নি। সাধনের ফলে ক্রমশঃ তার নবলব্ধ-প্রকৃতি অনুযায়ী অগ্রগমনও বাড়্‌তে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির বিরোধী যে উন্নতির চেষ্টা, তাতে

প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়্‌তে থাকে। জোর ক'রে শ্বাস-প্রশ্বাস ধ'রে রেখে প্রাণায়াম করা যেমন। যত বেশী জোর ক'রে তুমি নাক টিপে ধরছ, ততই বায়ু চঞ্চল হচ্ছে; প্রাণকে জোর ক'রে যত বেশী স্থির কত্তে চাচ্ছ, সে তত বেশী অস্থির হ'য়ে উঠছে। তাই, শিষ্যের কর্ত্তব্য হচ্ছে সাধনের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া, সাধনের ফলে যে পথ তার জন্য উন্মুক্ত হয়, সেই পথেই নিশ্চিন্তে ও নির্ব্বিচারে চলা।

গুরুর কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহ দান

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর গুরুর কর্ত্তব্য হচ্ছে, শিষ্যকে জোর ক'রে গাধার টুপী বা স্বর্ণ-কিরীট পরাবার চেষ্টা না ক'রে নিয়ত সাধনের দিকেই উদ্দীপনা দান করা এবং সাধনের মধ্য দিয়ে যে প্রশান্ত প্রজ্ঞার আবির্ভাব হবে, তার বলে নিজের পথ নিজে চিনে নেওয়ার উৎসাহিত করা। ভগবানের সঙ্গে নিত্য যোগ-সাধনের উপদেশ শিষ্য গুরুর কাছ থেকেই পাবে, কিন্তু কর্ম্ম-সাধনার ইঙ্গিত সে সংগ্রহ কর্ব্বে নিজের সাধন-লব্ধ দিব্য জ্ঞানের কাছ থেকে।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
২রা বৈশাখ, ১৩৩৬

বৈরাগ্য—আসল ও নকল

অদ্য দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈরাগ্যের দুটা সংস্করণ আছে। একটা আসল, আর একটা নকল। একটা খাঁটি, আর একটা ঝুটা। খাঁটি বৈরাগ্য সাধকের ভিতরে জাগে তার স্বভাবকে আশ্রয় ক'রে, ঝুটা বৈরাগ্য সৃষ্টি হয় অবস্থার

ফেরে। প্রিয়জন-বিয়োগে অনেকে হঠাৎ সংসার-বিরাগী হয়। তার মানে সব সময়ই এই নয় যে, প্রকৃতই সংসারের অনিত্যতা সে বুঝ্তে পেরেছে এবং জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্পদের উপর তার অনাস্থা জন্মে গেছে। পরন্তু, তার প্রকৃত মানে হচ্ছে এই যে, দুর্ব্বল চিত্তে প্রবল শোকাবেগকে ধারণ ক'রে রাখ্তে পাচ্ছে না, তার কাছে তার মাথা নুইয়ে যাচ্ছে, সংগ্রাম ক'রে জয়ী হবার ক্ষমতা তার নেই, তাই সে সংগ্রাম থেকে হঠে গিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভরের স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং নিজের অক্ষমতার ললাটে মস্ত বড় সাইন-বোর্ড লট্‌কে দিচ্ছে,—"ধর্ম্ম সাধনা বা যোগাভ্যাস।" এ সব বৈরাগ্য অধিকাংশ সময়ে স্থায়ী হয় না। ভোগ-সুখের সুযোগগুলি আপ্‌না আপনি যদি কখনও উপস্থিত হয়, তাহ'লে এ বৈরাগ্য গুটি-সুটি মেরে প্রস্থান করে। শোকাবেগ যে ভোগলিপ্সাকে চেপে রেখেছিল, সে আবার মাথা জাগিয়ে ঠেলে উঠে। এক টুকরা শশা খেয়ে তার পর দশ সের রসগোল্লা গিল্‌লেও যেমন ঢেকুর ওঠবার সময় শশার গন্ধই বেরোয়, এই ভোগলিপ্সার অবস্থা তাই। এর নাম মর্কট-বৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্য। বাগানের আম ফুরুলে অনেক সময় বানরের বৈরাগ্য দেখা যায়, যোগাভ্যাসের আমেজ তার ভিতর বেশ ফুটে ওঠে, ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু নিমীলিত ক'রে ঘন ঘন সে রাম-সীতার নাম জপ করে, কিন্তু বর্ষার জল পড়্‌তে না পড়্‌তেই যাই পেয়ারা বাগানে ফুল ফুটে উঠ্‌ল, অম্‌নি তার ধ্যানভঙ্গ হ'য়ে গেল, অম্‌নি সে ছুট্‌লো লম্ফের পর লম্ফে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। রোগে প'ড়ে অনেকের বৈরাগ্য আসে, শরীর যখন

ক্ষীণ, দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য এবং কর্ম্মশক্তিরহিত, তখন বিন্ধ্যাচলের গুহা বা হিমাচলের গহ্বরের কথা চিন্তা ক'রে সে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে থাকে, কিন্তু খুব কয়েকদিন মুরগীর যূষ খেয়ে গায়ে যেই বল ফিরে এল, অম্‌নি তার পূর্ব্ব-স্বভাবও ফিরে এল। কেউ ভালবাসায় প্রতারিত হ'য়ে বিরাগী হন, কিন্তু প্রাণের ব্যথা বুঝবার লোক যদি কেউ গিয়ে ভালবাসা দেয়, তখন বৈরাগ্য ছুটে যায়, মন আবার মায়িক প্রেমের হিল্লোলে নাচ্‌তে থাকে। কেউ বা ভয়ে বৈরাগী হন, কেউ হন মোহে, কেউ হন লোভে। এক রাজবাড়ীর মেথর রাজকন্যাকে বিয়ে করার লোভে সাধু সেজেছিলেন। দুনিয়ার অনেক লোকের বৈরাগ্যই এই রকম। অবশ্য, এসব অস্থায়ী বৈরাগ্য থেকে স্থায়ী বৈরাগ্য যে অনেকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় না, তা' নয়। কিন্তু তাঁদের যে জীবনে কালক্রমে আসল বৈরাগ্য ফুটে ওঠে, তার কারণ হচ্ছে এই যে, অনেক সময় অস্থায়ী বৈরাগ্যের সাধনা তাঁদের প্রকৃতিকে স্থায়ী বৈরাগ্যের অনুকূল করে। যে বৈরাগ্যের সঙ্গে তোমার স্বভাবের যোগ রয়েছে, সেইটীই সহজে স্থায়ী হবে। বৈরাগ্যের সঙ্গে যার স্বভাবের যোগ কম, তার পক্ষে জোর ক'রে বৈরাগ্যের সাধন প্রায়ই সিদ্ধি-মণ্ডিত হয় না, বরং হঠাৎ-বৈরাগীদের বৈরাগ্য ঝটিকাক্ষিপ্ত সমুদ্র-তরঙ্গের মত ভোগের প্রবল আক্রোশেই ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে মরে। ফলে নানা জটিল ও মিথ্যাচারপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং নির্ব্বিচারে ভোগের পথে চল্‌লেও যাঁর দ্বারা মনুষ্য-সমাজের দু-দশটা কল্যাণ হ'লেও বা হ'তে পাত্ত, জোর ক'রে ত্যাগী হ'তে চেয়ে তিনি নানা প্রকারে মনুষ্য-সমাজকে অসত্যক্লিষ্ট কদাচার-পঙ্কিল করেন।

অস্থায়ী বৈরাগ্যোদয়ে কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চিত্তের ভিতরে বৈরাগ্যের উদয় হ'লে তা' খাঁটি কি সাময়িক, তা' বুঝে উঠা বড় কঠিন। খুব কম লোকে বিচার কর্ত্তে পারে যে, এ বৈরাগ্য ধোপে টিক্‌বে কিনা। এজন্য বৈরাগ্যের উদয়মাত্রই লোটা-কম্বল নিয়ে বের হ'য়ে পড়া ঠিক্ নয়। বরং বিষয়-বিতৃষ্ণা অনুভূত হ'লে নিজ প্রকৃতিকে, প্রচ্ছন্ন স্বভাবকে বৈরাগ্যের অনুভূত করার জন্য চিত্তশুদ্ধির সাধন করা কর্ত্তব্য। ভগবানের নামই চিত্তশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ সাধন। সুতরাং বৈরাগ্যোদয়ে নামকেই খুব জোরে আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাকা উচিত। বৈরাগীর বাইরের বেশভূষা নকল কত্তে গেলে হয়ত নাকাল হ'তে পার। নামের বলে অস্থায়ী বৈরাগ্যকে আগে স্থায়ী বৈরাগ্যে রূপান্তরিত কর, তারপরে বাকী সব দেখা যাবে।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম; সামন্তগড়ের গৌর সাধু

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—ভগবানকে ডাকতে হ'লেই কর্ম্ম-জীবন থেকে একেবারে অবসর নিতে হবে, এটা লোকের এক মস্ত বড় ভ্রান্ত ধারণা। যে কর্ম্ম সাধন-বিঘ্নকর, যে কর্ম্ম চিত্তবিক্ষেপজনক, সেই কর্ম্ম তোমাকে পরিবর্জ্জন কত্তে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু কর্ম্ম মাত্রেরই সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ রচনার যে প্রয়াস, তার মধ্যে যৌক্তিকতা নেই এক বিন্দুও। স্থলবিশেষে কর্ম্মকে, স্থলবিশেষে সাধনকে প্রাধান্য দিয়ে চল্‌তে হ'তে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধর্ম্ম করব ব'লেই নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে ব'সে থাক্‌ব, তার কোনো মানে নেই। ত্রিপুরা জেলায় সামন্তগড় গ্রামে "গৌর" নামে এক সাধু ছিলেন, তিনি হাটবার দিন হাটে ব'সে জিনিষপত্র

বিকিকিনি কত্তেন, আর, সমগ্র সপ্তাহ একান্তে ব'সে নাম সেবা কত্তেন। ভ্রমেও তিনি কোনো খদ্দেরকে এক রতি জিনিষ ওজনে কম দিতেন না, ব্যবসায়ের খাতিরেও একটী মিথ্যা কথা বল্‌তেন না। গৌরের মাতুলেরা দেখ্‌লেন, ভাগ্নেকে দিয়ে চুরী চলে না, অতএব তাঁরা মনে মনে প্রমাদ গণ্‌লেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল, হাটের সমস্ত লোক এসে গৌরের দোকানেই ভিড় করে, সাধুর হাতের স্পর্শ করা জিনিষ ঘরে নিয়ে যাবার জন্য। ধ্যান-জপ কত্তে হবে ব'লে উদরান্নের বোঝা আর একজনের ঘাড়ে চাপাব কিম্বা উপার্জ্জন ক'রে খেতে হবে ব'লেই ধ্যান-জপ ছেড়ে দিব, এ হচ্ছে কুঁড়ের বাদ্‌শার আদর্শ। মালা জপি ব'লেই কামান দাগতে পার্ব্ব না, আর, সৈনিকের কাজ করি ব'লেই ভজন-পূজনে জলাঞ্জলি দিব, এ সব হচ্ছে মস্তিষ্কহীন মতবাদ। আমার কর্ম্ম আমার ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে চল্‌বে না, আমার ধর্ম্ম আমার কর্ম্মকে উপেক্ষা কর্ব্বে না, এইটাই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতার লক্ষণ। অবশ্য, পাত্রভেদে কর্ম্মের পার্থক্য থাক্‌বে, সন্দেহ নাই। মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধ মাংস বিক্রয় কত্তে কত্তেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সাধন কর্ব্বেন, অর্জ্জুন যুদ্ধ কত্তে কত্তেই ধর্ম্ম-সাধন কর্ব্বেন। বিষ্ঠার কীট হ'য়েই কেউ যদি জন্মায়, তবে তাকে ঐ বিষ্ঠার স্তূপে ডুবে থেকেই ধর্ম্ম-সাধন কত্তে হবে।

ধর্ম্ম-সাধন কি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য স্পষ্ট ক'রে ধারণা থাকা চাই যে, ধর্ম্ম-সাধন কাকে বলে। চুল-দাড়ী-জটা রাখাই ধর্ম্ম-সাধন, না নিয়ত ভগবানের সঙ্গে প্রাণের যোগরক্ষাই ধর্ম্ম-সাধন?

নিশ্চিতই বাইরের ঘটাকে ধর্ম্ম-সাধন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। নিয়ত প্রাণের মাঝে ঐশ্বরিক স্মৃতি জাগিয়ে রাখাই ধর্ম্ম-সাধন। যে কর্ম্মেই থাক আর যে কর্ত্তব্যই কর, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-প্রাণ পরমাত্মার মধুময় স্পর্শ তোমার নিজের প্রাণে, মনে, অস্তিত্ববোধে জাগিয়ে রাখা চাই।

যোগ বা অন্তর্যাগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঋষিরা একেই বলেছেন যোগ বা অন্তর্যাগ। যতক্ষণ আমার আমিত্ববোধ আছে, ততক্ষণ সেই আমিত্বের সঙ্গে জগৎপ্রাণ জগদীশ্বরের অস্তিত্ববোধকে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে রাখ্‌বার চেষ্টাই অন্তর্যাগ। যতক্ষণ আমার শ্বাস-প্রশ্বাস আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে ভগবৎ-স্মৃতিতে মুখরিত রাখ্‌বার চেষ্টারই নাম হচ্ছে যোগ। এই যোগে বাইরের ঘটার বিন্দুমাত্রও আবশ্যকতা নেই, ধার্ম্মিকতার কোনও ভাণ বা অভিনয়ের প্রয়োজন নেই, তামা, তুলসী, গঙ্গাজলেরও আবশ্যকতা নেই। লাঙ্গল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তুমি তোমার সাধন কত্তে পার, জেলখানার ঘানি টানতে টানতে তুমি অন্তর্যাগের সাধন সানন্দে চালাতে পার, দারুণ রোগশয্যায় প'ড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তুমি তোমার আসল কাজ হাসিল কত্তে পার, মোটর চালাতে চালাতে, ষ্টীম-ইঞ্জিন চালাতে চালাতে, সেনা-রেজিমেন্টের সঙ্গে মার্চ্চ কত্তে কত্তে ভগবৎ-স্মৃতির আরাধনা কত্তে পার।

আসন্ন-প্রায় ধর্ম্ম-প্লাবন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু প্রকৃত অধিকারীরা আবির্ভূত হয় নি ব'লে এতকাল জন-সমাজে যোগের স্থূল কৌশলগুলিই

প্রচারিত হ'য়ে এসেছে, সূক্ষ্ম কৌশল লোক-গুরুরা সযত্নে প্রচ্ছন্ন ক'রে চলেছেন। কারণ, যে যার যোগ্য হবার জন্য চেষ্টা করে না, তার হাতে তার অপব্যবহার হয়। ভারতবর্ষে এখন লক্ষ লক্ষ সিদ্ধ যোগী ও উগ্র সাধক পূর্ব্বজন্মের তপোলব্ধ জ্ঞান-সংস্কার নিয়ে পুনরায় নব-জন্ম গ্রহণ কচ্ছেন। এখন ভারতের সত্যিকার ধর্ম্ম-প্লাবন আরম্ভ হবে। কিন্তু এ প্লাবন নেড়ানেড়ীর দল সৃষ্টি কর্ব্বে না, ভিক্ষুকের সমাজ পুষ্ট কর্ব্বে না, জগৎকে মায়া ব'লে একান্ত অবজ্ঞা-ভরে উড়িয়ে দিয়ে ধার্ম্মিককে কর্ম্মবিমুখ ও কর্ত্তব্যবিমুখ কর্ব্বে না। এ ধর্ম্ম-প্লাবনের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ই হবে অভূতপূর্ব্ব এবং অভাবনীয়। ছোট-বড় বাছবে না, নরনারী, বালক-বৃদ্ধ বিচার কর্ব্বে না, এ ধর্ম্ম-প্লাবন সকলের উপর দিয়ে সমভাবে ব'য়ে যাবে, প্রত্যেককে যোগের সূক্ষ্ম কৌশলে দীক্ষিত কর্ব্বে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে এক অত্যাশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের বন্ধনে বাঁধ্‌বে।

নাম-সাধনা ও দার্শনিক রুচি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্তর্যাগের অবলম্বন হ'ল ভগবানের নাম। পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ লম্বা-চৌড়া আড়ম্বরপূর্ণ নাম নয়, তাঁর সহজতম, সংক্ষিপ্ততম স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারিত অনাহত নাম। নাম-সাধনের প্রক্রিয়াও হবে, যতটা সম্ভব স্বাভাবিক। একই নাম চারজনের কাছে চার প্রকারে ঐশ্বরিক স্মৃতির উদ্দীপক হ'তে পারে। মনে কর, প্রণব। প্রণবের সাধন কর্ব্বার সময়ে আমি অপর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্মরণ না ক'রে আমাকেই ঈশ্বর ব'লে মনন কত্তে পারি। প্রণবের সাধন কর্ব্বার সময়ে

তুমি তোমার নিজের অস্তিত্বকে মিথ্যা ব'লে মনে ক'রে পরমেশ্বরকে সর্ব্বময় সর্ব্বাধীশ্বর ব'লে স্মরণ কত্তে পার। প্রণবের সাধন কর্ব্বার সময় তৃতীয় এক ব্যক্তি নিজের অস্তিত্বকেও সত্য ব'লে জেনে, আবার ইষ্টের অস্তিত্বকেও সত্য ব'লে জেনে উভয়ের মধ্যে দ্বৈতভাবমূলক সখ্য, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুরাদি কত ভাবের আদান-প্রদান কত্তে পারেন। আবার চতুর্থ এক ব্যক্তি নিজেকে ও ব্রহ্মকে বাহ্যতঃ ভিন্ন ব'লে মনে ক'রেও, উভয়ের মধ্যে অভেদ-অখণ্ডত্ব স্থাপনই সত্য-প্রতিষ্ঠা, এইরূপ মানসিক অধ্যবসায় সহকারে প্রণব সাধনা কত্তে পারেন। নাম-যোগেই অন্তর্যাগ হবে, কিন্তু সে নাম বিভিন্ন-অধিকারীর দার্শনিক রুচিকে পরিপুষ্টই কত্তে থাক্‌বে।

প্রাণাহুতির অর্থ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্তর্যাগের অবলম্বন নাম কিন্তু উপকরণ শ্বাস ও প্রশ্বাস। শ্বাস এবং প্রশ্বাসকে ভগবানের নামে আহুতি দেওয়াই প্রাণাহুতি। প্রথম সাধন-কালে মনের বিক্ষিপ্ততা থেকে আত্মরক্ষার সুবিধার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিরালা ব'সে অভ্যাসই উত্তম। কিন্তু কিছুদিন পরে এম্‌নি ক্ষমতা আপনি জন্মে যাবে যে, পঞ্চেন্দ্রিয় নিজ নিজ কর্ত্তব্যে ব্রতী রইলেও মনের ধ্যান-ভঙ্গ হবে না, সে শ্বাস-প্রশ্বাসে আর নামে লেগেই থাক্‌বে।

প্রাণাহুতির যজ্ঞকুণ্ড

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাণাহুতির যজ্ঞকুণ্ড হচ্ছে, ভ্রূমধ্য। শ্বাস-প্রশ্বাসের ইন্ধন দিয়ে এই যজ্ঞকুণ্ডে জ্যোতির্ম্ময়

ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত কত্তে হয়। কিন্তু একদিনে ত' আর আগুন জ্বলে না! ভ্রূ-মধ্যে মনঃসন্নিবেশনের চেষ্টা চালাতে চালাতে আস্তে আস্তে আপনিই মন সেখানে স্থির হয় এবং চক্‌মকির ঘর্ষণে যেমন আগুন জ্ব'লে সকল অন্ধকার দূর করে, তেমনি আগুন বিনা চক্‌মকিতে জ্ব'লে উঠে অনন্ত জ্ঞান-রাজ্যের সিংহ-দুয়ার সাধকের জন্য খুলে দেয়।

ভ্রূ-মধ্যে মনঃসংযমের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করা আর ভ্রূ-মধ্যে মন রাখা, এ দুটি কাজই অভ্যাস-সাপেক্ষ, সামর্থ্য-সাপেক্ষ। এমতাবস্থায় এ দুটি কাজ এক সঙ্গে ক'রে ওঠা প্রথম-সাধকের পক্ষে শুধু কষ্টকরই নয় যথেষ্ট চিত্তোদ্বেগকারকও বটে। এ জন্য অন্তর্যাগের সাধককে সাধনাঙ্গগুলিকেও ভাগ ক'রে ক'রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আগে অভ্যাস ক'রে নিতে হয়। প্রথমে ধর, ভ্রূ-মধ্যে মনঃসন্নিবেশনের কথা। ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে মনঃস্থির করার সহায়তার জন্য অনেকে চন্দনের বা কর্পূরের ফোঁটা দেন। তাতে ভ্রূ-মধ্যবর্ত্তী চর্ম্মে এক প্রকার মৃদু স্পন্দন অনুভূত হয়, ফলে বারংবার বহির্বিচারী মন ভ্রূ-মধ্যে ফিরে যায়। কিন্তু এ উপায়ের চাইতেও শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভ্রূ-মধ্যে কোনও প্রিয় বস্তুর ধ্যান করা। শিষ্যের গুরুমূর্ত্তি, পুত্রকন্যার মাতা-পিতার মূর্ত্তি, স্ত্রীর স্বামি-মূর্ত্তি অথবা নিজ নিজ বিশ্বাসানুযায়ী দেবদেবীর মূর্ত্তি, কিম্বা কোনও প্রিয় নাম, যথা—ওঙ্কার প্রভৃতির ধ্যান চল্‌তে পারে। এই ভাবে কতিপয় দিবস একাগ্র আগ্রহ-সহকারে ধ্যানাভ্যাস কর্ল্লে সহজেই মন ভ্রূ-মধ্যে স্থির থাক্‌বার স্বভাবটী পায়। তারপরে সকল সময়েই মনকে ভ্রূ-মধ্যে রাখ্‌বার

আকাঙ্ক্ষাটাকে প্রবল রাখ্‌তে হয় এবং যখনই মনের গতির প্রতি লক্ষ্য পড়্‌বে তখনই তাকে টেনে এনে ভ্রূ-মধ্যে বসাতে চেষ্টা কত্তে হয়। আর, যখন মস্তিষ্কের পীড়া বা অসুখ-বিসুখের দরুণ কিছুতেই মন নিজ ভ্রূ-মধ্যে বস্‌তে চায় না, তখন যোগী-পুরুষদের মূর্ত্তি চিন্তা ক'রে তাঁদের ভ্রূ-মধ্য ভাবনা কত্তে হয়। একজন স্বদেশ-প্রেমিক ভ্রূ-মধ্যে স্বদেশের মানচিত্রকে চিন্তা ক'রে মনঃস্থির কত্তে পারেন। একজন বৈষ্ণব বা রামায়ৎ কৃষ্ণলীলা বা রামলীলাকে ভ্রূ-মধ্যে অনুধ্যান কত্তে চেষ্টা কত্তে পারেন।

ভ্রূ-মধ্যে মনঃসংযোগের সূচক লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ভাবে মনের ক্রমশঃ ভ্রূ-মধ্যে এসে বস্‌বার একটা আমেজ আস্‌তে থাকে। তখন কোনও ফোঁটা না দিলেও মনে হ'তে থাকে যেন কে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দিয়েছে। তখন মন অন্য দিকে চ'লে গেলেও অনুভূত হয়, কে যেন ভ্রূ-মধ্যে ব'সে দড়ি দিয়ে বেঁধে মনকে টান্‌ছে। আরও একটু প্রগাঢ় সংযোগের অবস্থা এলে মনে হয়, যেন মাঝে মাঝে চ'খের সামনে জ্যোতির তরঙ্গ বা বিদ্যুতের স্ফূরণ হচ্ছে। এই সব হচ্ছে ভ্রূ-মধ্যে স্থির মনঃসংযোগের পূর্ব্বলক্ষণ।

নাম ও তাহার অর্থবোধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারপরে ধর নামের কথা। শুধু নাম জপ্‌লেই ত' হয় না, নামে মনঃসংযোগ হওয়া চাই। তার জন্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন নামের অর্থবোধ। মনে কর, প্রণব তোমার ইষ্টনাম। কিন্তু শুধু জ'পে গেলেই হবে না। বরং জপের

আগে প্রণব মানে যে "ব্রহ্ম", প্রণব মানে যে তোমার "সর্ব্বাভীষ্ট-প্রপূরক পরম দেবতা" এই কথাটী শতবার, সহস্রবার, লক্ষবার, কোটিবার মুখস্থ কত্তে হবে। অসাবধানেও মনে মনে প্রণব উচ্চারণ করামাত্র তার অর্থ স্মরণ হওয়া চাই, এমন অভ্যাস কত্তে হবে। নিদ্রিতাবস্থাতে স্বপ্নেও যদি প্রণব মনে পড়ে, তবু যেন তার অর্থটুকু সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে, এমন সুতীব্র অভ্যাস চাই।

নামে রুচি-বৃদ্ধির সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—নামের অর্থবোধ বেশ পাকা ভাবে জন্মালে তারপর প্রয়োজন নামে রুচি-বৃদ্ধি। অর্থবোধ হ'লেই যে নামে রুচি আস্‌বে, এমন কোনো কথা নেই। রুচিবৃদ্ধির জন্য আবার পৃথক্ রকম সাধনা কত্তে হবে। সে সাধনা হচ্ছে নামজপ। নামে রুচিবৃদ্ধির জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিরালা ব'সে নাম জপ্‌তে হয়। "জপাৎ সিদ্ধিঃ"—এই কথাতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নাম জপ্‌তে হয়। আর, নামের মহিমার কথা নিরন্তর চিন্তা কত্তে হয়। নামের বলে কার জীবনে কি অভাবনীয় অভ্যুদয় ঘটেছে, সেই সব আলোচনা কত্তে হয়। নামজপ মালাতে বা করে চল্‌তে পারে। রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, বিল্ব, তুলসী, স্ফটিক প্রভৃতি যে কোনও প্রকার মালার সাহায্যে জপ চল্‌তে পারে। নামকে মধুময় ব'লে ভাবতে হবে। নামকে সর্ব্বকল্যাণের আকর ব'লে জান্‌তে হবে। নামকে অমৃতের মত মৃত সঞ্জীবনী শক্তিসম্পন্ন ব'লে জান্‌তে হবে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারপরে এলো শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা। তারও সাধনা কত্তে হয়। কাজ কর্ব্বে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে, শ্বাস-বায়ুকে বিন্দুমাত্র উৎপীড়িত না ক'রে, বিন্দুমাত্র জোর জবরদস্তি না খাটিয়ে। স্বভাবের বশে সে যেমন আসে যেমন যায়, তার সাথে সাথে নাম ক'রে যাবে। ইচ্ছা ক'রে তার গতিবেগ বাড়িও না, ইচ্ছা ক'রে তার গতিবেগ কমিও না। শ্বাস-প্রশ্বাস এমন জিনিষই নয়, যার উপরে জবরদস্তি হিতকর হয়। যতবার শ্বাস টানবে, ততবার নাম জপ্‌বে; যতবার প্রশ্বাস ছাড়বে, ততবার নাম জপ্‌বে। একটী শ্বাসকে বা একটী প্রশ্বাসকে বৃথা যেতে দিবে না। প্রত্যেকটীর সাথে নামের শুভ-সংযোগ সাধন করা চাই। শ্বাসকে মনে কর্ব্বে যেন এক অন্তর্মুখবিস্তৃত বিশাল কৃষিভূমি। এতে নামের বীজ বপন ক'রে চল। প্রশ্বাসকে মনে কর্‌বে, বহির্মুখ-বিস্তৃত অপর এক কৃষিভূমি। এতেও নামের বীজ বপন ক'রে যাও। পরিণামে তার প্রেমময় ফসল একদিন পাবে, প্রাণ ভ'রে পাবে, মন ভ'রে পাবে। প্রাণবায়ুর স্থূলাবস্থা হচ্ছে শ্বাস ও প্রশ্বাস, সূক্ষ্মাবস্থা হচ্ছে স্থিরত্ব। স্থূলাবস্থাকে নাম-সহকৃত ক'রে সাধন কত্তে কত্তে সূক্ষ্মাবস্থা আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বদেশ-সেবা ও স্বদেশী-সাহিত্য

সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমবাসীরা সকলেই জোড়ের (ঝরণার) তীরে আসিয়া বসিয়াছেন। সকলেরই সঙ্গে এক একটী করিয়া বাল্‌তি। কারণ, আশ্রমে কূপ বা পুকুর নাই। আসিতে যাইতে

প্রায় অর্দ্ধ মাইল পার্ব্বত্য বনপথ অতিক্রম করিতে হইলেও এখান হইতে জল নিয়াই যাবতীয় কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে হয়। আগামী আষাঢ়ে নানাবিধ গাছের চারা গ্রামে গ্রামে বিতরিত হইবে, সেই চারা বাঁচাইবার জলও এখান হইতেই নিতে হয়, রন্ধন ও পানের জলের কথা বলাই বাহুল্য। সকলেই অনেকক্ষণ কোদাল মারিয়া আসিয়াছেন, তাই জোড়ের তীরে বসিয়া কতক্ষণ বিশ্রাম করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বদেশ-সেবা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা কচ্ছি খুব কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্বদেশী-সাহিত্য গ'ড়ে তুল্‌তে পারিনি। যার বলে দেশের মনকে দেশের দিকে টেনে আন্‌ব, তাকে গড়বার জন্যে চেষ্টা করিনি। এই যে সাহিত্যিক দৈন্য, এটা হচ্ছে সমস্ত জাতীয় আন্দোলনের বনিয়াদের দৈন্য। নল, নীল সুষেণ প্রভৃতি পাকা মিস্ত্রী হয়ত দেশে যথেষ্টই আছেন, কিন্তু পাথর ছাড়া সেতুবন্ধ হয় না। আমাদের সাহিত্যে চল্‌ছে শুধু পাশ্চাত্যের অনুচিকীর্ষা, শুধু য়ুরোপের নকল। দেশাত্মার প্রাণ যে কোথায়, তার খোঁজ আমরা রাখি না, আমরা ভাব্‌ছি, সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে কতকগুলি গরম গরম বুলি আমদানী কত্তে পার্ল্লেই বুঝি দেশোদ্ধার ক'রে দিতে পার্ব্ব। য়ুরোপ থেকে ভাবধারা আসে আসুক, যেটা গ্রাহ্য, সেটা গ্রহণ কর্ব্ব, কিন্তু য়ুরোপের কাছে অঋণী থেকে স্বদেশ-সাধনার পথে যে সিদ্ধিটুকু আমরা করায়ত্ত কত্তে পার্ব্ব, জান্‌বে, সেইটুকুই আমাদের জাতীয় সম্পদ, সেইটুকুই আমাদের দেশের স্থায়ী ঐশ্বর্য্য। আমাদের সাহিত্য সেই নিজস্ব কৌস্তুভমণিকে কেন্দ্র ক'রে যেদিন গড়্‌তে পার্ব্ব, সেই দিনই ভারতবর্ষ তার যোগ্য

মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এত স্বদেশী আন্দোলন কচ্ছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত শিশুর মনে স্বদেশীর ভাবগুলিকে গ্রথিত ক'রে দেবার জন্য আয়োজন কত্তে পারিনি। অথচ, ইচ্ছা থাক্‌লে পাটিগণিতের অঙ্কের মধ্য দিয়ে যোগ-বিয়োগ-পূরণ-ভাগের ছাত্রকে দেশের সকল কথা শেখান যায়, সকল কথা বুঝান যায়।

নব নব ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিশুর মনকে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত কর্ব্বার জন্যে যেমন সুস্থ সবল লেখনীর পরিচালনা আবশ্যক, নূতন ক'রে তেমন ধর্ম্মবোধোদ্দীপক সহস্র সহস্র গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রণয়ন কত্তে হবে। নূতন নূতন পুরাণ কবিতার ছন্দে, কাব্যের ভাষায়, তপঃ-সাধনলব্ধ ধ্যান-প্রশান্ত চিত্তের অভ্রান্ত প্রেরণায় যুগাদর্শের অনুকূল ভাবে লিখতে হবে, লেখাতে হবে। ব্যাস-বাল্মিকীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁদেরই রচিত মহাকাব্যকে নূতন যুগের নূতন মানুষের আত্মগঠনের অনুকূল ক'রে সম্পাদন কত্তে হবে। দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলিকে যথাসাধ্য একত্র কত্তে হবে, ভগবৎ-সাধনের অমৃতময় রসে সেই প্রতিভাতে নব-জীবনের সঞ্চারণা দিতে হবে এবং বহু প্রতিভার সমবেত চেষ্টাকে, সমবেত অধ্যবসায়কে, সমবেত শক্তিকে সহস্র দিকে অবাধে পরিচালিত কত্তে হবে।

নবভাব প্রচারের ভাষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যাস-বাল্মিকীর তপস্যার ফল যে ভাষার ভিতর দিয়ে বিতরিত হয়েছিল, নব নব ভাব-প্রচারের পক্ষে ভারতবর্ষে সেই সংস্কৃত ভাষাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

কিন্তু উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে সে আশার সমাধি হ'য়ে গেছে। উচ্চতম ভাব উৎকৃষ্টতম অনুভূতি প্রচারের সহজতম যোগ্যতা আজ সেই ভাষার, যেই ভাষার ভিতর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অবদান বিতরিত হয়েছে। রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়াসে এই আশারও হয়ত সমাধি হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার দাবী অবৈধ ব'লে মনে করার সময় আসেনি। মোট কথা, নব-সংস্কৃতি, নব-সভ্যতা, আদর্শের নবারুণ-কিরণ সৃষ্টিতে যে নিজের প্রাণ দেবে, তার ভাষাই সবাই মেনে নিবে, তার ভাষাই সবাই আগ্রহ-ভরে অভ্যাস কর্‌বে। ভাষার চাইতে ভাবের হবে মূল্য বেশী।

গুরু, শিষ্য, গুরুবাদ ও সাধন

অদ্য রাত্রে জনৈক জিজ্ঞাসুর নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি একখানা পত্র লিখাইলেন। যথা,—

"গুরু-দর্শনে শিষ্যের কিছু লাভ হয় কি না, ইহা শিষ্য সকল সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, সাধন না করিলে গুরু-সঙ্গের কল্যাণ-প্রভাব উপযুক্ত ভাবে ছড়াইয়া পড়ে না। চাঁদের জ্যোৎস্না সকলের আঙ্গিনাতেই পড়ে, যাহার আঙ্গিনা যত পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত, তাহার আঙ্গিনাতে সে তত সুন্দর রূপ ধরে। ইহা চাঁদের দোষ বা গুণ নহে, ইহা আধারেরই দোষ বা গুণ। কত জন হুজুগ করিয়া গুরুদর্শনে যায়, কিন্তু হয়ত অনেক সময় চিত্তটাকে প্রস্তুতই করে না।

"গুরু-পাদপদ্ম-দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা শাস্ত্রকারেরা করিয়াছেন। কেহ কেহ গুরু-দর্শনকে ব্রহ্ম-দর্শনের তুল্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই কথাগুলি শুধু কল্পনাই নহে। স্থূল-

বিশেষে, কাল-বিশেষে এবং পাত্র-বিশেষে এই কথাগুলি পূর্ণ সত্য। ভক্তিমান্ চিত্ত লইয়া যখন ভক্ত সাধক গুরু-দর্শন, গুরু-স্মরণ অথবা গুরুর গুণানুকীর্ত্তন করে, তখন তাহার বুকেরই বল বাড়ে, প্রাণেরই প্রসার বাড়ে, হৃদয়েরই ক্লেদ প্রশমিত হয়, চিত্ততাপ দূরে যায়, হতাশা-অবসাদ বিনষ্ট হয়। যাহাদের ইহা হয়, তাহাদের পক্ষে গুরুবাদ পূর্ণ সত্য। তাহারা যদি গুরুকে পরমেশ্বর বলিয়াও অর্চ্চনা করে, তথাপি তাহাদের ক্ষতি হয় না, লাভই হয়। কিন্তু যেখানে তাহা হয় না, সেখানে গুরুবাদ মিথ্যা। গুরুবাদ একটা সর্ব্বজনীন সত্য নহে, গুরুবাদ সত্য বা অসত্য শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়া।

''শিষ্যকে পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হয়, প্রাণান্ত সাধন করিতেই হয়। গুরুর তপোলব্ধ শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে শিষ্যের কল্যাণ করে। অ-তপস্বী শিষ্য গুরুর সেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে পারে না, পরন্তু তপস্বী শিষ্য তপস্যার বলে গুরুর সেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে নিজের ব্যবহারে আনিতে সমর্থ হয়। ইহাই গুরুর কৃপাশক্তি। সকলেই তেলো মাথায় তেল দেন। যে শিষ্য নিজেও সাধন করে, গুরুর সাধন-শক্তি তাহাকে সহায়তা করে সব-চাইতে বেশী।

''যে সকল চিন্তা তোমাকে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, সেগুলি কেবল তোমার একারই নহে, প্রত্যেক সাধকের অন্তরেই তাহা আলোড়ন ও বিলোড়ন উপস্থিত করিয়া থাকে এবং সাধনেরই শক্তিতে সেই সন্দেহ-সঙ্কুল দুঃখ-বহুল কণ্টক-সমাকুল চিত্তাবস্থা প্রশান্তি লাভ করে। শত শত প্রশ্নের প্রতি, শত শত সমস্যার প্রতি দৃকপাতহীন হইয়া তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে শুধু সাধন

করিয়া যাওয়া এবং সাধনের মধ্য দিয়াই সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার সাক্ষাৎকার লাভ করা।''

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৩রা বৈশাখ, ১৩৩৬

ভুতুড়ে কাণ্ড

অদ্য দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি জোল্‌হাডি ওরফে হরিহরপুর যাইতেছেন। যাত্রাপথে কাম্‌নাগড়ার রাস্তাটীর সংস্কার আরম্ভ করা যায় কিনা তদুপলক্ষে উহা পরিদর্শন করা হইল। পথে গৃহে গৃহে কলিকাতা, দ্বারবঙ্গ ও পুণা হইতে আনীত কৃষি-বীজ বিতরিত হইতেছে। কোনও কোনও চাষা ''নাই লিবক্'' বলিয়া বীজ ফেরৎ দিতেছে। তাহার প্রথম কারণ, আলস্য। দ্বিতীয় কারণ, শাকসব্‌জী-উৎপাদনে পূর্ব্ব-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অভাব, —যে হেতু এদেশে খুব মস্ত বড় চাষারাও ধান আর অড়হর ব্যতীত আর কিছুর আবাদ জানে না। তৃতীয় কারণ, কুসংস্কার, —অনেকের ধারণা, ''স্বামীজী'' যে বন কাটিয়া আশ্রম করিয়াছেন,—সেই বনের প্রত্যেকটা গাছে একটা করিয়া ভূত থাকিত, গাছগুলি কাটিয়া ফেলাতে ভূতগুলি আশ্রয়হীন হইয়াছে, এক্ষণে ''স্বামীজী'' সেই আশ্রয়চ্যুত ভূতগুলিকে বিতরিত বীজের সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কৃষকদের ঘরে চালান দিতেছেন। মোট কথা, পুপুন্‌কী গ্রামে আসিয়া যে পাঁচ সাত ঘর মধ্যাবস্থাপন্ন বাঙ্গালী তাম্বুলি দুই তিন পুরুষ যাবৎ বাস করিয়া মানভূমের অধিবাসী হইয়াছেন, তাঁহারা ছাড়া চতুর্দ্দিকের আর প্রায় সকল লোকে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রত্যেকটী কর্ম্মকে এক একটা অসম্ভব রকমের ব্যাখ্যা দিয়া বেড়াইতেছেন। আশ্রমে একদিন জলের

কলসী হইতে গ্লাসে জল ঢালিতে গিয়া দেখা গেল, এক ভীষণাকৃতি গোখুরা সাপ ফণা উদ্যত করিয়া মস্তক আন্দোলিত করিতেছে। পিপাসার্ত্ত কর্ম্মীর জলপান বন্ধ হইল, এই সর্পটীকে কি করিয়া তাড়ান যায়, তাহাই হইল সমস্যা। এই কুটীরখানাতেই রাত্রিতে সকলকে শয়ন করিতে হইবে। যদি কাহারও সর্পাঘাত ঘটে ? গ্রাম হইতে এক কুর্ম্মী * যুবক আশ্রমে ঔষধের জন্য আসিয়াছে, সে আবার মস্তবড় একজন সাপুড়িয়া। সে বলিল, —"আমি সাপ ধরিব।" বাস্তবিক সে আশ্চর্য্য কৌশল-সহকারে প্রায় পাঁচ ছয় হাত লম্বা সুদীর্ঘ গোখুরা সাপটাকে অনায়াসে ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, সাপটা মারিয়া ফেলিবে কি না। আশ্রমের এক ছাত্র, জাতিতে মৈথিল ব্রাহ্মণ, সে বলিল,—"মারিলে ব্রহ্মহত্যা হইবে। সর্পজাতি, বিশেষতঃ গোখুরা, কশ্যপ-মুনির সন্তান, কদ্রূর গর্ভে জন্মিয়াছিল।" সর্পকে আর হত্যা করা হইল না, কুর্ম্মী যুবকটী সাপের হাঁড়ী মাথায় বহিয়া গ্রামে লইয়া গেল। গ্রামের মুরুব্বি লোকেরা বলিয়া উঠিল,—"কি ক'রেছিস্ সর্ব্বনেশে ছেলে! বনের ভুতটাকে স্বামীজী সাপ ক'রে দিয়েছেন। তুই সেইটাকে নিয়ে এলি ? এখন গ্রামে ঘরে ঘরে কলেরা-বসন্তের মড়ক না লাগে।" অগত্যা সাপুড়িয়া যুবক সাপটীকে লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিল এবং সকলের অগোচরে তাহাকে আশ্রম-কুটীরের নিকট ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র গ্রামকে ভুতের উৎপাত হইতে রক্ষা করিল। ইহা ১৩৩৫

---

* এই কুর্ম্মীরা গয়া, গোরখপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কুর্ম্মীদের মত উন্নত নহে। অনেকে ইহাদিগকে এদেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে 'সাঙ্গা' প্রথা প্রচলিত এবং কুক্কুট-মাংস সেবন নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত।

সালের ঘটনা। এই রকম কুসংস্কারাবিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি ও তাঁহার কর্ম্মীরা বীজ-বিতরণে বাহির হইয়াছেন।

বাল-বৈধব্য-সমস্যা

পুপুনকী গ্রামে আসিয়া পৌছিতেই বাঙ্গালীরা আসিয়া সাগ্রহে বীজ নিতে লাগিলেন। তৎপর শ্রীশ্রীবাবামণি হরিহরপুরের দিকে রওনা হইলেন। কথায় কথায় বাল-বিধবাদের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোক দেখ্‌লে কারো মনে ভোগের কথা জাগে, কারও বা মায়ের কথা জাগে। এর কারণ হচ্ছে, অভ্যাস। যে যাকে দে'খে দু'চার বার যা ভেবেছে, সে তাকে দে'খে সব সময়েই সেই রকম ভাবতে বাধ্য হয়। অভ্যাসের এম্‌নি শক্তি। বাল-বিধবাদের দেখ্‌লে কারো মনে জাগে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের বিরাট্ মহিমার কথা, কারও মনে বা জাগে পুনর্ব্বিবাহ দেওয়ার কথা। এই যে একটী তাম্বুলী ঘরের বাল-বিধবা পথে আমায় প্রণাম কর্ল্ল, তাকে দেখ্‌লে একজন সমাজ-সংস্কারকের হয়ত ইচ্ছা জাগ্‌তো,—এখনই তার একটা বর খুঁজে বের ক'রে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার। তিনি হয়ত এক্ষনি এই মেয়েটীর বাপের কাছে গিয়ে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা কত্তেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ এবং মঙ্গলজনক। এর কারণ এই নয় যে, সব সময়েই বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা আছে; পরন্তু, এর যথার্থ কারণ অধিকাংশ সময়েই এই হচ্ছে যে, অনেক সমাজ-সংস্কারকই প্রতিনিয়ত বাল-বৈধব্যের সহিত পুনর্ব্বিবাহের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ রেখে চিন্তা কত্তে অভ্যস্ত হয়েছেন। তাই, পাঁঠা দেখ্‌লেই যেমন কালীবাড়ীর পূজারীর কেবল খড়োর

কথাই মনে পড়ে, এঁদেরও বিধবা দেখ্‌লেই তেমন পুনর্বিবাহের কথা মনে পড়ে। আমার কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ। যেখানে বিধবাদের বিবাহের প্রয়োজন আছে, সেখানে তার বিবাহ হোক্, আমি দোষ দেখি না। কিন্তু বিধবা দেখলেই আমার মনে তার পুনর্বিবাহের কথা আসে না। একটী কুমারী দেখলে তারও বিবাহের কথা আমার মনে আসে না। এমন কি, সধবা দেখ্‌লেও তার বিবাহিত জীবনের কথা আমার মনে আসে না। আমার মনে আসে, সেই ওঙ্কাররূপিণী জগদ্ব্যাপিনী আদ্যাশক্তির কথা, যাঁকে দেখলে,—যাঁকে 'মা' ব'লে ডাক্‌লে বাবার কথা ভুল হ'য়ে যায়। মাকে যখন 'মা' ব'লে ডাকি, তখন যদি মনে হয় যে একজন বাপ না থাক্‌লে মায়ের মাতৃত্ব অসম্পূর্ণ, তাহ'লে জান্‌তে হবে যে, মাকে বড় ছোট ক'রে দেখা হচ্ছে। মায়ের কোলের শিশু কি দুনিয়ার বাবার খবর রাখে? মা-ই তার সর্ব্বস্ব, মা-ই তার সর্ব্বাবলম্বন, বিশ্বজগতে মা-ই তার একমেবাদ্বিতীয়ম্। মা বল্লে যখন মা ছাড়া জগতে আর কিছু থাকে না, মামা থাকে না, খুড়ো থাকে না, জ্যেঠা থাকে না, মাসী থাকে না, পিসী থাকে না, ভগ্নী থাকে না, স্ত্রী থাকে না, তখনই জান্‌তে হবে যে, মা ডাকা সত্যি সত্যিই হ'ল। বাল-বিধবাদের পবিত্র মুখ-পানে তাকালে আমার সেই মায়ের কথা মনে পড়ে। তার পুনর্বিবাহের কথাটা মনের কোণেও উঁকি মারে না। যাঁরা বিধবার পুনর্বিবাহের কথা চিন্তা কচ্ছেন, তাঁরা অবশ্য পরদুঃখকাতর মহানুভব ব্যক্তি, তাই করুণায় বিগলিত হ'য়ে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন কচ্ছেন কিন্তু দয়া ত' বৈশ্যের ধর্ম্ম নয় যে, জমা-খরচ খতিয়ে হিসাব ক'রে তা' বর্ষিত হবে! তাই, এই দয়ার, এই অনুকম্পার, এই

বিগলিত করুণার আবশ্যকতা প্রকৃত প্রস্তাবে কতটা আছে, এই দয়াটা দ্বারা বিধবার দুঃখ-নিবারণ কতটুকু হবে, একটা দুঃখ দূর কত্তে গিয়ে মানব-সুলভ ভ্রান্তিবশতঃ বিধবার ঘাড়ে আরও পাঁচটা দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে কি না, ছোট একটা দুঃখ কমাতে গিয়ে বড় আর একটা দুঃখ সৃষ্টি করা হবে কি না, অত বিচার করবার অধিকার ত' দয়ার নেই! তাই, বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের দ্বারা দয়ার ছিদ্র-পথে ঘোরতর দুঃখ যে সমাজের বুকের উপর আস্‌ছে না, তা' বলা কঠিন। আমরা পুরুষের দল যখন বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে অত্যধিক উৎসাহ সহকারে যোগ দেই, তখন অনেক সময়ে আমাদের এই হুজুগের তলায় লুকিয়ে থাকে কাপুরুষতা। কেন না, এদের সম্বন্ধে যে গুরুতর কর্ত্তব্য আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে ছিল, ঢাক, ঢোল, সানাই, শঙ্খ বাজিয়ে এদের বিয়ে দিয়ে ফেলে অতি সংক্ষেপে এবং অতি সহজে আমরা সেই গুরুতর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চাই। এই গুরুতর দায়িত্বটা হচ্ছে—এদের শিক্ষা-দীক্ষার। বিধবার বিয়ে দিতে চাচ্ছ ত', দু'দিন পরে দিলে দোষ কি? ইতিমধ্যে এদের ভিতরের মহাশক্তিকে জাগিয়ে তোল্‌বার ব্যবস্থাটা আগে কর। বছর বছর কতগুলি চিররুগ্ন, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, মুমূর্ষু সন্তান প্রসব ক'রে ক'রে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট ও বিপন্ন হবার অভিসম্পাত থেকে সামাজিক প্রথা যদি এদের মুক্তি দিয়েই থাকে, তবে সেই সুযোগটাকে এদের ভিতরের পুঞ্জীকৃত অন্ধকারকে বিতাড়িত কর্ব্বার অস্ত্ররূপেই আগে ব্যবহার কর না! অশিক্ষিতা একটা বিধবা মেয়েকে বিয়ে দেওয়াতে সমাজের যে লাভ, তা প্রকৃত প্রস্তাবে এত অল্প যে, এর জন্য শক্তিক্ষয় করার আগে বিধবাদের

মধ্যে অন্যান্য বহু কাজ কর্ব্বার রয়েছে। প্রত্যেক বিধবাকে জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমতী ক'রে তোলার চেষ্টা শতগুণ অধিক সুফল প্রসব কর্ব্বে। জ্ঞান-লাভের পরে যে সকল বিধবা পুনর্বিবাহিতা হবেন, পুনর্বিবাহের ভাল-মন্দ ভাল ক'রে বুঝে তারপরে পত্যন্তর গ্রহণ কর্ব্বেন, আমার মনে হয় তাদের বিবাহ সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত কর্ব্বে না, বরং মোটা রকমের লাভেই পুষ্ট কত্তে পার্ব্বে। বর্ত্তমানের যে বিধবা-বিবাহ, তার অধিকাংশই হচ্ছে অজ্ঞান অশিক্ষিতা বালিকার বিবাহ, ভাল-মন্দ বুঝতে অক্ষমা অনাথার বিবাহ। এদের উপযুক্ত স্থান পতিগৃহ নয়, এদের স্থান হচ্ছে বিদ্যালয় বা মহিলাশ্রম। আমরা নিজেদের মূর্খতা ও আলস্য নিবন্ধন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছি। এইটাই হচ্ছে বর্ত্তমান বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের সব চাইতে বড় দুর্ব্বলতা। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যদি কোনও প্রতিক্রিয়া কখনও আত্মপ্রকাশ করে, তবে জান্‌বে, এই দুর্ব্বলতাই তার প্রধানতম কারণ। স্ত্রীলোক মাত্রেরই বিবাহ হওয়া চাই, নইলে জাতিচ্যুতি ঘট্‌বে, এই যে এক সর্ব্বনাশা কুসংস্কার সমাজের উপর রাজত্ব কচ্ছে, তাতে কত যে গার্হস্থ্যে অনিচ্ছুকা মহিলা বৎসর বৎসর স্বল্পায়ু সন্তান প্রসব কত্তে বাধ্য হচ্ছে, কত যে নারী পূর্ণ সংযমের অনুরাগ সত্ত্বেও কাম-পঙ্কিল জঘন্য জীবন যাপন কত্তে বাধ্য হচ্ছে, কত যে যজ্ঞীর হবিঃ কুক্কুরের খেয়াল চরিতার্থ কচ্ছে, কত যে চন্দন-বন দাবানলে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, তার ঠিকানা যারা রাখে, তারা বিধবাকেই হউক আর কুমারীকেই হউক, কোনও নারীকেই একটা আন্দোলনের অনুরোধে তার জ্ঞান-স্ফুরণের আগে বিয়ে দিয়ে দিতে পারে না। বর্ত্তমান বিধবা-

বিবাহ আন্দোলন হৃদয়ের আন্দোলন, কিন্তু মস্তিষ্কহীন আন্দোলন। হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্ক যেদিন সংযুক্ত হবে, সেইদিনই বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হবে।

বক্তৃতা-শক্তি ও বক্তৃতাপ্রিয়তা

যথাসময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি হরিহরপুরে সমাগত হইলেন। শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয় স্বভবনে সমাগত মহাত্মার শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করিয়া তাড়াতাড়ি পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। শ্রান্তি অপগত হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি হরিহরবাবুর আগামী বর্ষার কৃষির একটী নক্সা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি যাঁহারা তরিতরকারী বা ফলের গাছের আবাদে উৎসাহী হইয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তদনুযায়ী গর্ত্ত খননাদি কার্য্যে কায়িক ও বাচনিক সহায়তা করিয়া থাকেন।

হরিবাবুর ভবনে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। হরিবাবু পুপুন্‌কী আশ্রমের কোনও একজন কর্ম্মীর বক্তৃত্ব-শক্তির খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যদিও আমি বক্তৃতা খুব কম দিয়েছি তবু সুবক্তা ব'লে আমার খ্যাতি আছে। কিন্তু এই ছেলেটা আমাকেও এক সময়ে হারিয়ে দেবে মনে হচ্ছে। এ পরাজয়ে গৌরব আছে। পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্। কিন্তু আরো একটা দিক্ আছে, যার জন্য ছেলেদের মধ্যে বক্তৃতা-শক্তি দেখলে আমি ভয় পাই। শক্তিটা থাকুক কিন্তু বক্তৃতা-প্রিয়ত্ব এলেই বিপদ।

হরিবাবু বলিলেন,—বক্তৃতা-শক্তির বর্ত্তমান যুগে খুব প্রয়োজন। দশজনকে একটা কথা বুঝাতে হ'লেই বক্তা চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ কথায় সত্য একেবারেই যে নেই, তা' নয়। কিন্তু বক্তৃত্বের চাইতে বক্তার মনুষ্যত্বটাই বড় জিনিষ। মনুষ্যত্বের সম্পদে যে সমৃদ্ধ, চরিত্রের বলে যে বলীয়ান্, কর্ম্মঠতার, অধ্যবসায়ের যার অবধি নাই, তার কর্ম্মে বক্তৃতা-শক্তির স্থান অতি নিম্নে। বক্তৃত্ব-শক্তি জিনিষটা ভাল কিন্তু বক্তৃত্বপ্রিয়ত্বই অনিষ্টজনক। শ্রোতাদের করতালি দু'চার বার পেলে বক্তাদের সকল প্রতিভা ঐ বকাবকির দিকেই গিয়ে ঝুঁকে পড়ে; যে কর্ম্মে চিল্লাচিল্লির স্থান নাই, সেই নীরব-কর্ম্মে তার রুচি ক'মে যায়। তখন সে কল্পনার জগৎকেই বাস্তব ব'লে ভ্রম করে, আর সহিষ্ণু কর্ম্মীর সতর্ক সুধীর কোলাহল-বর্জ্জিত কর্ম্মকে সে গাঁজাখুরি গোঁড়ামি ব'লে ঘৃণা করে।

বক্তৃতার বিদ্যালয়

হরিবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, পুপুন্‌কী আশ্রমের ছাত্র, শ্রীমান অর্দ্ধেন্দুশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন আপনিই ত' বল্‌ছিলেন, বিলাতে বক্তৃতা শিক্ষা দেওয়ার বিদ্যালয় আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বক্তৃতা-দান একটা বিদ্যা, অতএব তার শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ও প্রয়োজন। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়াটাকেই পেশা ব'লে অবলম্বন কর্ব্বে যারা, বক্তৃতা-বিদ্যায় তারা যত পারদর্শীই হোক্, দেশ-সেবার কঠোর তপস্যাগুলিকে তারা উপেক্ষা কর্ব্বেই কর্ব্বে। এজন্য বক্তৃত্ব-শক্তিকে কর্ম্ম-শক্তির অধীন রেখে বিকশিত হ'তে দেবার জন্যই বিদ্যালয় থাকা উচিত। পুপুন্‌কী আশ্রমের কর্ম্মী-গড়্‌বার কালে তাকে

বক্তৃতা-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হবে, কিন্তু যশোলাভের এই সহজ অস্ত্রটী কারো হাতে তুলে ধর্‌বার আগে তাকে আত্মস্থ, ভাব-সংযম-সমর্থ, অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন যোগী ক'রে নিতে হবে।

বক্তৃতার প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লোকের ভিতরে নূতন ভাব, নূতন প্রেরণা জাগাবার জন্য বক্তৃতা-দান একটা উপায় বটে। কিন্তু লোকের সঙ্গে প্রাণের প্রাণ হ'য়ে মিশে, চরিত্রের মহিমায় তার হৃদয় জয় ক'রে তারপরে কাণে কাণে দুটী অমোঘ-বীর্য্য সিদ্ধবাণী তাকে শুনিয়ে দাও, তাতে তার জীবনের আমূল সংস্কার সাধিত হ'য়ে যাবে। ভালবাসায় বশ ক'রে নিয়ে যদি তারপরে কাউকে মরতেও বল, তবে তাতেও সে সম্মত হবে। পরন্তু, সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে গগনভেদী চিৎকারে তুমি মেদিনী কাঁপিয়ে দাও, সভাভঙ্গের পরে একটী একটী ক'রে শ্রোতার জীবন অনুসন্ধান কর্‌লে দেখ্‌তে পাবে, তোমার বাচালতা তাদের অধিকাংশের শুধু বাচালতাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে। লোকে যা' দেখে, তাই শেখে; যা শোনে তা' দিয়ে শুধু কথার জালই বোনে। একটা ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবার পক্ষে বক্তৃতা হচ্ছে প্রাথমিক পন্থা, জাতি একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙ্গার উদ্যোগ দেখালেই বক্তৃতা বন্ধ ক'রে শুধু প্রেমের বলে আর চরিত্রের বলে কাজ চালাতে হয়।

পতিতার সংখ্যা-বর্দ্ধনে পুরুষের দায়িত্ব

সন্ধ্যার পরে আলো জ্বালিয়া কামনাগড়া গ্রামের রাস্তা-মেরামত আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি স্বয়ং গাতি ধরিয়া কার্য্য আরম্ভ

করিলে পর এই দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া গ্রামবাসী আরও কতিপয় কুর্ম্মি, আহির প্রভৃতি অধিবাসী নিজ নিজ গাতি কোদাল ধরিল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরিশ্রমের পরে কার্য্য স্থগিত রাখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি আশ্রমাভিমুখে রওনা হইলেন।

কামনাগড়া গ্রাম পুপুন্কীরই পার্শ্বলগ্ন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র এক প্রকার জোর করিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণিকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সেখানেই রাত্রি-যাপন করিলেন। নানাপ্রসঙ্গে পতিতানারীদের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —দিনের পর দিন যে পতিতা-মায়েদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমরাই দায়ী। 'আমরা' বল্‌তে আমি সমগ্র পুরুষ-জাতিকে বুঝাচ্ছি। শত শত অবলাকে কুপথে প্ররোচিত করে কারা? নিরীহ কুলবধূকে কুলের বাইরে টেনে আন্‌বার সহস্র কৌশল বিস্তার করে কারা? অসহায়া বিধবার ধর্ম্ম নাশ করে কারা? এই পুরুষ জাতিই নয় কি? জগতের যত রমণী ধর্ম্মপথ ছেড়ে এসে অধর্ম্ম-পথে পদার্পণ করেছে, অধিকাংশ স্থলে তাদের পাপ-দীক্ষার গুরু হচ্ছে পুরুষেরা। নিজেদের চরিত্রহীনতার জন্য পুরুষ-জাতি নিজেরাই অধম পতিত হ'য়ে আছে, তাদের সংস্পর্শে এলে কেন সরলা নারী পতিতা হবে না? দুশ্চরিত্র পুরুষ নিজের পাতিত্যকে সহজেই গোপন কত্তে পারে এবং কচ্ছেও তাই। এই গোপনতাই তাকে নারীর সচ্চরিত্রতার পক্ষে আরও বিপজ্জনক করেছে। কারণ, তাকে চেনা যায় না, জানা যায় না, তার সম্বন্ধে সাবধান থাকা যায় না।

সামাজিক জীবনাশ্রয়ী নারীর গুপ্ত পাতিত্যও পুরুষেরই দোষে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজ-সংস্কার কত্তে গিয়ে, স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলনের বল বৃদ্ধি কত্তে গিয়ে অনেক সময় দেশহিতৈষী মহাপ্রাণ ব্যক্তিও এই সত্যটাকে বিস্মৃত হয়েছেন। তার ফলে গৃহস্থের নির্ম্মল শান্তিময় সংসারেও গুপ্ত-পথে নারীর পাতিত্য প্রবেশ করেছে। সামাজিক জীবনের আশ্রয় নিয়েও বহু নারী পাপিষ্ঠের প্ররোচনায় সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়েছে। এস্থলেও নারীর এই দুর্ব্বলতার জন্য সে নিজে যত দোষী না হউক, তার চেয়ে শত গুণ দোষী আমরা পুরুষের জাতি, যারা নারীর অভিভাবকত্বের গর্ব্বটুকু ছাড়িনি, অথচ যে শিক্ষা পেলে নারী সহস্র প্রলোভনের মুখে পদাঘাত ক'রে চলে যেতে পারে, সেই শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত রয়েছি।

নারীজীবনে পাতিত্যের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সতীত্ব সম্বন্ধে বহু লক্ষ বৎসর ধ'রে ভারতবর্ষে যে সংস্কারের সাধনা নারীজাতি করেছেন, সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, বেহুলা, পদ্মিনী প্রভৃতির মধ্যে যে সাধনা তার সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা পেয়েছে, তার মুখে পদাঘাত ক'রে ব্যভিচারিণী হওয়া সাধারণ ভারতীয় নারীর পক্ষেও এক অতি অস্বাভাবিক কথা। যে দেশে সতীত্ব-সাধনা নারীমাত্রেরই সহজাত সাধনা, সে দেশে অন্ততঃ এ কথা দৃঢ় কণ্ঠেই বলা যেতে পারে যে, অকারণে কোনো নারী তার সতী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পারে না। কোথাও নারীর সতীত্ব-সংস্কারকে

বিরোধী শিক্ষার বলে ক্ষীণ করা হয়েছে, তবে সে পাপ-জীবনের সঙ্গে নিজের চিন্তাধারাকে খাপ খাওয়াতে পেরেছে। কোথাও নারীর সতী-মর্য্যাদাকে চাকচিক্যশালী প্রবল প্রলোভনের সমক্ষে এনে ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর এবং অদৃশ্য করা হয়েছে, তবে সে বিষকে অমৃত ব'লে আস্বাদন কর্ব্বার জন্য উন্মত্ত হয়েছে, কোথাও বিপদের পর বিপদ, ভীতির পর ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচারের পর অত্যাচার আর জোর, জুলুম, বল-প্রয়োগ করে সতীলক্ষ্মীর কোমরের বস্ত্রখণ্ড আকাশ-বাতাস আর্ত্ত চীৎকারে মুখরিত ক'রে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তবে গিয়ে অসহায়া নারী আত্মরক্ষায় একান্ত অশক্ত হ'য়ে শেষটায় পাপের কাছেই নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। কোথাও ধর্ম্মের নাম ক'রে, ধর্ম্মের ভাণ ধ'রে রাগমার্গ এবং যোগমার্গের নানা অপব্যাখ্যা ক'রে ধীরে ধীরে নারীর সহজ সারল্যের সুযোগে পাপ প্রবেশ করিয়ে তাকে পথভ্রষ্টা করা হয়েছে। এই সমস্ত কারণেই নারীরা পতিতা হয় এবং এজন্য দোষী হচ্ছি আমরা পুরুষ-জাতি।

নারীর পাতিত্য দূরীকরণে পুরুষজাতির চরিত্রবত্তার প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ভারতের সকল স্থানে রাবণ রাক্ষস অবিরত সীতা-হরণ কচ্ছে, কিন্তু আজ বীরাগ্রগণ্য বিষ্ণুবতার শ্রীরামচন্দ্র নেই, জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ নেই, ভগবদ্-ভক্ত হনুমান নেই। সীতার উদ্ধার হবে কি ক'রে? পুরুষ-জীবনে চরিত্র-প্রতিভা ম্লান হ'য়ে গিয়েছে, নারীর মর্য্যাদা রাখ্‌বে কে? নারীর রক্ষক হ'য়ে আজ যারা দেশ-সেবায় ব্রতী হবে,

দীর্ঘকালব্যাপী চরিত্রের সাধনা, সংযমের তপস্যা তাদের নেই ব'লে প্রথম সুযোগেই ত' তারা ভক্ষক হ'য়ে দাঁড়াবে। কোনও বিরোধী শিক্ষাই যাতে নারীর সতীত্ব-সংস্কারকে ক্ষীণ কত্তে না পারে, তার জন্য নারীজাতির উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন। প্রলোভনের ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য তার সতীত্ব-বুদ্ধি ঘুলিয়ে দিতে না পারে, তার জন্য তার কঠোর সাধনার প্রয়োজন। কোনও বিপদ, কোনও আপদ, কোনও অত্যাচার তার প্রাণ-হননের পূর্ব্বে তার দেহকে কলুষিত কত্তে না পারে, তার জন্য নারীর আজ ত্রিলোক-বিস্ময়কারিণী অত্যাশ্চর্য্য তপস্যার প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজনের দাবী পূরণের জন্য যত আয়োজনই আমরা করি না কেন, আমরা নিজেরা যদি হই চরিত্রহীন, তাহ'লে আমাদের সকল শুভ-প্রয়াস অশুভকেই প্রসব কর্ব্বে, আমাদের সকল সদিচ্ছা শুধু অমঙ্গলকেই ডেকে আন্‌বে, শিব গড়্‌তে গিয়ে আমরা শুধু বানরই গড়্‌ব না, সমগ্র জাতিকে ধ্বংস কর্ব্বার জন্য যদুবংশের মূষল সৃষ্টি কর্ব্ব। তাই, সর্ব্বাগ্রে পুরুষজাতির মধ্যে চরিত্রের আন্দোলন ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

চরিত্রের পবিত্রতা ও ভগবৎ-সাধনা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রের পবিত্রতা-রক্ষা সঙ্কল্পের দৃঢ়তার উপরে নির্ভর করে। যার সঙ্কল্প যত গভীর, সে তত বড় প্রলোভনের মুখ থেকে জয়ী হ'য়ে ফিরে আস্‌তে পারে। কিন্তু সঙ্কল্পকে দৃঢ় করারও উপায় আছে। সে উপায় হচ্ছে, অকপট ভগবৎ-সাধনা। বাহ্যাড়ম্বর বর্জ্জন ক'রে নীরব

আকুলতায় যে ভগবানের নাম-সাধনা করে, তার জীবনে সংযম ও সৎসঙ্কল্প স্বাভাবিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৬

দারুণ গ্রীষ্মে

কি কষ্ট সহিয়া যে শ্রীশ্রীবাবামণি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা বন কাটিয়া আবাদ করিয়াছেন, পাথরের মত শক্ত মাটি খুঁড়িয়া কৃষি-ভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, হয়ত একদিন ভবিষ্যতের কর্ম্মীরা তাহা ধারণায়ও আনিতে পারিবেন না। তাই, এস্থলে দারুণ গ্রীষ্মের কয়েকটী চিত্র সন্নিবেশিত করিব।

(১)

এক দিবস সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করা হইয়াছে তারপরে আবার বাঁধের (পুকুরের) বড় বড় পাথর কুড়াইয়া সরান হইয়াছে প্রায় রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত। ঘরে এক বিন্দু জল নাই। সকলে মিলিয়া এক একটা বাল্‌তি হস্তে কিঞ্চিদধিক সিকি মাইল দূরবর্ত্তী জোড়ে (শুষ্ক ঝরণা—মাটি খুঁড়িয়া জল বাহির করিতে হয়) যাওয়া হইল। একজন কর্ম্মীর গুরুতর বুকের ব্যথা। এই ব্যথা লইয়াই তাঁহাকে বালতি লইয়া যাইতে হইল। না যাইয়া উদ্ধার কি? রান্নার বাসন-কোশনও ত' ঐ দূরবর্ত্তী জোড়ে নিয়াই ধুইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পথে বিশ্রাম করিয়া করিয়া আশ্রমে ফিরিতে রাত্রি ৮॥০ ঘটিকা হইল। এমন সময় আশ্রমে একজন অতিথি আগমন করিলেন। একে অতিথি, তাহাতে ক্লান্ত, কি করিয়া তাঁহাকে বলা যায় যে,

চল ঐ জোড়ে হাত-পা ধোও। অতিথি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, এখানকার জলকষ্ট যে কি ব্যাপার, তাহা জানেন না। অতএব কৃপণের মত দিলেও জলের খরচ কিছু অতিরিক্ত হইল। সুতরাং চল পুনরায় জোড়ে। রাত্রি সাড়ে এগারটায় আহারীয় প্রস্তুত হইল। সে আহারীয় বস্তুর বিবরণ না দিলেও চলিবে, কারণ অর্থাভাবহেতু আশ্রমবাসীদের এক একজনের দৈনিক খোরাকীর বরাদ্দ সাড়ে ছয় পয়সা হইতে সাড়ে নয় পয়সার মধ্যেই নিয়ত বিচরণ করিতেছে। যাহা হউক, ভোজন-সমাপনের পরে সকলে শয়ন করিলেন। কিন্তু চ'খের পাতা লাগিয়া আসিতে না আসিতেই এক পাল মহিষ আসিয়া কুটীরের খড় টানিয়া টানিয়া খাইতে লাগিল। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত মহিষ তাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে কুটীরের খড় মহিষের নামে উৎসর্গ করিয়াই নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইতে হইল।

(২)

আর এক দিবস সারাদিন আশ্রমের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আহার করিয়া গাতি, কোদাল, শাবল, ছেনী, হাতুড়ী প্রভৃতি লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা চিকশিয়া গ্রামের (প্রায় পৌনে দুই মাইল দূর) পর্ব্বত-প্রমাণ পাথর কাটিয়া সমতল করিবার জন্য রওনা হইবেন, এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী বনভূমির মধ্যে তীব্র আলোক সমীপবর্ত্তী হইতেছে দেখা গেল। বুঝা গেল, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একখানা মোটর-গাড়ী আশ্রমের দিকে আসিতেছে। মোটর আসিয়া আশ্রম-সীমায় থামিল; হাতুড়ী হস্তে শ্রীশ্রীবাবামণি পুরোবর্ত্তী হইয়া আরোহীদের অভ্যর্থনা করিলেন। দেখা গেল, পুরুলিয়ার হেল্‌থ-অফিসার

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেন, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র মজুমদার এবং পুরুলিয়ার একজন সরকারী ডাক্তার আশ্রম-দর্শনে আসিয়াছেন।

সুবোধবাবু বলিলেন,—এ সময়ে শাবল, গাতি, হাতুড়ী এ সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোন্ দিকে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—সিঁদ কাটতে! তবে, দে'খে যখন ফেলেছেন, তখন আপনাদিগকেও আমাদের accomplice (কুকর্ম্মের সঙ্গী) হ'তে হয়, নইলে সিঁদ কাটা বন্ধ থাকে।

গিরিশবাবু বলিলেন,—সিঁদ কাটার রকমটা একটু বুঝিয়ে বলতে হয়, তবে ত' বুঝতে পারি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আগে একটু বিশ্রাম করুন, জলযোগ করুন, তারপরে বলা যাবে।

জলযোগের কথা শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন বটে কিন্তু কি দিয়া জলযোগ করান হইবে, তাহা পরমাত্মাই জানেন। পুপুনকী গ্রাম প্রায় এক মাইল দূর। তাও আবার গ্রামের দোকানে সব সময় সূজি, চিনি মিলে না। আর যদিও বা মিলে তবু আশ্রমের এত ধার হইয়া গিয়াছে যে, এই সময়ে চাহিলে দিবে কি না, কে জানে ?

কিন্তু আগন্তুকেরা জলযোগে অস্বীকৃত হইলেন, কারণ পুরুলিয়া হইতে তাঁহারা সকলেই গুরুভোজন করিয়া রওনা হইয়াছেন, সকলেরই মন্দাগ্নি। শ্রীশ্রীবাবামণি তাড়াতাড়ি জনৈক ব্রহ্মচারীকে পুপুনকী গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, কারণ আহারীয় বস্তুর অপ্রাচুর্য্য ছিল। অপর দুই জন কর্ম্মী জোড়ে জল আনিতে গেলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চিকশিয়া গ্রামের লোকগুলিকে কিছুতেই রাস্তা তৈরীর কাজে লাগাতে পাচ্ছি না। নির্দ্দিষ্ট দিন ঠিক্ ক'রে আসি, কিন্তু ঠিক সেই দিনটাতে গ্রামের শ্রমক্ষম ব্যক্তিগুলি ভিন্ন গ্রামে যায়, হাটে যায়, মামাবাড়ী যায়, শ্বশুর-ঘর যায়। ফলে আশ্রমের আমরাই ঐ কঠিন উঁচু উঁচু পাথরগুলি ভাঙ্গতে আরম্ভ করি, দু-একটী গ্রাম্য লোক নিতান্ত লজ্জার দায়ে যদি এল ত' এল।

গিরিশবাবু বলিলেন,—ইহাই এই দেশের ধাত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমিও ঢাকাই বাঙ্গাল, খাস বিক্রমপুরের ছেলে, আজ আমি চাণক্যপন্থী হ'য়েই কাজ কর্ব্ব। আজ আমি যে যাচ্ছি, গ্রামে সে খবর জানাই নাই।

তখন সুবোধবাবুর মোটরে বহু যন্ত্রপাতি বোঝাই করা হইল এবং সকলে মোটর-যোগে চিকশিয়া গ্রামে পৌছিলেন। গ্রামের বাহিরে মোটর রাখিয়া সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। ভদ্রলোকদিগকে একটা নিভৃত স্থানে বসিতে বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি গ্রামের তরুণ-কর্ম্মী হরদয়াল শর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোদের গ্রামের অল্পবয়স্ক ছেলেদের একটু ডেকে দে ত'!

শ্রীশ্রীবাবামণির নাম করিতেই পঙ্গপালের ন্যায় ছেলেরা আসিয়া জুটিল। কারণ, বৈষ্ণবেরা যেমন রাধা ছাড়া কৃষ্ণ ভাবিতে পারেন না, এতদ্দেশের ছেলেরা চিনাবাদাম আর মিষ্টি আলু ছাড়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে ভাবিতে পারে না। এই দুইটী বস্তু শ্রীশ্রীবাবামণি মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়া কিশোর-বয়স্কদের প্রাণাধিক প্রিয় হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি ডাকিয়া বলিলেন,—আজ তোদের একটা কাজ কত্তে হবে।

সবাই জিজ্ঞাসা করিল,—কি কাজ ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু হৈ হৈ কত্তে হবে। যে বাড়ীটা আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিব, সেই বাড়ীতে ঢুকে হৈ হৈ চীৎকার কত্তে হবে। কেমন, রাজি ?

রাজি আর নয় ? চিকশিয়া নিতান্ত ছোট গ্রাম নহে, প্রায় চল্লিশটী ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণির প্রস্তাব শুনামাত্র সকলে ভীষণ হৈ হৈ করিয়া তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি এক বাড়ীর দুয়ারে গিয়া বাড়ীর মালিকের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া গৃহস্বামী তার স্ত্রীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, সে ঘরে নাই। তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বালকদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ইঙ্গিত করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বালকের দল গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তুমুল কোলাহলে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। গৃহস্বামী কিছুতেই গোল থামাইতে না পারিয়া পরিশেষে লাঠি লইয়া বালকদিগকে তাড়া করিল। যষ্টিধারী ক্রুদ্ধ-মূর্ত্তি বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীশ্রীবাবামণিকে দেখিয়া থমকিয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবামণি তাহার হাতে ধরিয়া বলিলেন,—চল বাবা, রাস্তার পাথর ভাঙ্গ্‌তে, তোমার গ্রামের পথ তুমি না তৈরী কর্ল্লে কি ক'রে হবে ?

গৃহ-স্বামী ওজর দেখাইল, তাহার গাইতের মুখটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার জন্যে ভাবনা কি ? আশ্রম থেকে আমি এক মোটর বোঝাই ক'রে হাতুড়ী, শাবল ও গাইত নিয়ে এসেছি।

এইভাবে গৃহের পর গৃহ আক্রমণ করিয়া তুমুল কোলাহলের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় পঞ্চাশ জন গ্রামবাসীকে লইয়া আসিলেন।

যথাসময়ে রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হইল। বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা ছেনী আর হাতুড়ী দিয়া পাথর টুকরা করিতে লাগিল, অপরাপরেরা গাইতের সাহায্যে কাজ করিতে থাকিল। কেহ কেহ খণ্ডীকৃত পাথর সমূহ কোদালী দ্বারা স্থানান্তরিত করিতে নিযুক্ত হইল।

এইভাবে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত কাজ করিবার পর সকলে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। অতিথিদের আহারের পরেও তাঁহারা শয়ন করিতে চাহেন না। অথচ সমগ্র দিন আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবামণিকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অতিথিগণ পল্লী-সংস্কারের এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, কথার পর কথায় রাত্রি তিনটা হইল। তখন শ্রীশ্রীবাবামণি এক প্রকার জোর করিয়াই তাঁহাদিগকে শয়ন করাইলেন। কুটীরের খড়ের ছাদন বিনষ্ট-প্রায় অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। সুতরাং কুটীর-মধ্যেই সুনীল উন্মুক্ত আকাশের চন্দ্র-তারকার শোভা দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা নিদ্রাগত হইলেন। কিন্তু চিকশিয়া পৌছিবার সময়েই শ্রীশ্রীবাবামণি যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন, এতক্ষণের কর্ম্মের কোলাহলের এবং আলোচনার প্রাবল্যে তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তৃষ্ণায় অধীর হইয়া উঠিলেন। কলসী খুঁজিয়া দেখিলেন জল নাই। পাইখানার যাইবার মগে শেষ রাত্রের প্রয়োজনে জল রক্ষিত হইয়াছিল। তাহা আর পান করা চলে না। সুতরাং বাল্‌তি হাতে ছুটিলেন অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী সেই শুষ্ক ঝরণার পানে। হায়রে তৃষ্ণা, আর হায়রে জল!

(৩)

একদিন মাইল তিনেক দূরবর্ত্তী কোনও স্থান হইতে আশ্রমের এক হিতৈষী বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময়ে উপযুক্ত আচ্ছাদনী-বিশিষ্ট এক গো-যানে আশ্রমে উপনীত হইলেন। আশ্রমে পৌছিয়া তিনি রৌদ্রের প্রচণ্ডতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বিশেষ কিছু বলিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন মাত্র। কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহর হইতেই আশ্রমের খড়হীন চালার মধ্য দিয়া তীব্র সূর্য্যরশ্মি কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন প্রত্যেককে নিজ নিজ ছাতা খুলিয়া আহারে বসিতে হইল।

আগন্তুক বলিলেন,—তাই ত'! সমুদ্রে শয়ন করিয়াও আপনারা একটুখানি চঞ্চল হন না, আর আমরা শিশির-বিন্দু দেখিলেও ভয় পাই!

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—উপমাটা ঠিক হইল না। বরং বলুন—''সর্ব্বাঙ্গে পেট্রোল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলেও আপনারা উহু শব্দটী করেন না, আর আমরা গরম লুচি খাইতেই ভয় পাই।''

(৪)

একজন আগন্তুক আশ্রম-দর্শনে আসিয়াছেন। সহজেই তাঁর হৃদয়ঙ্গম হইল যে, কঠোর কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়াই আশ্রমকে চলিতে হইতেছে। তবু তিনি বলিলেন,—দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়াই ভগবানের কাজ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ কথা যথার্থ।

কিছুক্ষণ পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে সহসা প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল।

আশ্রম-কুটীরের চালার খড় ছিন্নবিছিন্ন করিয়া শিলাবৃষ্টি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। কুটীর-মধ্যে বোধ হয় এক ইঞ্চি পরিমিত স্থান বা এক আঙ্গুল পরিমিত বস্ত্রও শুষ্ক রহিল না। প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা প্রবল বর্ষণের পর অনেক রাত্রিতে বৃষ্টি থামিল।

আগন্তুক তখন শীতে কাঁপিতেছেন, হাতে পায়ে কন্‌কনানি ব্যথা উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন,—তাই ত! আপনাদিগকে যে এত কষ্ট ভুগিতে হয়, তাহা ত' বুঝিতে পারি নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—এই জন্যই ভগবান্ এই দারুণ গ্রীষ্মে অপ্রত্যাশিত বর্ষা দিয়ে তা বুঝিয়ে দিলেন।

(৫)

দ্বারিকা গ্রাম আশ্রম হইতে প্রায় দুই কি আড়াই মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইতঃপূর্ব্বে একদিন রজনীযোগে উক্ত গ্রামের রাস্তায় কতক পাথর ভাঙ্গিয়া আসা হইয়াছে। আজ সমগ্র দিন আশ্রমের বাঁধে কঠোর পরিশ্রম গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় দ্বারিকা হইতে দুইটী বালক শ্রীশ্রীবাবামণিকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দাঁড়া, আহার ক'রে নিই।

দুই টুকরা রুটী ও খানিক অড়হরের ডাইল উদরস্থ করিতে করিতেই ক্লান্তিতে শ্রীশ্রীবাবামণি উপবিষ্টাবস্থায় কতক্ষণ ঘুমাইয়া লইলেন। তন্দ্রা ঘুচিলে আহার সমাপন করিয়া জনৈক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলেন। কিন্তু চারি পাঁচ শত পদ যাইতে না যাইতেই শরীর আবার ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। একটা পলাশ গাছের নীচে গামছা বিছাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন।

পথে এই ভাবে দুই তিনবার থামিয়া থামিয়া যখন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া প্রান্তরে পড়িলেন, তখন শরীরে নববল ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দ্বারিকার রাস্তার কাজ সমাপন করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি গভীর রাত্রিতে যখন আশ্রমে ফিরিলেন, তখন সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী বুকের বেদনায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

(৬)

আর একদিন প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি চৌবাচ্চা গাঁথিতেছেন। সহসা প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করিলেন। কথা কহিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, বাকশক্তি নাই, কারণ কণ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইঙ্গিতে জলের জন্য ব্যাকুলতা জানাইলে শ্রীযুক্ত বরদা কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে কলসীর অবশিষ্ট জলটুকু সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গিয়াছে, কলসীগুলি সব প্রতপ্ত হইয়া রহিয়াছে। শাবল, গাইত আর বালতি লইয়া বরদা জোড়ের পানে ছুটিলেন। কিন্তু এখন আর শুধু বালু খুঁড়িলেই জল মিলে না, পাথরও খুঁড়িতে হয়। শ্রীযুক্ত বরদার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গান্ধার যোগেন বাবু আশ্রমে যে দালানখানা করিয়া দিতেছেন, তাহার কাজে নিয়োজিত কেওট মজুরাণীরা অনেকক্ষণ পূর্ব্বে জলের জন্য জোড়ে গিয়াছিল। তাহারা কাঁখে কলসী লইয়া ফিরিতেই বাক্‌ শক্তিহীন শ্রীশ্রীবাবামণি একজনের হাত হইতে কলসী টানিয়া নিয়া উদর-পূর্ণ করিয়া জলপান করিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রবল সর্দ্দি হইয়া জ্বর আসিল, কুড়ি বাইশ দিন ভুগিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি অন্ন-পথ্য করিলেন।

(৭)

আর একটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা পুপুনকীর গ্রীষ্ম ক্লেশ বর্ণনায় ক্ষান্ত দিব। বাঁধ-খননের শ্রমে সকলেই অত্যধিক ক্লান্ত। বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে আহারীয়ের ক্লেশটা গিয়াছে। জোড় অনেক দূর বলিয়া পথশ্রম কমাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প দূরবর্ত্তী ''মুচিয়ার বাঁধে'' (পুকুর) হস্তপদমুখাদি প্রক্ষালনের জন্য ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেহে সকলে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু হায়, এই কদর্য্য, কর্দ্দমাক্ত, দুর্গন্ধ ও দূষিত জল পান করা যে অসম্ভব! শ্রীযুক্ত প্রবোধ ফিরিয়া জোড়ের দিকে চলিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া বাঁধের পাড়েই শুইয়া পড়িলেন। একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া দেখেন, শ্রীশ্রীবাবামণি সংজ্ঞাহীন। ঘণ্টা দুই কাল এই ভাবে অতিক্রান্ত হইবার পরে তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অতি কষ্টে আশ্রম-প্রাঙ্গণে পৌছিয়াই একটুখানি জলপান করিয়া পুনরায় তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ যে এক বাল্‌তি জল জোড় হইতে আনিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে রন্ধন-শেষ হইল। শায়িত অবস্থায়ই শ্রীশ্রীবাবামণি হস্ত দ্বারা রুটী ছিঁড়িতে অসমর্থ হইয়া একদিকের দাঁতের দ্বারা চাপিয়া অপর দিক দুই হাতে ধরিয়া টানিয়া রুটী ছিঁড়িলেন। কিন্তু তখন চিবাইয়া খাইবার সামর্থ্যও দন্ত-পংক্তিতে নাই। বালিশে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে জিহ্বায় চুষিতে চুষিতে কোনও ক্রমে অর্দ্ধেকখানা রুটি আহারের পর শ্রীশ্রীবাবামণি মাথা তুলিয়া বাকী অর্দ্ধেকখানা রুটী উদরস্থ করিলেন। এইরূপ অবস্থায় আরও একখানা রুটী আহারের পরে শ্রীশ্রীবাবামণির শরীরে বল ফিরিয়া আসিল

এবং তিনি যথারীতি আহার সমাপন করিলেন। কিন্তু রন্ধনের পরে যে জলটুকু বাঁচিবার কথা ছিল, শ্রীশ্রীবাবামণির চ'খে মুখে, হাতে পায়ে দিতেই তাহা ব্যয়িত হইয়াছে। সুতরাং জলাভাব-বশতঃ সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত কর্ম্মীরা আপন আপন খাদ্য লইয়া দূরবর্ত্তী সেই জোড়ের তীর লক্ষ্য করিয়া রওনা হইলেন। উদ্দেশ্য, সেখানে বসিয়াই আহার, জলপান ও বাসন পরিষ্কারের কার্য্য সমাপ্ত করিবেন। রাত্রি তখন এগারটা।

কাশীধাম,

৮ই বৈশাখ, ১৩৩৬

জনৈক ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীবাবামণি কাশীধামে আসিয়াছেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা হইতেছে।

স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক নিষ্ঠা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীজাতির আশ্চর্য্য শক্তির উপরে আমার বিশ্বাস অফুরন্ত। কেন জান ? স্ত্রীজাতির ভিতরে নিষ্ঠা, একটা সত্যকে, একটা পথকে দীর্ঘকাল আঁকড়ে ধ'রে থাকার ক্ষমতা পুরুষের চাইতে অনেকগুণ বেশী। "বদলে গেল মতটা, ছেড়ে দিলাম পথটা,"—এর দৃষ্টান্ত নারীর জীবনে খুব কম পাওয়া যায়। সহজে হয়ত সে কোনও মতকে বা পথকে গ্রহণ কর্ব্বে না কিন্তু একবার যখন কাউকে গ্রহণ কর্ব্বে, তখন সে তার কাছে একেবারে অকুণ্ঠিত বশ্যতায় পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। তারপরে আর শত যুক্তি, সহস্র বাধা, লক্ষ বিঘ্ন, নিযুত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাকে তার নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত কত্তে পার্ব্বে না।

স্ত্রীজাতির ধর্ম্মবিষয়িণী নিষ্ঠা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীর জীবনে একটা ধর্ম্মমত বা ধর্ম্ম-সংস্কার প্রবিষ্ঠ ক'রে দাও, সেই সংস্কারকে পুষ্ট হবার জন্য সামান্য কিছু দিনের সময় দিয়ে তুমি নিজেই যদি সে মতকে ভাঙ্গতে যাও, দেখবে, তোমার সহস্র পাণ্ডিত্যের হাতুড়ী তার বিশ্বাসের পাথরে ঠেকে ঠিক্‌রে ফিরে আস্‌ছে। পুরুষ কাল্পনিকতা ও দার্শনিকতার সহায়তায় গৃহীত মত ও পথকে বিচার ক'রে যতক্ষণে শতবার পরিত্যাগের চেষ্টা কচ্ছে, নারী তার স্বভাবজাত নিষ্ঠার শক্তিতে নিতান্ত তুচ্ছ পথের অবলম্বনেই ততক্ষণে আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিসমূহ প্রত্যক্ষ আস্বাদন কচ্ছে। যেখানে নারী কিছুদিন বিনা বাধায় ধর্ম্মাচরণ করার সুযোগ পেয়েছে, সেইখানেই দেখতে পাবে, পুরুষদের চাইতে অনেক দ্রুততার ভিতরে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাগুলি প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছে।

স্ত্রীজাতির সাহসিকতায় নিষ্ঠা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লজ্জাশীলতার খ্যাতি ত' নারীর চির-প্রসিদ্ধ। লাঠি মেরেও এ লজ্জা কেউ ভাঙ্গতে পারে না, স্ত্রী-চরিত্রে এটা এত বড় একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোথায় লজ্জাশীলতা পাপ, নির্ল্লজ্জ নির্ভীকতা কোথায় ধর্ম্ম, একথা একবার একটি নারীকে যদি ঠিক্ ঠিক্ বুঝিয়ে দিতে পার, দেখ্‌বে, রণক্ষেত্রে সেনা-বাহিনী পরিচালনে সে সমুদ্রগুপ্ত বা আলেকজাণ্ডারের চাইতে কম নয়। দেখ্‌বে, শত সহস্র বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের সমক্ষে সে দ্বিধায় ঢ'লে পড়ে না, অবগুণ্ঠন

টেনে লুকায় না। সাহসের সত্যকে নিজের জীবনে গ্রহণীয় ব'লে একবার স্বীকার কর্ল্লে, অবলা নারীও নিমেষের মধ্যে সিংহবাহিনীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এবং সে সাহসিকতা প্রতিক্রিয়ার পথে আর কখনও ভীরুতায় পরিণত হয় না। নারী যখন সাহসের দীক্ষাকে নিজের জীবনে গ্রহণ করে, তখন তাকে তার সমগ্র চরিত্রে স্থায়ী সম্পদরূপেই গ্রহণ করে।

সংযম-নিষ্ঠায় নারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সদ্‌গুরুর উপদেশে নবীন দম্পতী যখন ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্পকে গ্রহণ করে, তখন দেখা যায়, সে ব্যাপারে পুরুষের উৎসাহটাই অত্যধিক, নারী উদাসীন বা আত্মবিস্মৃত বা ভাগ্যগুণে ক্বচিৎ কদাচিৎ দু-এক ক্ষেত্রে অতি সামান্য উল্লসিত। কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য পালনের পরে ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্ব, তার মর্ম্মকথা যতই নব-বিবাহিতা পত্নীর নিকটে প্রকাশ পেতে থাকে, তার ব্রত নিষ্ঠা, সংযমানুরাগ ততই বর্দ্ধিত, ততই প্রগাঢ় হ'তে থাকে। বিবাহের পরে কেউ এক বৎসরের জন্য, কেউ তিন বছরের জন্য, কেউ ছয় বছরের জন্য, কেউ দশ বছরের জন্য, অতি ভাগ্যবান্ দুই চার জন বারো বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ব্রত-ত্যাগের জন্য আকুলি-বিকুলি পুরুষের মধ্যেই আগে জাগে, আর নারী তার অসামান্য ধীরতা ও কৌশলের বলে অনায়াসে হাস্‌তে হাস্‌তে নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ ক'রে চ'লে যায়। অন্য সময়ে নারীর আভ্যন্তরীণ মূর্ত্তি যাই হোক্ না কেন, সংযমের ব্রত গ্রহণ করার পরে সে তার অসামান্য নিষ্ঠার শক্তিতে পুরুষের চাইতে অনেক বড়, অনেক মহৎ।

নারীর উন্নতিই জাতীয় উন্নতির মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই সব দেখেই আমার সুদৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, পতিত ভারতকে যদি অভ্যুদয় দিতে হয়, পরমুখাপেক্ষী নির্জ্জীব ভারতকে যদি সজীব ও স্বাবলম্বী কর্ত্তে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে কাজ আরম্ভ হওয়া চাই এই মায়ের জাতির ভিতর দিয়ে। কবি দ্বারকানাথ বলেছেন,—"না জাগিলে যত ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না"—সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কাউন্সিল-গৃহের সহস্র তর্ক-বিতর্কে যা হবে না, এক একটা নারী-প্রতিষ্ঠান সকলের চক্ষের অগোচরে থেকে তার সহস্র গুণ সত্যিকার পরিবর্ত্তন দেশ-মধ্যে আনয়ন কর্ত্তে সমর্থ হবে। শিক্ষা, সাধনা ও সত্যানুসরণের যে সুযোগ আজ অধিকাংশ নারীর নিকটেই দুর্ল্লভ, তাকে যদি কোনও প্রকারে সুলভ ক'রে তোলা যায়, কটাক্ষের মধ্যে ভারতের শ্রী ফিরে যাবে, অতীতের গ্লানি ইতিহাসের বুক থেকে ধুয়ে মুছে যাবে।

পুরুলিয়া,

১২ই বৈশাখ, ১৩৩৬

অদ্য সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবাবামণি ঝালিদা জেলা-সম্মিলনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে রওনা হইয়া আশ্রম হইতে সন্ধ্যার পরে মোটর-বাস-যোগে পুরুলিয়া আসিয়া পৌছিলেন। মোটর দাঁড়াইবার জায়গায় দুইজন অনুরাগী ব্যক্তির সহিত দেখা হইল। তাঁহারা শ্রীশ্রীবাবামণিকে আগে নিয়া কিছু আহার করাইলেন। তৎপর

আলোচনা আরম্ভ হইল। উভয় ব্যক্তিই পরস্পরের প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান্, কিন্তু একটী বিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ বর্ত্তমান।

অবনত শ্রেণীর উন্নয়নে উন্নত শ্রেণীর কর্ত্তব্য

প্রথম ভদ্রলোক বলিলেন,—ভূমিহারেরা ব্রাহ্মণই নহে, উহারা মাগধ, এই জন্যই উহাদিগকে 'মঘয়া' বলে। আর যদিও উহারা ব্রাহ্মণ হইয়াই থাকে, তাহা হইলেও অতি নিকৃষ্ট পতিত ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে আছে ''মাগধাঃ কীটকাশ্চৈব'' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক তীব্র ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিলেন।

পরস্পরের মধ্যে কিছুক্ষণ যুক্তি-বিনিময়ের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবনত কোনও সম্প্রদায় যখন উন্নত হ'তে চায়, তখন তাতে কারো বাধা দেওয়া উচিত নয়। বরং উচ্চ-শ্রেণীর লোকদেরই স্বেচ্ছায় এসে অবনতকে টেনে তোল্‌বার আয়োজন করা উচিত। অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার কচ্ছি যে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পতিতের উত্থান-মূলক যত আন্দোলন পরিচালিত হ'য়েছে, প্রায় সবগুলিরই নেতা উন্নত সম্প্রদায়ের লোক। অপৈতক জাতি যদি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ক'রে ব্রাহ্মণ্যের সংস্কার লাভ কত্তে চায়, তার সঙ্গে বিরোধ করা নিষ্প্রয়োজন এবং অনেক সময়ে অমঙ্গলজনক। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করার উদ্দেশ্য যার সাত্ত্বিক আত্মশুদ্ধি, সে ত' ঠিক্ কাজই কচ্ছে; তাকে বাধা দেওয়া আর সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করা এক কথা। আর, রাজসিক দম্ভের প্রেরণায় বা তামসিক স্পর্দ্ধায় যে ব্যক্তি পবিত্র যজ্ঞসূত্রকে অনধিকারী হ'য়েও স্কন্ধে বহন কর্ত্তে চায়, তাকে বাধা দেওয়া নিতান্তই নিরর্থক, যে হেতু ঐ

যজ্ঞসূত্র তার পক্ষে কাপট্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগত কপটাচার ব্যক্তিকে ধ্বংস করে, জাতিগত কপটতা জাতিকে নির্ম্মূল করে। যে সম্প্রদায় যে ভাবে নিজেকে উন্নত কর্ত্তে চায়, করুক। উন্নত-সম্প্রদায়-সমূহের কর্ত্তব্য অনুন্নতদের উন্নতিতে সহায়তা করা, সৎপ্রয়াসে উৎসাহ দান করা, তনু, মন, ধন দিয়ে সাহায্য করা।

অভ্যুদয় লাভের জন্য অবনত শ্রেণীর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু উন্নতি-প্রয়াসী অবনত শ্রেণীকেও নিজের চরিত্র ও ব্যবহার বিচার ক'রে দেখ্‌তে হবে। উন্নত সম্প্রদায়গুলিই এতদিন তাদের বড় হ'তে দেয় নি, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদের অন্তর থেকে আগে দূর কর্ত্তে হবে। তাদের আরো জান্‌তে হবে যে, উন্নত সম্প্রদায় যদি অবনত-শ্রেণীর অভ্যুদয়-লাভে স্বেচ্ছায় এসে সহায়তা না করে, তা হ'লে বিদ্বেষ-প্রচার আর গালাগালির জোরেই তাদের সমর্থন পাওয়া যাবে না। নিজের অবনতির জন্য নিজেকে দায়ী করার মতন সৎসাহস যার নেই, প্রকৃত উন্নতির সে কখনও অধিকারী হয় না। তুমি অনুন্নত তোমার নিজের দোষে, নিজের আলস্যে, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায়। উচ্চবর্ণের লোকদের নিন্দায় বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে প্রাণপণ যত্নে নিজের দোষগুলিকে সংশোধন কর। বড় হবার এইটীই পথ।

সমাজ-সংস্কার ও অনধিকার-চর্চ্চা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—সমাজ-সংস্কার জিনিষটা অতি সরল, অতি সোজা। এটা জটিল ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে শুধু

মানুষের অনধিকার চর্চ্চায়। কোনও নিম্ন-শ্রেণীর লোক যদি উচ্চবর্ণের পুরোহিত দিয়ে বিবাহ, পূজা ও শ্রাদ্ধাদির মন্ত্র-পাঠ না করায়, নিজেই যদি তা' করে, করুক, তার ভাল-মন্দ সেই ভুগ্‌বে। এখানে নিম্ন শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচ্চশ্রেণীর লোকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় অনধিকার-চর্চ্চা। আবার উচ্চসম্প্রদায়ের লোক যদি তার বিবাহ-যোগ্যা মেয়েটীকে স্বেচ্ছায় এনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে না চায়, তাহ'লে বারংবার কর্কশ কণ্ঠে সেই দাবী জানাতে যাওয়াও অনধিকার-চর্চ্চারই পরাকাষ্ঠা। মাদ্রাজের অব্রাহ্মণরা ত' ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে করার পাঁতি পাবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত গালি দিতে কসুর করে নাই। প্রত্যেক শ্রেণীকে জান্‌তে হবে যে, অপর শ্রেণীর ন্যায্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তার পক্ষে অপরাধ।

ঝালিদা,
১৩ই বৈশাখ, ১৩৩৬

মানভূম জেলা-সম্মিলন উপলক্ষ্যে নানা স্থান হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমাগত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীশ্রীবাবামণির অলোক-সামান্য অধ্যবসায় ও অভিক্ষা-নীতির কথা শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। কিন্তু তাঁহারা শ্রীশ্রীবাবামণিকে কখনও দর্শন করেন নাই। আজ শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত পরিচিত হইয়া, সকলেই আনন্দ, গৌরব ও সৌভাগ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

প্রকৃত শ্রোতা ও তাহার সংখ্যাল্পতার কারণ

মানভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি আজ বক্তৃতা দেবেন ত'?

শ্রীশ্রীবাবাণি বলিলেন,—আজ্ঞে না, বক্তৃতায় আনন্দ পাই না।

নীলকণ্ঠবাবু বলিলেন,—সে কি কথা? আমি ত' শুনেছি, আপনি যখন বক্তৃতা দেন, তখন নাকি প্লাবনের জলের মত বহ্নি-প্রবাহ বইতে থাকে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শ্রোতা কই?

নীলকণ্ঠবাবু বলিলেন,—কেন আজ ত' ঝালদাতে প্রায় পনের হাজার লোক জড় হয়েছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা হয়েছে, কিন্তু এরা শ্রোতা কি না, তদ্বিষয়ে আমি কৃতনিশ্চয় হইনি। শ্রোতা বল্‌তে সাধারণ লোকে যা বোঝে, আমি ঠিক তাই বুঝি না। বক্তার মুখ থেকে যে বাণী বেরুবে, তাকে হৃদয়-ফলকে গেঁথে রাখ্‌বার প্রেরণা নিয়ে যারা আসে, বক্তার প্রত্যেকটী বাক্যকে নিজের জীবনে মূর্ত্তিদান করার সঙ্কল্প নিয়ে যারা আসে, তারা শ্রোতা। যারা শুধু বাদ-প্রতিবাদ শুন্‌তে আসে, আমার মতে তাদের নাম হচ্ছে কৌতূহলী জনতা। সত্যিকার শ্রোতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই তাকে জীবনের পন্থা-নির্ণয় সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান প্রদান করে। শ্রোতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার নিষ্ঠা। সাধারণ শ্রোতা বক্তার বক্তৃতা শুনে হয়ত তার ভাষার তারিফ ক'রেই কর্ত্তব্য সমাপন করে, কেউ বা এক একটা পথ 'ধরে আর

ছাড়ে, প্রতি যুদ্ধে হারে।' কিন্তু সত্যিকার শ্রোতা যে পথকে ধরে, সে পথ আর ছাড়ে না, বিঘ্ন, বিপত্তি, বজ্রপাত যাই হোক্ না, 'বদ্‌লে গেল মতটা, ছেড়ে দিলাম পথটা' করে না।

প্রশ্ন।—এ রকম শ্রোতা আপনি এখন পাবেন কোথায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এখন না পাই, ভবিষ্যতে পাব। আমি না পাই, আর কেউ পাবেন। মানুষের জীবন থেকে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা, ইন্দ্রিয়-সংযমের সাধনা, আত্মশোধনের সাধনা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। তাই বাদ-প্রতিবাদের মধ্য থেকে খাঁটি সত্যটুকু সে বেছে নিতে পারে না। আর, সত্যের অমৃত তার সমক্ষে পরিবেশিত হ'লেও পূর্ণাস্বাদনের জন্য যে শ্রম ও সহিষ্ণুতাটুকু প্রয়োজন, তা' না ক'রে সে চালাকি দিয়ে কেল্লা ফতে কত্তে চায়।

আন্দোলনের গোড়ায় গলদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের প্রত্যেকটী উন্নতি-প্রয়াসী আন্দোলনে এইখানেই গোড়ায় গলদ। অগঠিত-চরিত্র, প্রচ্ছন্ন অব্রহ্মচারী, সংযমের তপস্যায় অনভ্যস্ত ছেলেদের টেনে এনে আমরা জাতীয় তপস্যার হোতা, ঋত্বিক ও আহুতি কত্তে চাচ্ছি, অথচ এই খেয়ালটুকু আমাদের হয় না যে, সংযমের সাধনা অপরাপর সকল সাধনারই ন্যায় জাতীয় সাধনার পক্ষেও অপরিহার্য্য। বলতে কি একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত অপরাপর অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় নেতাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠাকে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করেন। এই সেদিন বাঙ্গলার এক ধুরন্ধর নেতা প্রকাশ্য জন-সভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন,—"ত্যাগ কখনো ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ হ'তে পারে না। যুবকগণ, তোমরা ভোগবাদের

উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ভোগ-পিপাসার দারুণ প্রণোদনায় সমাজের সকল বন্ধন ভেঙ্গে চুরে নরনারীর মধ্যে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা কর।" কি ভ্রম! ভোগলালসায় যে অন্ধ, সে সামাজিক সাম্য কি ক'রে প্রতিষ্ঠা কর্ব্বে ? তার স্বার্থবুদ্ধিই ত' সকল সাম্যকে বিধ্বস্ত ক'রে দেবে! তার সকল সদ্বুদ্ধি যে প্রবৃত্তির উদ্দাম স্রোতেই ভেসে যাবে! তার দেশসেবা ত' চখের পলকে আত্মসেবায় পরিণত হবে! তার স্বাধীনতার আস্ফালন, তার তেজোবীর্য্য সব যে তুচ্ছ একটা প্রলোভনের কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে নিভে যাবে! এমন দিন ভারতবর্ষে আস্‌বে, যে দিন নব-যৌবন-সমৃদ্ধা সহস্র সহস্র রমণী পুরুষজাতির পাশে দাঁড়িয়ে সমাজকে, দেশকে, জাতিকে ও জগৎকে সেবা কর্ব্বে। সংযমে অক্ষমতা সেদিন সকল মহদুদ্দেশ্যকে পণ্ড ক'রে দেবে।

স্থূল ভোগ ও সূক্ষ্ম ভোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমিও একজন ভোগবাদী, আমি ত্যাগ-পন্থী নই। ভোগ-পন্থীদের সমালোচনা কচ্ছি ব'লে আমাকে ভুল বুঝবেন না। কিন্তু ভোগের দুইটা রূপ,—একটা স্থূল, আর একটা সূক্ষ্ম। স্থূল ভোগ লালসা-পরিতৃপ্তির জন্য নির্ব্বিচারে নিকটতম ভোগ্য বস্তুকে গ্রহণ করে, সূক্ষ্ম ভোগ উৎকৃষ্টতর ভোগের জন্য নিকৃষ্টতর ভোগ্য বস্তুকে নির্ম্মম ভাবে উপেক্ষা করে। স্থূল ভোগের প্রধান উপাদান রক্ত আর মাংস, সূক্ষ্ম ভোগের প্রধান উপাদান নিজ চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা। স্থূল ভোগ মানুষকে পশু করে, সূক্ষ্ম ভোগ পশুকেও ঠেলে নিয়ে দেবতার স্তরে উন্নীত করে। স্থূল ভোগ পরার্থপর সজ্জনকে স্বার্থপর

অসাধু করে, সূক্ষ্ম ভোগ স্বার্থপরকে নিঃস্বার্থ, অসাধুকে সাধু করে। ভোগবাদ যদি কখনও ভারতের জাতীয়-জীবনের আদর্শ হয়, তা হ'লে এই সূক্ষ্ম ভোগবাদই সেই আদর্শ। আর, শূকরের, মত বিষ্ঠাকুণ্ডে গড়াগড়ি দেওয়াই যদি ভোগবাদ হয়, তবে এ ভোগবাদ হচ্ছে জাতীয় জীবনের ধ্বংস-সাধনের পথ।

ঝালিদা,
১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৬

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং হাজারিবাগের স্বরাজ্য নেতা রামনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের সহিত আজ শ্রীশ্রীবাবামণির সুদীর্ঘ আলোচনা হইল।

বর্ত্তমান শিক্ষার ত্রিদোষ-ক্ষেত্র

রামনারায়ণবাবু বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণির মতামত জানিতে আগ্রহান্বিত হওয়াতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাশ্চাত্যের অনুবর্ত্তী বর্ত্তমান শিক্ষায় আমার শ্রদ্ধাও নেই, বিশ্বাসও নেই। তার প্রথম কারণ এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা স্বাধীন-চিত্ত মানুষ তৈরী কচ্ছে না। বল্‌তে পারেন, দেশব্যাপী এই যে জাতীয় উন্নতিমূলক আন্দোলন, তা' কি ইংরাজী শিক্ষারই ফল নয়? আমি বলি,—না, নিশ্চয় নয়। দেশব্যাপী এই আন্দোলনের মূল হচ্ছে বিলাতি শাসনের অর্থনৈতিক পরিণাম। পরাধীন জাতি যখন বিদেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা পায়, তখন সে নিজেকে হীন, অশক্ত, দুর্ব্বল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। তার আত্মপ্রত্যয় আর আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হবে কি ক'রে? এই জন্যই

আমার মনে হয়, রাজা রামমোহন রায় যে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে ইংরিজি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে লর্ড বেন্টিঙ্ককে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, তাতে দেশের অনিষ্টই ক'রেছেন। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মত আমার অক্ষরে অক্ষরে সত্য ব'লে মনে হয়। গান্ধীজী যে ব'লেছেন, তিলক-গোখ্‌লের মত লোক ইংরিজি পদ্ধতির শিক্ষার ভিতর দিয়ে না গজিয়ে যদি স্বদেশীয় কোন শিক্ষা-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে আত্মবিকাশের সুযোগ পেতেন, তা হ'লে আরো অনেক বড় হ'তে পাত্তেন, সে কথা আমি সত্য ব'লেই মনে করি। কথা উঠ্‌তে পারে, ইংরিজি শিক্ষার প্রচলন না হ'লে আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিখ্‌তে পাত্তাম না। কিন্তু ওসব বাজে কথা। কারণ, বিজ্ঞান-গ্রন্থ অনুবাদ ক'রেও পড়া যায় এবং সে অনুবাদ হ'তই। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রতি আমার অবিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ শিক্ষায় অতীত ভারতের প্রতি সম্ভ্রম-বুদ্ধি জাগ্রত হয় না, আমার ভারত কি ছিল, কেমন ছিল, কত বড় ছিল, তার জ্ঞান কিছু জন্মে না, অতীতের সত্যকে উন্নতির বীজ-স্বরূপ গ্রহণ ক'রে তার অঙ্কুরোদ্গমের জন্য অনুকূল বারিবর্ষণ হয় না, বরং পাশ্চাত্যের বাল-চপলতাকে মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ব'লে ভারতীয় জীবনের মধ্যে জোর ক'রে অনুপ্রবিষ্ঠ ক'রে দেওয়াই যেন এ শিক্ষার লক্ষ্য। তারপর সর্ব্বশেষ কারণ হচ্ছে এ শিক্ষা মানুষের চরিত্র-গঠনের অনুকূল নয়, এ শিক্ষা বীর্য্য-সাধনার পরিপন্থী, এ শিক্ষা ধর্ম্ম-বুদ্ধির অপচয়কারক। এই ত্রিদোষ এসে বর্ত্তমান শিক্ষাকে আশ্রয় করেছে এবং এই জন্যই এই শিক্ষা আমার অবিশ্বাসের পাত্র।

কড়কড়া,

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি মানভূম ও হাজারিবাগ জেলাদ্বয়ের প্রান্তবর্ত্তী কড়কড়া গ্রামে শুভাগমন করিয়াছেন। কড়কড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের জন্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে পঞ্চাশ বিঘা ভূমি দান করিতে চাহেন। তাঁহার একান্ত অনুনয়ে শ্রীশ্রীবাবামণি ভূমি-দর্শনে আসিয়াছেন। সঙ্গে পুপুন্কীর শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয়ও আছেন। রামপদবাবু এক বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সভাপতি-পদে বৃত হইলে পরে হরিহরবাবু প্রভৃতি সুবক্তা-গণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণিও সামান্য কিছু বলিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

রামপদবাবু শ্রীশ্রীবাবামণির আগমন-বার্ত্তা দূর-দূরান্তরে প্রচার করিয়াছিলেন। ফলে ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূর হইতেও বহু লোক শ্রীশ্রীবাবামণির সন্দর্শন লাভের জন্য আসিয়াছিল। যুবকেরা ধরিল যে, ব্যক্তিগত জীবন-গঠন সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে।

তখন শ্রীশ্রীবাবামণি সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া নিরিবিলি একটি স্থানে গিয়া বসিলেন এবং যুবকদের প্রত্যেকের জিজ্ঞাস্যের সদুত্তর দিতে লাগিলেন।

দীক্ষা গ্রহণ কখন কর্ত্তব্য

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—দীক্ষা গ্রহণ কখন কর্ত্তব্য ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা গ্রহণের জন্য যথার্থ আকুলতা

যখন আস্‌বে, প্রাণ দিয়েও সাধন করার সঙ্কল্প যখন হবে এবং সদ্‌গুরু যখন মিল্‌বে।

পিতৃমাতৃ-সেবা বড়, না গুরু-সেবা বড়

প্রশ্ন।—সংসারে থেকে পিতৃ-মাতৃ-সেবা শ্রেষ্ঠ, না সংসার ত্যাগ ক'রে গুরু-সেবা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উভয়বিধ সেবাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পাত্র ভেদে। শিষ্যের সেবা না পেলেও গুরুর চলে কিন্তু সন্তানের সেবা না পেলে মাতাপিতার চলে না। অতএব সাধারণতঃ সংসার ত্যাগ ক'রে গুরু-সেবা করার চাইতে সংসারে থেকে পিতামাতার সেবা অধিকতর কর্ত্তব্য। কিন্তু পাত্রভেদে এমন অবস্থাও হয়, যখন শিষ্য অনন্যমনা হ'য়ে একমাত্র গুরু-সেবার ভিতর দিয়ে সহস্র সহস্র মাতা-পিতার পরোক্ষ সেবা কর্ত্তে সমর্থ হয়। যে-গুরুর জীবনের মধ্য দিয়ে এইভাবে বহু জনের কল্যাণ বিসর্পিত হয়, আর, যে-শিষ্যের সেবা গুরুর এই কল্যাণকারিণী শক্তিকেই প্রতিনিয়ত সঞ্জীবিত রাখে, এমন গুরু আর এমন শিষ্য জগতে অতীব দুর্ল্লভ। এই রকম দুর্ল্লভ ক্ষেত্রে পিতৃ-মাতৃ-সেবার চাইতে গুরুসেবা শ্রেষ্ঠ।

পিতৃমাতৃ-সেবার-স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে 'সেবা' কথাটার প্রকৃত অর্থ তোমাকে বুঝ্‌তে হবে। সেবার উৎপত্তি শ্রদ্ধা থেকে, ভক্তি থেকে, স্বার্থ থেকে নয়। মাতৃ-পিতৃ-সেবার জন্য যারা সংসারী হবে, তাঁদের কর্ত্তব্য মাতাপিতাকে ভগবৎ-স্বরূপ মনে ক'রে

সস্ত্রীক তাঁদের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত থাকা, নিজেদের দাম্পত্য জীবনের সকল স্বার্থকে ঐ সেবার পদতলে সমর্পণ করা, সুখ-বুদ্ধি, ভোগ-বুদ্ধি সব বর্জ্জন ক'রে মাতৃপিতৃরূপী ভগবানের অর্চ্চনাকে জীবনের পরমমোক্ষ ব'লে জ্ঞান করা। অর্থাৎ পিতৃমাতৃ-সেবক সংসারীতে আর সাধারণ সংসারী জীবে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেবক-সংসারী স্বার্থজিৎ সাধক পুরুষ, পিতামাতার প্রীতি-সম্পাদনই তার জীবনের ব্রত।

পিতৃমাতৃ-আজ্ঞায় ও গুরুবাক্যে বিরোধ

প্রশ্ন।—মাতৃ-পিতৃ আজ্ঞায় আর গুরু-বাক্যে যদি কখনও বিরোধ ঘটে, তখন কি কর্ত্তব্য ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে মাতা-পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন আর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গুরু-বাক্য প্রতিপালন। সন্তান পিতামাতার সেবা কর্ব্বে প্রথমতঃ দেহ দিয়ে, তার পরে মন দিয়ে, সর্ব্বশেষে আত্মা দিয়ে; শিষ্য গুরুর সেবা কর্ব্বে প্রথমতঃ আত্মা দিয়ে, তার পরে মন দিয়ে, সর্ব্বশেষে দেহ দিয়ে। সন্তানের দেহের উপর পিতামাতার শ্রেষ্ঠ দাবী, শিষ্যের আত্মার উপরে গুরুর শ্রেষ্ঠ দাবী।

মাতৃ-পিতৃ-দ্রোহীর গুরু-ভক্তি

প্রশ্ন।—অনেককে দেখা যায়, পিতৃমাতৃ-দ্রোহী, কিন্তু খুব গুরু ভক্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তারা ভণ্ড। পিতৃদ্রোহী ও মাতৃদ্রোহী কার্য্যতঃ গুরু-দ্রোহীই হয়।

প্রকৃত গুরু-ভক্তি

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরু-ভক্তি জিনিষটা একটা সামান্য ব্যাপার ব'লে মনে ক'রো না। জগতের সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি ভাবের সামঞ্জস্য রেখে যে গুরু-ভক্তি, তাকেই বল্‌ব খাঁটি গুরু-ভক্তি। গুরুদেবকে ভক্তি কর্‌ব ব'লেই মাতা-পিতাকে অভক্তি কত্তে হবে বা আমার গুরুদেবেরই পন্থা যাঁরা আশ্রয় করেন নাই, সেই সব পূজনীয় মহাত্মাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ কত্তে হবে, একে গুরু-ভক্তি বলে না। আমি আমার গুরুদেবকে হয়ত অবতার ব'লেই মনে করি, চাই কি স্বয়ং পরমেশ্বর ব'লেও বিশ্বাস করি, কিন্তু তাই ব'লে যারা আমার মত মনে করে না, তাদের নাস্তিক, পাষণ্ডী ব'লে গাল দিয়ে খড়্গহস্ত হওয়া প্রকৃত গুরু-ভক্তি নয়। গুরু-ভক্তির প্রমাণ আত্মোৎসর্গ। জগতের কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার না ক'রে আমি যখন হাস্‌তে হাস্‌তে আমার গুরু-বাক্যকে জগজ্জয়ী কর্ব্বার জন্য হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে রক্তাঞ্জলি দিতে পার্ব্ব, তখন বলা চল্‌বে যে আমি গুরু-ভক্ত। উচ্ছ্বাসের অধীরতাকেই গুরু-ভক্তি বলে না, প্রকৃত গুরু-ভক্তি বহুকালব্যাপী সুধীর তপঃসাধনেই আসে।

মহাপুরুষের লক্ষণ

দ্বিতীয় এক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি মহাপুরুষের লক্ষণ বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দিয়ে মহাপুরুষ চেনা কঠিন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে মহাপুরুষগণের জীবনে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুট্‌তে

দেখা গিয়েছে। মহাপুরুষ বুদ্ধ বা যীশু ধর্ম্মরক্ষার্থেও অস্ত্রধারণের কল্পনা কত্তে পারেননি, অথচ মহাপুরুষ মহম্মদ ও গুরু-গোবিন্দ ধর্ম্ম-রক্ষার্থে অস্ত্রচালনা অপরিহার্য্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ ও যীশু যেমন কাপুরুষ ব'লে গণ্য হবেন না, মহম্মদ বা গুরু-গোবিন্দ সিংহও তেমনি রক্তপিপাসু রাক্ষস ব'লে কীর্ত্তিত হবেন না। আচার্য্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রামানুজ স্বামী, গোস্বামী তুলসীদাস প্রভৃতি গার্হস্থ্য উপেক্ষা ক'রে মহাপুরুষ হ'য়েছিলেন, নানক, কবীর, তুকারাম, নিত্যানন্দ প্রভৃতি স্ত্রীবর্জ্জন না ক'রেই মহাপুরুষ হ'য়েছিলেন। শঙ্কর, প্রভৃতিকে যেমন গার্হস্থ্য সংযমের পরীক্ষা দানে ভীত কাপুরুষ ব'লে গালি দেওয়া যায় না, নানক প্রভৃতিকেও তেমন সন্ন্যাস-গ্রহণে অক্ষম দুর্ব্বল ব'লে নিন্দা করা চলে না। তবে যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের জীবনে দুটী বিশিষ্টতার কথা বলা যেতে পারে। একটী হচ্ছে, তাঁদের জীবন পরের কল্যাণে, স্বার্থে তাঁদের দৃষ্টি নেই, দ্বিতীয়তঃ তাঁদের দ্বারা সমাজের প্রত্যক্ষ কল্যাণের চাইতে পরোক্ষ কল্যাণ অধিক হয়, বর্ত্তমানের কল্যাণ অপেক্ষা ভবিষ্যতের কল্যাণ বেশী হয়। যাঁর জীবনে এ দুটী লক্ষণ যত পরিস্ফুট, তিনি তত বড় মহাপুরুষ।

পরার্থপরতা লাভের উপায়

তৃতীয় এক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিল,—পরার্থপর হওয়ার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে জিনিষের প্রতি তোমার সব চেয়ে বেশী লোভ, ঠিক সেই জিনিষটী অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দান কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। মাঝে মাঝে নিজের ক্ষুধার আহারীয় বুভুক্ষু

দরিদ্রকে দেবে। মনে হয়ত অনিচ্ছা বা কুণ্ঠা থাক্‌বে, তবু দেবে। এ ভাবে পরার্থপরতার প্রাথমিক অনুশীলন কর্ত্তে হয়। কিন্তু জোর-জবরদস্তি ক'রে ত্যাগ করা ত' আর যথার্থ ত্যাগ নয়। তাই মনকে, চিত্তপ্রবৃত্তিকে পরার্থের অনুকূল কর্ব্বার জন্য অন্য উপায়ও অবলম্বন কর্ত্তে হয়। সে উপায় হচ্ছে, ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ।

পল্লী-সেবায় ব্রহ্মচেতনা

কড়কড়া হইতে সাত আট মাইল দূরে সতনপুর গ্রামের কিশোরেরা মিলিয়া একটী বালকাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। বালকাশ্রমের একজন সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পল্লীসেবাকে তোমরা ভগবৎ-সেবা ব'লে জ্ঞান ক'রে তবে কার্য্যে ব্রতী হবে। যাদের সেবা কচ্ছ, যাদের উপকারার্থে স্বার্থত্যাগ কচ্ছ, তারা যে শ্রীভগবানেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ, এই প্রত্যয়টী না জন্মাতে পার্ল্লে পল্লী-সেবার আসল উদ্দেশ্যই যে পণ্ড হ'য়ে যাবে! তুমি সেবাব্রতধারী তোমার চিত্তশুদ্ধির জন্য, তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্য, তোমার মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভের জন্য। ব্রহ্মচেতনায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নিয়ে যদি জীব-সেবা কর, তা' তোমার কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন করারই কারণ হবে, তোমার দেহ, মন, প্রাণ ও আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতার, পূর্ণ মোক্ষের উপায় হবে। কিন্তু ব্রহ্ম-চেতনায় বঞ্চিত হ'য়ে যতই মহৎ কাজ তুমি কর না কেন, তাতে তোমার চরিত্রের নির্ম্মলতা বর্দ্ধিত হবে না বরং নিষ্প্রভ হবে, তোমার আত্মাভিমান, অহঙ্কার, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ-পরায়ণতা প্রভৃতি জন-সেবার দোহাই দিয়ে মনুষ্যত্বের মহিমাকে বারংবার খর্ব্ব কর্ত্তে চাইবে।

জন-সেবা ও অর্থ-সংগ্রহ

প্রতিষ্ঠান-পরিচালনের আর্থিক সমস্যার কথা উঠিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অর্থকে কখনো বড় ক'রে দেখো না, জন-সেবা কর্ত্তে হ'লে তার জন্য আগে একটা মোটা রকমের টাকা সংগ্রহ ক'রে নেওয়া মোটেই আবশ্যক নয়। বরং ঠিক্ তার বিপরীত অবস্থাই কর্ম্মীদের চরিত্রগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অভাব তাদের কর্ম্মশক্তিকে বৃদ্ধি করে, অধ্যবসায়কে উদ্যত করে, শক্তি, বুদ্ধি ও সময়ের অপচয়কে সতর্কতা-সহকারে নিবারণ করে। কেবল তাদেরই তোমাদের কর্ম্ম-সঙ্গী হ'তে দিও, যারা অনশনকে ভয় করে না, যারা ধনীর অনুগ্রহের চাইতে ভগবানের দেওয়া বাহুদ্বয়ের বলের উপরে সহস্র গুণ অধিক বিশ্বাস রাখে।

বড় কাজে সাফল্যের মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—বড় কাজের সাফল্যের মূল কোথায় জান? সত্যে আর একতায়। এই দুটী বস্তু যাদের অনুকূলে, জগতে তাদের অসাধ্য কিছু নেই। তারা ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র-সেচন কত্তে পারে, মাটির ঢেলা দিয়ে হিমালয়ের শৃঙ্গ চূর্ণ কত্তে পারে।

সত্য বনাম ঐক্য

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সত্যে আর ঐক্যে যদি কখনো বিরোধ আসে, তাহ'লে সত্যের জন্য ঐক্যকে বলি দেওয়া যায়। পৃথিবী-ব্যাপী বড় বড় প্রতিষ্ঠান বরং সৃষ্ট নাই

হ'ল, পৃথিবীতে ছোট ছোট চেষ্টা ও ছোট ছোট অধ্যাবসায়ই সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মনুষ্যত্বের মহিমা প্রচার করুক। মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় পাঁচতলা দালানের চাইতে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছোট এক এক খণ্ড হীরকের দাম বেশী।

বাঘাস্তি,

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

অদ্য সন্ধ্যার সময়ে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বাঘাস্তি গ্রামের হরিসভায় ৪১-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সভাপতিরূপে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রাবাবামণি এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। উৎসব ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে হইবে কিন্তু গ্রামের নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ জানা এবং শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় জানা মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীশ্রীবাবামণি দুই দিন আগেই আসিয়া পৌছিয়াছেন।

ভারতের জাতীয় প্রতিভা

শ্রীশ্রীবাবামণির সেবা-যত্নাদির জন্য মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাঁহার গুরুদেবের আশ্রম হইতে শ্রীমৎ পূর্ণচৈতন্য ব্রহ্মচারীকে আনয়ন করাইয়াছেন। উপযুক্ত বিশ্রামাদির পর ব্রহ্মচারীজীর সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা। এর উপর ভিত্তি ক'রেই আমাদের সকল কাজ কত্তে হবে। সমাজ-সেবা, পল্লী-সেবা, দরিদ্র-সেবা, স্বদেশ-সেবা প্রভৃতি যত প্রকার কল্যাণ-কর্ম্ম, সকলের guiding principle বা পরম

প্রেরণা হবে ধর্ম্ম। তা' হ'লেই আমরা সত্যিকার ভারতবর্ষকে গ'ড়ে তুল্‌তে পার্ব্ব।

বাঘাস্তি,
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

মহিলা-সমাজে নিত্য-পাঠের উপযোগিতা

সুরেন্দ্রনাথ জানা মহাশয় আজ গ্রামের সমস্ত মহিলাদের সম্মিলিত করিয়া এক সভার আয়োজন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দানের পর সভাভঙ্গ হইলে সুরেন্দ্রবাবু জানাইলেন যে, মহিলাদের ভিতরে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বক্তৃতার উৎসাহ ক্ষণস্থায়ী হয়। স্থায়ী উৎসাহ রক্ষার জন্য মায়েদের জন্য প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে কার্য্যাবসরে মিল্‌বার একটা স্থান হওয়া উচিত। সেই সময়টুকু প্রত্যেকে বাজে গল্প-গুজব বন্ধ ক'রে কেউ চরকায়, কেউ বা টাকুয়াতে সূতা কাটবেন, আর একজন ব'সে ব'সে ধীর কণ্ঠে, সুস্পষ্ট উচ্চারণ-সহকারে ধারাবাহিকভাবে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর্ব্বেন। আঙ্গুরের রস একদিনে অনেক খেলে বদহজম হয়, কিন্তু প্রতিদিন একটু একটু ক'রে পান কর্ল্লে তাতে বলাধান হয়।

বাঘাস্তি,
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

সত্য-প্রচারের বাধা পরমতে অসহিষ্ণুতা

অদ্য রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু মহাশয় বক্তৃতা দানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া

বাঘাস্তি আসিয়া পৌছিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ভাগবত-শাস্ত্রী মহাশয়ও শুভাগমন করিয়াছেন। পরস্পরে কুশল-প্রশ্নাদি করিতেছেন, এমন সময়ে মেদিনীপুরের অক্লান্ত-কর্ম্মী জন-সেবক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসিয়া বলিলেন,—এক আপদ জুটেছে।

সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি আপদ ?

পূর্ণবাবু বলিলেন,—অমুক মঠের এক স্বামীজী এসেছেন আজকে সভায় বক্তৃতা দেবেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে ত' ভাল কথা। তিনি কি সুবক্তা ?

পূর্ণবাবু বলিলেন,—সুবক্তা কি কুবক্তা, তা' জানি না। কিন্তু তিনি এসেছেনই আজকের সভার উদ্দেশ্য পণ্ড কর্ত্তে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জানা বলিলেন,—আপনাকে সভাপতি ক'রে আনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের গ্রামের মধ্যে সংগঠন-শক্তিকে জাগ্রত করা, সর্ব্বপ্রকার সমাজ-সেবার উৎসাহ সৃষ্টি করা। কিন্তু এই আগন্তুক স্বামীজীটীর বক্তৃতা আমরা বহুবার শুনেছি, এঁর বক্তৃতার প্রধান কথাই হ'ল—"আমাদের গুরুর শিষ্য হও, তাঁর পাদপদ্মে তোমার সম্পত্তি দান কর, আর কর্ম্ম-ফর্ম্ম ত্যাগ ক'রে শুধু কৃষ্ণ-নাম জপ কর।" তিনি আরো বলেন,—"বিবেকানন্দ যে 'জীব-সেবা', 'জীব-সেবা' বলে চীৎকার ক'রে দেশের লোকগুলিকে ঐহিক কর্ম্মে প্ররোচিত কর্ল্লেন, তার ফলে তাঁর নরক হয়েছে, তিনি মুক্তি পান নাই। মুক্তি পেতে হয় ত' আমাদের দলে এস, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ কর,

পল্লী-সেবা, স্বদেশ-সেবা সব বিষবৎ বর্জ্জন কর। কৃষ্ণের যে সেবক, তার আবার সমাজই বা কি, স্বদেশই বা কি ? শ্রীকৃষ্ণই তাঁর পক্ষে একমাত্র সত্য, দেশ, সমাজ, স্বাধীনতা, পরাধীনতা সবই তাঁর পক্ষে মিথ্যা ও অনর্থের মূল।'' তিনি আরো বলেন, —''গুরু ব্যতীত আর কাউকে দান ক'রো না, এমন কি ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রকেও না, দরিদ্র কষ্ট পায় তার কর্ম্ম-ফলে, তুমি যদি তার কষ্ট নিবারণ কত্তে যাও, তা হ'লে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার বিরোধিতা করা হবে, তাতে তোমার পাপ হবে!''

শ্রীশ্রীবাবামণি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ সব কথা লোকে শোনে ?

পূর্ণবাবু বলিলেন,—শোনে না ব'লেই ত' তিনি এখানে শুনাতে এসেছেন। এমন একটা বিরাট সভা তাঁর ভাগ্যে কখনো জোটেনি।

সকলেই শ্রীশ্রীবাবামণিকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এই বক্তাকে যেন বক্তৃতা দিতে দেওয়া না হয়।

কিন্তু সভা আরম্ভ হইতেই আগন্তুক সাধুর তরফ হইতে এত অনুরোধ উপরোধ আসিতে আরম্ভ করিল যে, সভার উদ্দেশ্য-বিরোধী কোনও বিষয় অদ্যকার সভায় বলিবেন না, এই সর্ত্তে তাঁহাকে বক্তৃতা দানের অনুমতি দেওয়া হইল।

প্রথমেই আগন্তুক সাধু বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি পঁচিশ মিনিট পর্য্যন্ত শুধু হা-হুতাশই করিলেন যে, সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে মাত্র পঁচিশ মিনিট সময় দিয়াছেন।

যাহা হউক, সভাভঙ্গের পরে তিনি তাঁর বাকী বক্তব্য বিষয়-সমূহ বলিবেন, বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

তৎপরে ব্রহ্মচারীজী, ভাগবত-শাস্ত্রী মহাশয়, পূর্ণবাবু ও ক্ষিতীশবাবু প্রভৃতি সুখশ্রাব্য সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার পরে রাত্রি দশটা দশ মিনিটের সময়ে সভাপতি শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রি বারোটা দশ মিনিটের সময় তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে পরে পূর্ব্বোক্ত সাধু পুনরায় বক্তৃতা দিবার জন্য দাঁড়াইতে চাহিলেন! সেই রাত্রিতেই কলিকাতা রওনা হইতে হইবে বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি আর বিলম্ব করিতে পারেন নাই। তাই, তিনি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশবাবুকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। কিন্তু পাঁচ ছয় মিনিট যাইতে না যাইতেই সভাস্থলে তুমুল কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল।

সভাভঙ্গের পরে ভাগবত-শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসায় শ্রীশ্রীবাবামণি জানিতে পারিলেন, শ্রোতৃবর্গ বিবেকানন্দ, গান্ধী প্রমুখ কর্ম্মযোগীর নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া তুমুল কোলাহলের দ্বারা বৈষ্ণব-চূড়ামণিকে বক্তৃতা ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখুন শাস্ত্রী মহাশয়, এখানেই আমাদের জাতীয় দৌর্ব্বল্য। আমরা যারা উপদেষ্টার আসনে এসে বসি, তাদের সকলেরই জিদ্ হচ্ছে শুধু নিজের মত ও নিজের গোঁড়ামিটাকে চালাবার। জীবের দুঃখে আমার প্রাণ যদি কেঁদেই থাকে, তা' হ'লে এমন ভাবে উপদেশ দিলেই ত' হয়, যাতে অন্য কোনও পন্থাবলম্বীর প্রাণে না আঘাত লাগে। পরমতে অসহিষ্ণুতাই আমাদের সকল সত্য-প্রচারকে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে।

কলিকাতা,
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি বেলা এগারটার সময় কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন। কয়েকজন স্কুলের এবং কলেজের ছাত্র তাঁহার চরণ দর্শন মানসে আসিয়াছেন।

ধ্যান-সমাধি ও মাদকদ্রব্য

একজন যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধুরা মদ, গাঁজা, ভাং এ সব খান কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ঠিক কি জন্যে খান, তা' কি ক'রে বলব বাছা। কেউ হয়ত খান অভ্যাস বশতঃ, কেউ হয়ত খান ঔষধ-রূপে।

প্রশ্ন।—অনেকে যে বলেন, নেশা কর্ল্লে ধ্যান-সমাধি হয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সে নেশা নামের নেশা রে! মদ-গাঁজার নেশা নয়। মাদক দ্রব্যের ফলে যে চিত্তের একাগ্রতা হয়, ওটা প্রকৃত প্রস্তাবে চিত্তের জড়তা মাত্র। ভগবানের নামের স্মরণ, ভগবানের অসীম লীলা-স্মরণ, এসব কত্তে কত্তে আপনি যে চিত্তৈকাগ্রতা জন্মে, তাই হচ্ছে পরমার্থ-লাভের সহায়। ভাং-গাঁজা খাওয়াকে সিদ্ধিলাভ মনে করা অশিক্ষিত অমার্জ্জিত-বুদ্ধি তামসিক লোকের কুসংস্কার মাত্র, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মাদক-দ্রব্যে কখনো সমাধি হ'তে পারে না, মোহ হয়। যেমন, ক্লোরোফর্ম্ম কর্ল্লে কতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর চৈতন্য বা দেহবুদ্ধি থাকে না। অজ্ঞ লোকে সেই মোহকেই সমাধি ব'লে ভ্রম করে।

বড় বড় মহাত্মাদের মাদকাভ্যাসের কারণ

প্রশ্ন।—খুব বড় বড় সাধুদের মধ্যেও অনেককেই দেখা গিয়াছে, তাঁরা অনেকেই গাঁজা খান।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অর্থাৎ তোমরাও গাঁজা খেলে অত বড় সাধু হ'তে পার্ব্বে! বুদ্ধির দৌড় দেখ! ওঁরা বড় বড় সাধু হ'য়েছেন সাধনের বলে, গাঁজার দমে নয়। তবে, সাধক অবস্থায় সঙ্গহেতুই হোক বা কোনও প্রয়োজনহেতুই হোক, গাঁজাটা অভ্যাস ক'রেছিলেন, এখন সিদ্ধাবস্থায় এসেও ওটা ত্যাগ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। সাধুদের প্রকৃত জীবনটার অনুসরণ কচ্ছি না, অথচ তাঁদের বহিরাচারগুলির হুবহু নকল কচ্ছি, এই জন্যেই ত' আমাদের এ দুরবস্থা।

দত্তক পুত্র

অপর একজন যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—নিঃসন্তান লোকেরা যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করে, এর প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সকল দত্তকগ্রাহীর উদ্দেশ্য কখনো এক হ'তে পারে না। কেউ পিণ্ডলোভে, কেউ আত্মীয়-স্বজনকে সম্পত্তির ভাগী হ'তে না দেবার ইচ্ছায়, কেউ বা শুধু একটী বালকের মুখের গালভরা "বাবা" "মা" ডাক শোনবার আকাঙ্ক্ষায় দত্তক রাখে।

প্রশ্ন।—দত্তক-পুত্রের দ্বারা কি আত্মজপুত্রের ফল পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আমিও উল্টো তোমায় প্রশ্ন কত্তে পারি, একটা কাঁঠাল পেড়ে এনে আম গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্‌লে সেই কাঁঠালটায় কি আমের আস্বাদ পাওয়া যায় ?

প্রশ্ন।—তবে লোকগুলি দত্তক খামাখা রাখে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খামাখা রাখ্‌বে কেন? চিত্তের বাৎসল্য ভাবকে সার্থকতা দেবার একটা পথ ত' চাই! দত্তক-পুত্র অনেক স্থলে সেই পথটা খুলে দেয়, পরের ছেলেকেই নিজের ছেলে মনে ক'রে প্রাণে অতৃপ্ত স্নেহ একটা তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ সঞ্চয় করে। কিন্তু আত্মজ সন্তান পিতার মস্তিষ্ক থেকে নিজের মস্তিষ্ক পায়, তাই, পিতার বা পিতামহের বিশেষত্বগুলিকেও নিজের মধ্যে আংশিক ভাবে পায়। দত্তক-পুত্র তা পায় না। সে তার নিজ জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীর বৈশিষ্ট্যগুলিই নিয়ে আসে।

প্রশ্ন।—শ্রাদ্ধের ফলও পৃথক্ হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—শাস্ত্র ও লোক-সংস্কার দত্তক-পুত্রের পিণ্ডোদকে পূর্ণ আস্থা রাখেন। সুতরাং এই বিষয়ে সন্দেহ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে পুণ্যের দিক দিয়ে যদি বিচার কর, তা' হ'লে বল্‌তে পারি, একটী নির্দ্দিষ্ট ছেলেকে এনে দত্তক রেখে যদি প্রকৃতই কোনও পুণ্য-সঞ্চয় হয়, যদি হৃদয়-বৃত্তির প্রকৃতই কোনও উন্নতি সাধিত হয়, তা' হ'লে অনাথ বালক-বালিকাদের দুঃখ দূর করার জন্য নির্ব্বংশ থাকার মধ্যেও যথেষ্ট পুণ্য রয়েছে, যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তি রয়েছে।

গুণ-কর্ম্ম বিভাগশঃ

অপর একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—শুন্‌তে শুনি "গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।" কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্র চিনি কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুন্‌তেও যা শোন, চিন্‌তেও তাই চিন্‌বে! যেখানে ত্যাগের জোর আছে, জ্ঞানের জোর আছে,

সেখানে ব্রাহ্মণত্ব আছে ব'লে জান্‌বে এবং চামারের ছেলেকেও ব্রাহ্মণ ব'লে পূজা কর্ব্বে। যেখানে শৌর্য্য আছে, বীর্য্য আছে, তেজস্বিতা আছে, সেখানে ক্ষত্রিয়ত্ব আছে ব'লে জান্‌বে এবং ক্ষত্রিয়ের প্রাপ্য সম্মান সেখানে দেবে। যেখানে ত্যাগের পিছনে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি আছে, দানের পিছনে লাভের লোভ আছে, সেখানে বৈশ্যতা আছে ব'লে জান্‌বে। দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে কেউ কখনো ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হয় না। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বে-হিসাবীর বৃত্তি, এঁরা প্রাণেরই ব্যবসায়ী—প্রাণ হিসাব ক'রে জাগে না।

বৈষ্ণব-কবিতা ও জাতীয় দৌর্ব্বল্য

যুবক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—বৈষ্ণব-কবিতা আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ডকে দুর্ব্বল করেছে, এই অভিযোগ কি সত্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একেবারে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। যেখানে বৈষ্ণব-কবিতা বিশ্লেষণ কত্তে গিয়ে পাঠক বা শ্রোতা নিজেকে কৃষ্ণের দাস ব'লে, কৃষ্ণের সখা ব'লে, কৃষ্ণের মাতাপিতা ব'লে, কৃষ্ণে কান্তা বলে আবিষ্ট কত্তে পারে নি, সেখানে এ কবিতা বৃথা দুর্ব্বলতারই কারণ হয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতার ফলে যদি কেউ জীবনের নানা সখ্য-সম্বন্ধের মধ্যে, সাংসারিক জীবনের বাৎসল্য-সম্বন্ধের মধ্যে, দাম্পত্য জীবনের মধুর সম্বন্ধের মধ্যে সেই পরম-সখা, সেই পরমবৎসল, সেই পরমপ্রেয় ভগবানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ যোগকে অনুভব ক'রে থাকে, তবে বল্‌তেই হবে, বৈষ্ণব-সাহিত্য ভারতের জাতীয় মেরুদণ্ডে সবলতারও সঞ্চার করেছে।

ইতর সুখের উর্দ্ধে যাইবার প্রেরণাবর্জ্জিত প্রেমের কবি

যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহ'লে ত' বৈষ্ণব-কবি ছাড়া অন্যান্য যে সব কবি প্রেমের কবিতা লিখেছেন, তাদের সম্পর্কেও এ কথা খাটে ? তারাও ত' জাতির মেরুদণ্ডকে দুর্ব্বল করেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কবিতার লেখক যিনিই হোন, আর তাঁর জন্মভূমি যে দেশেই হোক্, তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে যদি পার্থিব জগতের ইতর সুখের উর্দ্ধে যাবার প্রেরণা না এসে থাকে, তাহ'লে স্বীকার কত্তেই হবে যে, তিনি দেশ এবং জাতি, সমাজ এবং জগৎ সকলেরই শক্ত মেরুদণ্ড দুর্ব্বল করার কাজে সহায়তা করেছেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনধিকার চর্চ্চা

যুবক।—বৈষ্ণব-কবিদের কারো কারো রচনায় অত্যন্ত অশ্লীল জিনিষ সব স্থান পেয়েছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—একথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য্য। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতা পড়্তে হ'লে তদ্ভাবভাবিত হ'য়ে পড়্তে হয়। শ্রীরাধাকে অপ্রাকৃত প্রকৃতি এবং কৃষ্ণকে নিত্য-পুরুষ জ্ঞান ক'রে তাঁদের মিলনকে বিদেহী ব্যাপার জেনে পড়্তে হয়। তা' যে পার্বে না, বৈষ্ণব-কবিতা তার পড়া নিষেধ ব'লে বৈষ্ণবাচার্য্যেরাই ব'লে রেখেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী যার ভিতরের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতাকে জাগাবে না, বরং উত্তেজিত কর্ব্বে রক্ত-মাংসের স্পৃহাকে, তাঁকে এই প্রেমতত্ত্ব শুন্তে, বল্তে,

আলোচনা কত্তে শত নিষেধ দেওয়া আছে। তোমরা সে কথায় কর্ণপাতও করনি। যে যত অনধিকারী, সে তত বেশী ক'রে কৃষ্ণ-লীলার আলোচনায় প্রমত্ত হয়েছে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল সাহিত্যে, জীবনে, সমাজের বিবর্ত্তনে প্রকাশ না পেয়ে যাবে কোথায় ?

স্ত্রীজাতির সমাজসেবা

অপর একজন যুবক, যিনি সম্প্রতি কোনও সমাজ-সংস্কারক-সঙ্ঘের কর্ম্মিরূপে পতিতের উত্থান লাভে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাঁরা সমাজের সেবা কত্তে চান, তাঁদের কোন্ কোন্ কাজে হাত দেওয়া উচিত ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীজাতীর উন্নতির চেষ্টাতেই তাঁদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণকে জাগ্রত করার জন্যই তাঁদের যত্ন নেওয়া উচিত। কিন্তু দেশের মারাত্মক আপৎ-কালে সকলেরই সকল কাজে অধিকার আছে জান্বে।

গণিকার সমাজ-সেবা

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—যারা গণিকার জীবন-যাপন কচ্ছে, তারা কি সমাজ-কল্যাণের জন্য কিছু কত্তে পারে না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এ জগতে এত নীচ কেউ নেই, এত অধম কেউ নেই যে, কোনও-না-কোনও প্রকারে সমাজের সেবা কত্তে পারে না। তবে চরিত্রের দিক্ দিয়ে যে যত অধিক পতিত,

সমাজ-সেবার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ তত ক'মে যায়। তাই, পতিতা নারীর পক্ষে খুব বড় সেবা সম্ভব নহে।

প্রশ্ন।—যদি সে তার পতিত-জীবন বর্জ্জন করে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' হ'লে সাধু-চরিতা নারীর যতগুলি কল্যাণ-কর্ম্মে অধিকার, সবগুলিতে তারও অধিকার জন্মাবে।

প্রশ্ন।—কিন্তু সমাজ যদি তার সেবা গ্রহণে প্রস্তুত না হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা হ'লে আগে তাকে তার সাধুত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। কালই এই পরীক্ষার পরীক্ষক, আর একনিষ্ঠাই সকল প্রশ্নের সুমীমাংসিত উত্তর। সমাজের সকল ভ্রূকুটি সত্ত্বেও যে নারী সমাজকেই সেবা দান কর্ব্বেন, অতীতের পাতিত্য তাঁর সাধনাকে ব্যর্থ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

প্রশ্ন।—কি ভাবে সে সমাজকে সেবা কর্ব্বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আগে জীবনের পাতিত্যকে অনুতাপের অশ্রুজলে প্রক্ষালিত ক'রে নিতে হবে। মহদাদর্শের ধ্যানের দ্বারা চিত্তকে পূর্ণ ক'রে তুল্‌তে হবে। ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণের দ্বারা কুমারীর ন্যায় নিষ্কলুষ পবিত্রতা অর্জ্জন কত্তে হবে। সমাজ-সেবা তার পরের কথা। শুদ্ধাচারের সাধনা ক'রে দেহকে শুদ্ধ ও মনকে পবিত্র ক'রে তারপর পতিতা মায়েরা মাতৃজাতির কল্যাণের জন্য নানা ভাবে চেষ্টা কর্ব্বেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে গণিকা-বৃত্তির হ্রাসের চেষ্টা তাঁরা কর্ব্বেন। গণিকার কন্যারা যাতে পুনরায় গণিকা হ'তে বাধ্য না হয় এবং সম্ভব হ'লে প্রচলিত সমাজ-মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান পায়, আর, তা' অসম্ভব হ'লে পৃথক্ সমাজ সৃষ্টি ক'রে পবিত্র দাম্পত্য জীবন-যাপন কর্ব্বার সুযোগ পায়, তার সুব্যবস্থার চেষ্টা তাঁরা কর্ব্বেন।

যারা গণিকা-বৃত্তি ছেড়ে সৎ ও সাধু ভাবে বাস কত্তে পার্ব্বে, তাদের আত্মাকে পাপ-পুরীর অন্ধকার থেকে মুক্ত ক'রে আনবার জন্য এঁরা চেষ্টা কর্ব্বেন। যারা ঘৃণিত জীবন পরিহার ক'রে এসেছে, তারা যাতে সমাজ সেবার কাজে আত্মদান করার সুযোগ ও যোগ্যতা লাভ ক'রে জীবনকে একটা পবিত্র অবলম্বন ও সার্থকতা দিতে পারে, তার জন্য এঁরা চেষ্টা কর্ব্বেন। যে সকল বালক-বালিকা জন্মের পর দারিদ্র্যবশতঃ বা অপর কারণে পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হচ্ছে, তাদের রক্ষা ক'রে এবং মানুষ ক'রে গ'ড়ে তু'লে এঁরা সমাজের শক্তিবর্দ্ধন কর্ব্বেন। আড়কাঠির হাতে প'ড়ে যে সকল বালিকার গণিকা-বৃত্তি অবলম্বনের সম্ভাবনা আস্‌তে পারে, তাদের সংগ্রহ ক'রে এনে সৎশিক্ষা দান ক'রে গৃহিজীবন লাভের সুযোগ এঁরা ক'রে দেবেন। পুরুষ-জাতির মধ্যে যে সকল দুর্নীতির অবস্থান-হেতু নারী জাতির গণিকাবৃত্তির বা সামাজিক জীবনে গুপ্ত পাপের পথ প্রশস্ত হ'য়েছে, তার সমূল উচ্ছেদের জন্য নারী হ'য়ে যতটুকু চেষ্টা করা যায়, সব তাঁরা কর্ব্বেন। স্ত্রীজাতির যে সকল দৈহিক, মানসিক নৈতিক দুর্ব্বলতার জন্য এবং যে সকল আর্থিক অযোগ্যতার জন্য তাকে পাপের পথে যেতে হয়েছে, সেই সব সম্যক্ দূর করার জন্য তাঁরা চেষ্টা কর্ব্বেন।

ধর্ম্মের বল ও সমাজের সেবা

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু প্রথম জীবনের ভ্রমের জন্য যিনি সমাজের দৃষ্টিতে আমৃত্যু পতিত ব'লেই গণ্যা হবেন, তিনি কি এত সব কাজ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খুব পারবেন। ধর্ম্মের বল তাঁকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করিয়ে নেবে। এমন কি, তাঁর প্রচেষ্টায় সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া সামাজিক উচ্চ-সম্মান-প্রাপ্তা মহিলারাও ক্রমে এসে যোগ দেবেন। প্রাণের টান বড় জবর টান হে; প্রাণের ডাক শু'নে যে কাজ করে, সে ব্রহ্মাণ্ডের সকলের প্রাণকে আকর্ষণ কত্তে পারে। সেবাবুদ্ধির অকপটতা যেখানে ধর্ম্ম জীবনের উপরে, ভগবৎ-প্রেমের উপরে দাঁড়িয়েছে, সেখানে অসম্ভব ব'লে কোনও কাজ থাক্‌তে পারে না।

(সমাপ্ত)

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান।।
দেহে, মনে, প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার।।
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির।।
অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে।
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে।।
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন।।
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে।।
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর।।
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার!

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পূর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"॥

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি॥

ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিব অশ্রুনীরে,

বিপদে আপদে বাহু যুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী।।

কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি।।

* মঙ্গল মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

(৬)

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি।।

নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,
কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা,
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি।।

আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী।।

সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,

জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠ্‌বে মেতে,
সবাই সবার আপন হবে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্‌ভরা প্রাণী ॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৪৯' নং গান।

(৭)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান ॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ ॥

জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই!
ভালবাসায় থাক্‌ব আমি
অনিন্দ্য অম্লান ॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৫০' নং গান।

(৮)

আয় তোরা আয়,
আমার বক্ষে আয়!
এইখানে আমি লুকায়ে রেখেছি
জগতের যে যা চায়।

আমার ভিতরে সকল মন্ত্র,
আমারে ধরিয়া সকল তন্ত্র,
সুরজাল-রচি' সকল যন্ত্র
আমারে নতি জানায়।
তাই না ''প্রণব'' এই নাম মোর
প্রচার হ'ল ধরায়।।

মহীরুহ যবে আকাশ জুড়িয়া
শাখা-পল্লব-মেলে
হাজার হাজার পাখীরা ঘুরিয়া
তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে,
তেমনি আমাতে নিখিলের ভাষা
যুগ যুগ ধরি' করে যাওয়া আসা,

আমারি ত' কোলে লভিয়া জনম
আমাতে বিলয় পায়।।
যত মত আর যত পথ হোক
যে আছে যেখানে পথচারী লোক,
সবাই আসিয়া শীতল হইবে
আমার স্নিগ্ধ ছায়।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৬' নং গান।

(১০)

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার
জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে
চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে
লভিবে ভারত লুপ্ত মান,
লভিবে বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য,
কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।
গভীর পঙ্কে আবক্ষ যার
ডুবিয়া সপ্ত শতাব্দী
ম্রিয়মাণ ছিল জীবন-চেতনা—
শুষ্ক, শীর্ণ প্রেমাব্ধি;
নিজের মাঝারে বিশ্ব-জগৎ,
বিশ্ব-জগতে আপনারে,
—চক্ষু থাকিতে অন্ধ,—তাই ত
দেখিয়াও দেখা গেলনা রে;

কেবল আত্ম-বঞ্চনা-নীতি
নিজেরে বাঁধিল শৃঙ্খলে;
দাস-ক্রীতদাস বংশানুক্রমে
বাড়িল কেবল দলে দলে।
তাহারি মাঝারে লুকাইয়াছিল
ঋষির সাধনা সুজাগ্রৎ,
আবার ভারতে নূতন রীতিতে
দেখাতে মুক্ত শুদ্ধ পথ।
বর্ষ দ্বিশত প্রতীচীর যত
বিলাস মদিরা করিয়া পান
হইল বিভল সংযম-বল,
মত্ত চপল হইল প্রাণ,
লালসা-তাড়না জীবন-সাধনা,
স্বার্থ হইল জপ ও তপ,—
যে যেখানে আছ, সবে শুধু বাঁচ
করিতে স্বার্থ-মহোৎসব।
কঙ্কাল-সার নিরন্ন আর
বিবস্ত্র নিঃসম্বলে
কর বঞ্চনা, শুধু প্রতারণা
ছলে বলে আর কৌশলে।
ইহাই বর্ত্তমানের চিত্র,
কিন্তু এ নহে শাশ্বত,
আবার ভারত লভিবে মূর্ত্তি
গৌরবময় অক্ষত।

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
অখিল বিশ্বে দেখাতে পথ,—
নির্ভর করে ভারতের 'পরে
নিখিল-বিশ্ব-ভবিষ্যৎ।
রণ-বাহিনীর বাজে জিঞ্জির
বিশ্বের প্রাণে সৃজিয়া ত্রাস,
বিশ্বের যারা শত্রু, তাহারা
চাহিছে বিশ্ব করিতে গ্রাস।
দিকে দিকে শুধু মিথ্যার মধু
মুক্ত হস্তে করিয়া দান
হিংসা-ঈর্ষ্যা-ঘৃণা-বিদ্বেষ
তরঙ্গ তুলি' খেলিছে বান
কে পারে কাহারে কত-কাল ধ'রে
পদানত করি' রাখিতে আজ,
শুধু তারি তরে রেষারেষি ক'রে
জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-সাজ;—
এর মাঝখানে ভারতের প্রাণে
জাগিবে সত্য বজ্রবৎ,
বান্‌চাল করি' মিথ্যার তরী,
দেখাতে নিত্য সত্য পথ।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
ভয় নাই, ভয় নাই কোনো,
যে আছ যেখানে একান্ত প্রাণে
কাণ পেতে মোর কথা শোনো,—
সংযম-বলে হও বলীয়ান্,

সাধনার বলে হও মহীয়ান্,
নিজ নিজ হৃদি-ক্ষেত্রের মাঝে
ব্রহ্মনামের বীজ বোনো—
ক্ষুদ্র বটের বীজটীর মাঝে
মহা-মহীরুহ লুকাইয়া আছে;
সিঞ্চিবে বারি মহোৎসাহের,
ব্যর্থ হবে না একজনও।
বীর্য্যের বলে মহাকুতূহলে
আরোহণ করি' চিত্ত-রথ
করহ আপন ত্রিভুবন-জন
নেহারি' সবারে আত্মবৎ।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,—
এ নহে মিথ্যা কল্পনা,
এ নহে রচিত অলীক কাহিনী,
বল্গা-বিহীন জল্পনা।
দিব্য নয়নে দেখেছি, ভারত
অতিক্রমিয়া মৃত্যু-পথ
ভৃঙ্গার ভরি' অমৃত বিতরি'
বিশ্বের হিতে নিত্য-সৎ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ মহৎ সু-বৃহৎ।

* অখণ্ড-সংহিতা দ্বাদশ খণ্ড হইতে গৃহীত 'ভারতবর্ষ উঠিবে আবার'।

(১১)

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক॥

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছ দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ॥

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।

অখণ্ড-সংহিতা তৃতীয় খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

অখণ্ড সংহিতা

"অখণ্ড-সংহিতা" বা অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ
পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী ভারতের ধর্ম্ম-সাহিত্যে যুগান্তর
আনয়ন করিয়াছে। জীবনের এমন কোনও জটিল প্রশ্ন
নাই, যাহার মীমাংসা এই মহাগ্রন্থের কোথাও না
কোথাও না পাইবেন। উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক,
পড়িতে আরম্ভ করিলে ছাড়িবার উপায় নাই।
গোপন, নিগূঢ় অথচ একান্ত প্রয়োজনীয়
বিষয়ের শত শত সমস্যার সময়োচিত
অপূর্ব্ব মীমাংসা রহিয়াছে। প্রত্যেক
খণ্ডই এক একখানা পৃথক গ্রন্থ।
আগের খণ্ডগুলি পড়ি নাই
বলিয়া যে পরের খণ্ডগুলির
অর্থ বুঝা যাইবে না বা
লাভজনক হইবে না,
তাহা নহে।

প্রথম খণ্ড হইতে চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

প্রতিখণ্ডের মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

* * * *

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০